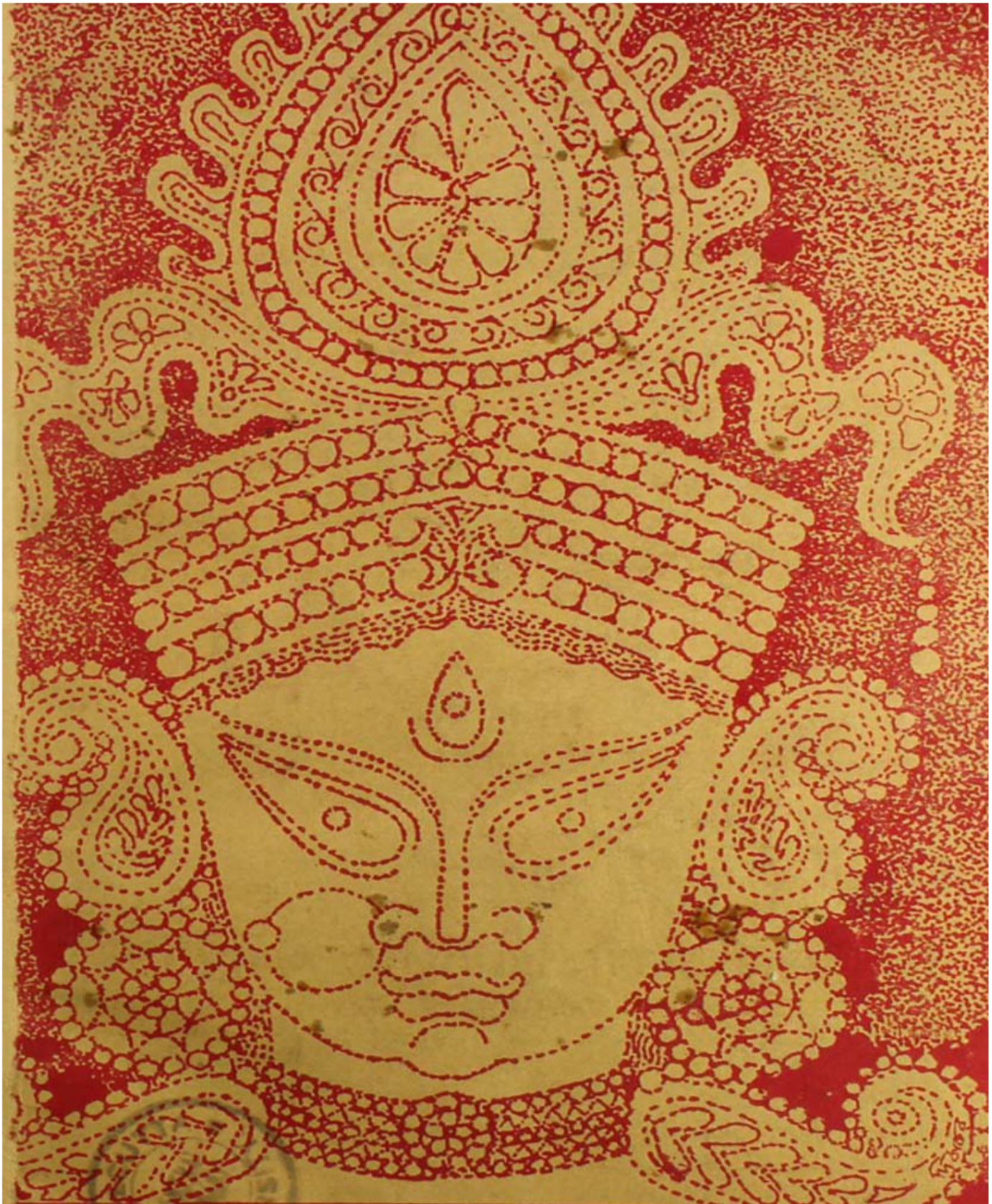

শারদীয়া

বিশ্ববাণী

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ

৩১শ বর্ষ ৮ম সং

আশ্বিন ১৩৮

ভদ্রানন্দ
ঈত

বেদান্ত মঠ
৭০০০০৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১১·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১০·০০ টাকা ও ৫·০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়।

- বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে সংক্রান্তির ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

- **বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।**

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হ

- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।

- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপনে নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক/গ্রাহিকা নং পরিষ্কার করিয়া লেখা অবশ্যই প্রয়োজন।

- যে কোন কারনে হউক পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।

- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরে Bank এর চেক পাঠাইলে **Bank Charges-** বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬

বি: দ্র:—১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১লা ফাল্গুন থেকে 'বিশ্ববাণী'র নতুন ৩৯শ বর্ষ সুরু হয়েছে। এই চাঁদাবাবদ ১১৲ টাকা যাঁরা এখনও পাঠাতে পারেননি তাঁদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন সুযোগে তা' পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। (উপরিলিখিত ৪ নং ধারা দেখুন)

বক্রেশ্বরে

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ আরোগ্যনিকেতন বক্রেশ্বরে। কলকাতা থেকে মাত্র ২২৯ কিলো-মিটার দূরে সতীপীঠ বক্রেশ্বর। তন্ত্র সাধনার এক প্রধান কেন্দ্র হিসাবেও অসামান্য।

টুরিস্ট লজে উঠুন। পছন্দসই ঘর খাবার পাবেন স্বল্প খরচে। ডর্মিটোরীর ব্যবস্থাও আছে। এখান থেকে শান্তিনিকেতন, কোপাই, তারাপীঠ, মশানজোড় এবং মাসুর ঘুরে আসতে পারেন।

এর জন্যে যোগাযোগ করুন : রিজার্ভেশন অফিসার, পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট), কলকাতা ৭০০ ০০১ অথবা ম্যানেজার, বক্রেশ্বর ট্যুরিস্ট লজ।

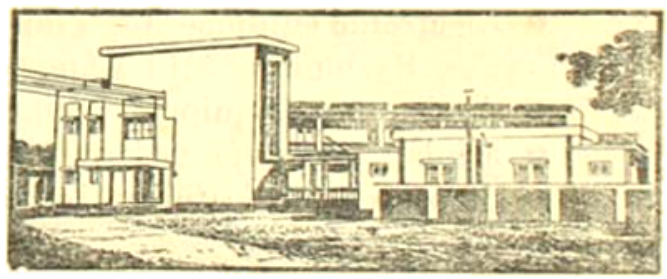

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইস্ট)
কলকাতা ৭০০ ০০১
ফোন : ২৩-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS
পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/77/4174

WESTINGHOUSE SAXBY FARMER LIMITED

(A Government Company)

Regd. Office :

17, CONVENT ROAD, CALCUTTA-700014.

Telephone : 24-7161 (7 lines) Telegram : 'INTERLOCK'

Telex : 021-2348

Branch Offices/Service Centres :-

DELHI, BOMBAY, MADRAS, JABALPUR, VARANASI.

Works :-

Entally and Tangra, Calcutta.
Durgapur, West Bengal.
Kurseong, Darjeeling.

We deal with :-

- Railway Brake.
- Railway Signalling
- Truck Brake, Tractor Brake.
- Electronic equipment - Traffic signals, Central Despatcher System for Mines etc.
- Agricultural Equipment-Pump sets (Diesel/Electric).
- Mining Equipment-Conveyors, Mine Tubs etc.
- Structural fabrication, Civil construction, Turn Key Projects.
- Export/Trading.

IN THE SERVICE OF THE NATION.....

দশের কল্যাণে

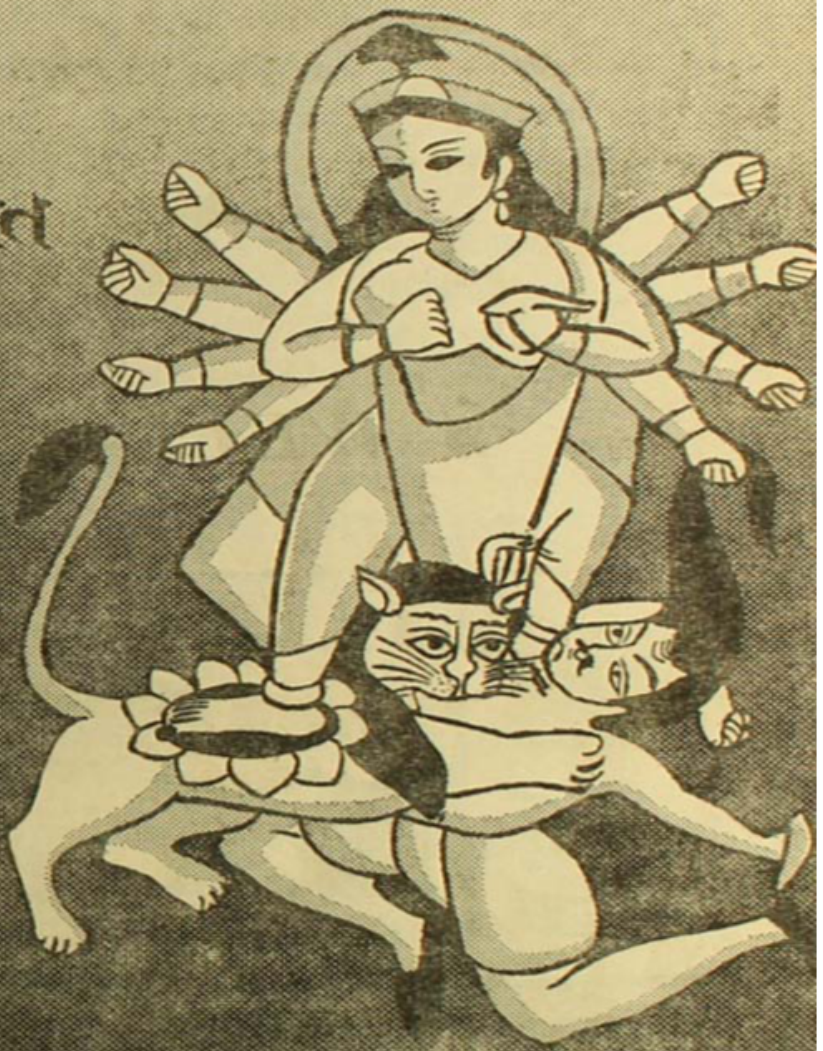

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

Space donated by

★

★ ★

A WELL-WISHER

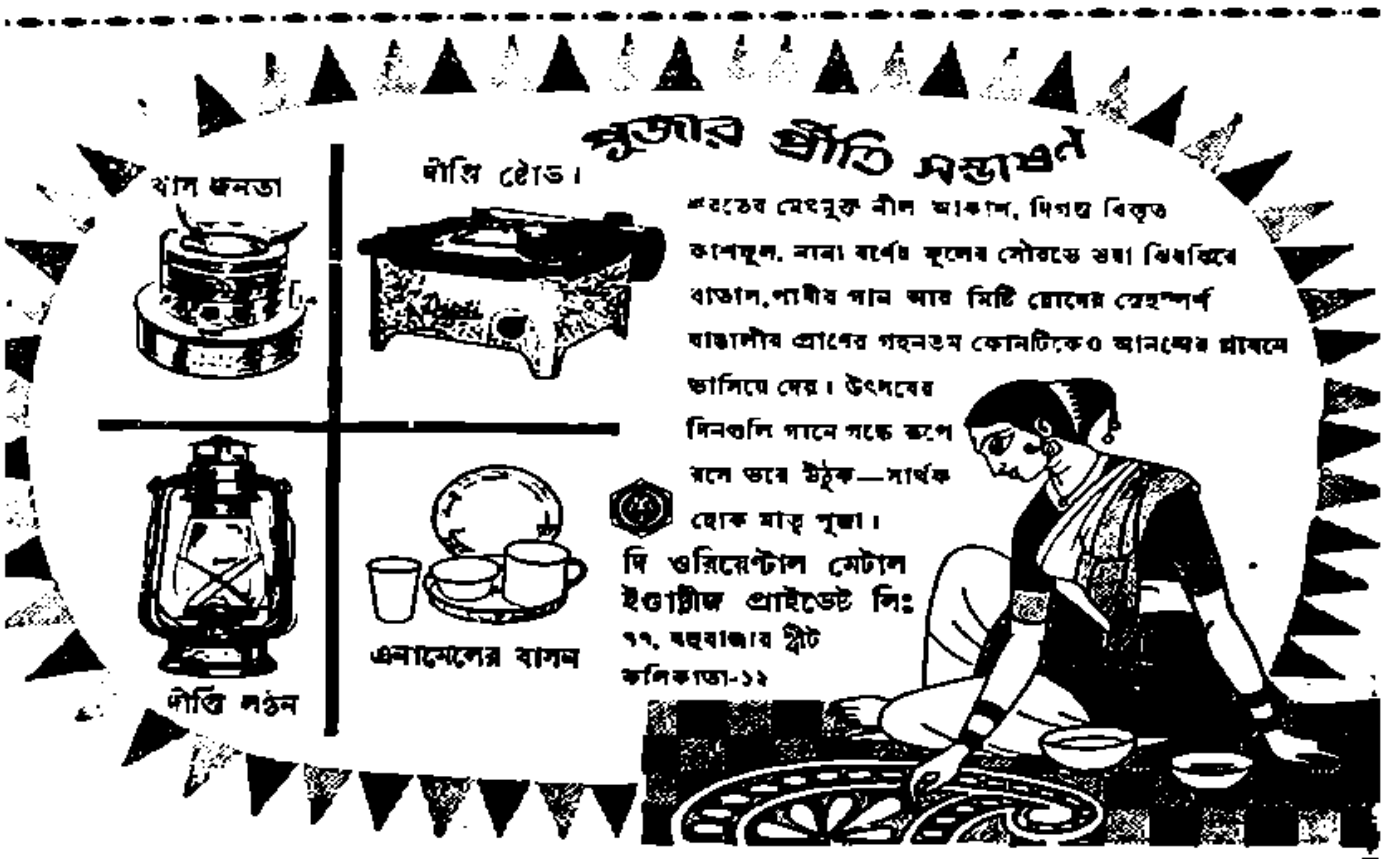

INCAB

INCAB HAS OVER
HALF A CENTURY'S EXPERIENCE
IN ELECTRIC CABLEMAKING

From its pioneering venture in 1920 INCAB has played a dynamic roll over its 58 years of life. INCAB product research and development teams study and keep abreast of technological progress in other countries and manufacture the largest range of products required for generation, transmission, distribution and utilisation of electrical energy.

THE INDAIN CABLE COMPANY LIMITED

quality cablemakers—first and foremost

Gram : NACOPAK Phone : 24-1592

REYNOLD'S

Patent

Products Manufactured by

National Asbestos Corporation

98, Middle Road, Calcutta-14

STEAM, HYDRAULIC
&
RUBBERISED PACKING HEAT-INSULATING 85% MAGNESIA

Phone : 55-4059

TARU ELECTRIC STORES

Electrical and Mechanical Engineers and Contractors.

Office & Workshop :

17/1, Bhim Ghosh Lane, Calcutta-6

Different types of Oil Engine, Dynamo, Electric Motor, Pump, Fan Etc. are available on hire and repairing done at moderate rates. We also supply every type of electrical installation. House-wiring is our speciality. Trial requested.

Newly Opened :—

AIR CONDITIONED

R A H U L

TAILORS & CLOTH MERCHANTS

***At* DOVER ROAD, CALCUTTA-700 019**

For South Calcutta People.

Space Donated By :

Sri Rajiv Gupta

With Compliments of :—

KESARDEO SURESH KUMAR

2A, RAM KUMAR RAKSHIT LANE,
CALCUTTA-700 007

Khandsari and Sugar Merchant and Commission Agents.

Space Donated By :

Sri Sushil Shroff

SCINDIA GROUP OF COMPANIES
SERVING INDIA'S SHIPPING NEEDS.

THE SCINDIA STEAM NAVG CO., LTD , Phone : 268161 (12 lines)
GRAM : SAMUDRAPAR
TELEX : Scindia 0112205

Registered Office :

Scindia House, N. M. Marg, Bombay-400038 Phone : 24-3456 (10 lines)

Branch Office : GRAM : SAMUDRAPAR

15, Park Street, Calcutta-700016 TELEX : CA 7305 Scindia

SCINDIA WORKSHOP LTD.

(Ship repairers, marine engineers, Macgregor licensees in India for manufacture of hatch covers)

Patent Slip, Mazagon, Bombay-400010. Phone : 392151
P. 2. Taratola Road, Calcutta-700024 Phone : 453144

OVERSEAS SERVICES

U.K., CONTINENT., U.S.S.R., A.R.E., POLAND, U.S.A., E. CANADA, GREAT LAKES, PACIFIC PORTS, CRRIBBEAN PORTS, WEST ASIA (GULF), RED SEA, STRAITS PORTS, MEDITERRANEAN AND EAST & WEST AFRICA.

Gram : STARTER **Phone : 22-7422**

The Friends Electric Co., Private Ltd.

14/2, OLD CHINA BAZAR STREET,
CALCUTTA-1

Authorised Distributors

CROMPTON GREAVES PRODUCTS

Gram : WATERFLOW **Phone** { 23-4141 / 28-1260

WATER SUPPLY SPECIALISTS (Pvt.) LTD.

(THE PUMP MEN)

14, BENTINCK STREET, CALCUTTA-1
(Gujrat Mansion)
POST BOX : 424

Trust in
PHILIPS
is worldwide

PHILIPS

PHILIPS INDIA LIMITED

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

আশ্বিন, ১৩৮৪

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১১ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী-প্রণবেশানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

মুদ্রণ :

শ্রীকুবের দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস

৬ নং ডাফ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি মাসে দু'টি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে-সাত ঘটিকায় 'উপনিষৎ' আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মাসে দু'টি রবিবার 'পুনর্জন্মবাদ' এবং একটি মঙ্গলবার 'যোগশিক্ষা' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে-সাত ঘটিকায়।

• স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি মাসে তিনটি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে-সাত ঘটিকায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গোর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্. বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে-সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে-সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার ও শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে-সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

একটি বিশিষ্ট ধরনের গেঞ্জী

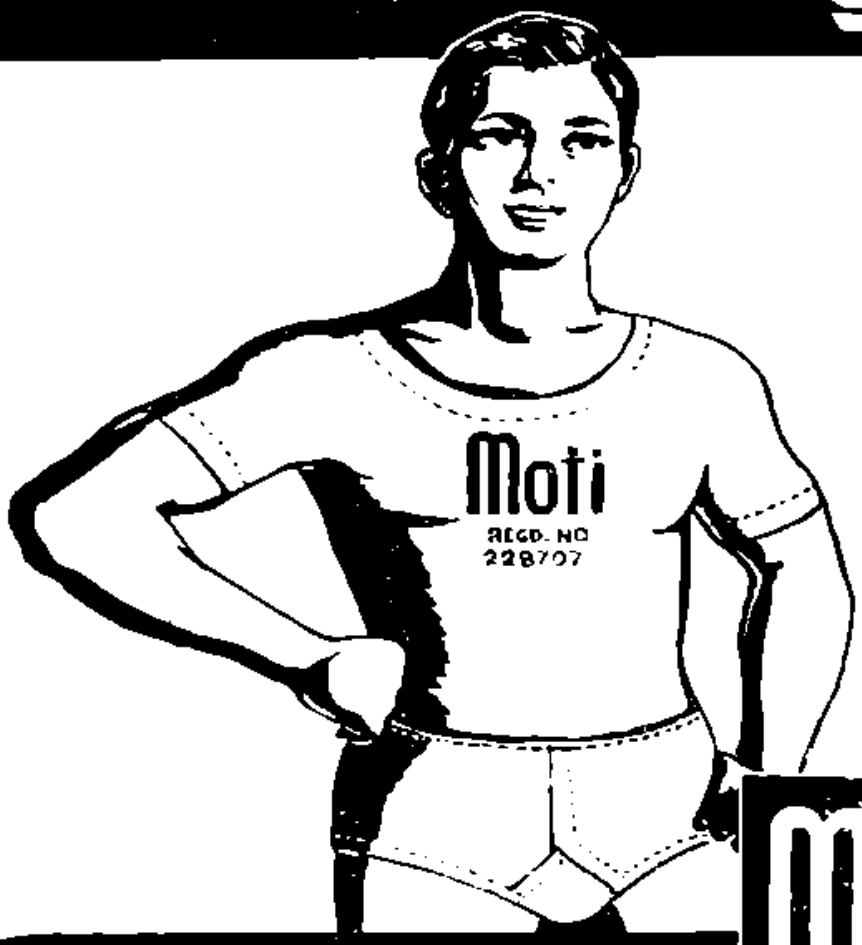

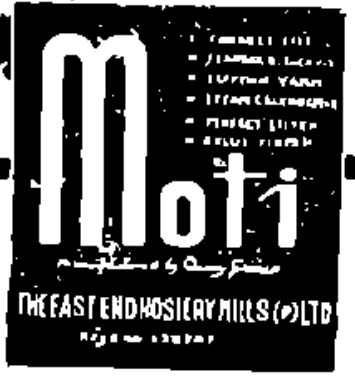

মতী গেঞ্জী

রেজিঃ নং ২২৮৭০৭

প্রস্তুত কারক:

চেরী গ্রুপ

দি ইষ্টএণ্ড হোসিয়ারী মিলস্ (প্রা-) লিঃ

১০০- রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬ • ফোন: ৩৫-৪৭৭১

বিশ্ববাণী

আশ্বিন, ১৩৮৪

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	শ্রীশঙ্করীস্তোত্রম্	৩২৯	অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য
২।	শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাপূজা	৩৩০	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৩।	বৈষ্ণবী-শক্তি চণ্ডী	৩৩৭	ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য
৪।	মাতৃসঙ্গীত	৩৪১	শিবানন্দ তীর্থনাথঃ
৫।	অব্যাকৃতা	৩৪৪	ডঃ রমা চৌধুরী
৬।	শাক্তপদসাহিত্যে সুভাষিত সমীক্ষা	৩৪৯	অধ্যাপক ডঃ রামজীবন আচার্য

A. K. PRODUCTS

Distributors of :

INDIAN MINERALS & CHEMICALS

P-7, Beleghata Main Road,

Calcutta-10

Phone No. 35-5765 Gram : CHALKDUST

With best Compliments of :—

MENNUS BAKERY

4, RIPON STREET.

CALCUTTA

BAKERS AND CONFECTIONERS

সাহিত্য সংসদের বই

- **সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান**
  প্রধান সম্পাদক : ড: সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। সম্পাদক : অঞ্জলি বসু
  বাঙালী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে গেছেন,
  এমন ৩৫০০ বাঙালীর তথ্যসমৃদ্ধ জীবন-চরিত।
  পৃ: ৬৪৮, লাইনো ছরফ [৪০·০০]
- **প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য**
  ড: নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তথ্যসমৃদ্ধ, ভাবতীয় সাহিত্য
  সবিশেষ আলোচিত। [২৫·০০]
- **বাঙ্গালার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়া**
  ড: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন। তত্ত্ব, বিবর্তন ও বিশিষ্ট
  কীর্তনীয়াদের জীবনচরিত। ১০ ছবি। [১০·০০]
- **বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা**
  সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। প্রায় হাজার বছরের ইতিহাস
  আলোচিত। ৮ মানচিত্র। [১৫·০০]
- **স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন**
  ড: শঙ্কর ঘোষ কর্তৃক তথ্যনিষ্ঠ বিশদ আলোচনা। [২০·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

কয়েকখানি সুনির্বাচিত বই

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের
বিবেকানন্দ চরিত ১০·০০
প্রফুল্লকুমার সরকারের
শ্রীগৌরাঙ্গ ৬·০০
শঙ্করীপ্রসাদ বসুর
নিবেদিতা লোকমাতা (১ম) ৪০·০০
ইন্দ্র মিত্রের
করুণাসাগর বিদ্যাসাগর ৩০·০০
ইতিহাসে আনন্দবাজার ১২·০০
অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দেখা হয় নাই ২০·০০
শিবকালী ভট্টাচার্যের
চিরঞ্জীব অনৌষধি ১ম ২৫·০০ ২য় ১৫·০০,
শান্তিকুমার মিত্রের
দর্পণে বাংলা ৫·০০
আনন্দবাজার পত্রিকা সংকলন
আনন্দ সঙ্গী ৩০·০০
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৬৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ শ্রেষ্ঠ সমালোচনা সাহিত্য ॥

ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, এম. এ., ডি. ফিল.
মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প ২৫·০০
[পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ]

ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ, এম. এ., পি-এইচ. ডি.
ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ২৫·০০
ডক্টর বৈদ্যনাথ শীল, এম. এ., ডি. ফিল.
বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা ২০·০০
[পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ]

গুণময় মান্না
গল্পের সৌন্দর্য ১০·০০
ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস, এম. এ., ডি. লিট্.
বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ ২০·০০

এ. কে. সরকার এ্যাণ্ড কোং

১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২

৭।	স্মৃতিচারণ	৩৫৮	স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
৮।	ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ	৩৬১	স্বামী প্রভানন্দ
৯।	শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীরামকৃষ্ণ	৩৬৯	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
১০।	শ্যামাসঙ্গীত	৩৭৩	শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী
১১।	বাল্মীকির রামায়ণ ও বাঙ্গালীর রামায়ণ	৩৭৪	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

With Best Compliments of :

BENGAL INDUSTRIES

Manufacturers & Exporters of :

G. I. BUCKETS & MINERALS

23A, NETAJI SUBHAS ROAD.

(1ST FLOOR)

CALCUTTA-1

Office Phones : { 22-3585 / 22-6406 } *Factory* Phones : { 64-2158 / 64-1451 }

Please Contact :-

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Spacials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005.
Gram : PLAINED

Sales Office :—
131, B. K. Paul Avenue, Calcutta-700005
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Telephone : 55-6172

With best compliments of :

BRITISH ELECTRICAL & PUMPS PRIVATE LTD.

4, B. B. D. BAG EAST, CALCUTTA-700 001

Grams :	Telex :	Phones :
'BHOWMKAL'	021-2426	22-7826, 27, 28, & 23-8714

"Try to expand. Remember the only sign of life is motion and growth."

—Swami Vivekananda

With Compliments of :

M/s. KANOI TEA PRIVATE LTD.

20, R. N. MUKHERJEE ROAD,

CALCUTTA-1

Phone : 23-2501

Puja Greetings from :—

DECORINA

13C, BEADON STREET,

CALCUTTA-700 006

DESIGNER, INTERIOR DECORATOR AND

QUALITY FURNITURE MAKERS.

With Best Compliments of :—

M|S. EMAAR ENTERPRISES

183, ACHARYYA PROFULLA CHANDRA ROAD,

CALCUTTA-4

(C.I.PIPE, FITTINGS, M.S.PIPE, PIPE FITTINGS,

HARDWARE TOOLS.)

&

GENERAL ORDER SUPPLIERS.

১২।	অগ্নিপুরাণে সাঙ্গীতিক ছন্দ, পদ ও বৃত্ত	৩৮০	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১৩।	শিল্পী নন্দলাল ও তাঁর অধ্যাত্মভাবনা	৩৮৮	শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪।	চারণকবি মুকুন্দদাস	৩৯৩	শ্রীরাজিৎকুমার সেন
১৫।	গুচ্ছ	৩৯৭	শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী
১৬।	দক্ষিণাত্যের দেব দেউল (মহাবলীপুর)	৩৯৮	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
১৭।	অষ্টভুজা	৪০৪	শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী
১৮।	শব্দের নিত্যতা সম্বন্ধে মীমাংসক মত	৪০৫	অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য
১৯।	কর্মরহস্য ও তার গতি	৪১২	শ্রীমতী অরুণা দত্ত
২০।	আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ	৪১৭	ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ
২১।	আনন্দরূপম্	৪২১	শ্রীশান্তশীল দাশ
২২।	ভারতীয় যোগসাধনা ও জীবনসিদ্ধি	৪২২	স্বামী পরমাত্মানন্দ
২৩।	সাইক্লোটোন	৪২৮	শ্রীমতী চামেলী বসু
২৪।	প্রজ্ঞার পক্ষে	৪৩২	ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র
২৫।	মুঘল-দরবারের চিত্রপরিচয় : প্রাক্‌কথন	৪৩৭	শ্রীদিবাকর সেনরায়
২৬।	সংঘ-বার্তা	৪৪২	

প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা-সহচর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের চতুর্থ অধ্যক্ষ ব্রহ্মজ্ঞ বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের স্মৃতিচারণ করেছেন : স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী প্রভবানন্দ, স্বামী সদাশিবানন্দ (ভক্তরাজ মহারাজ), স্বামী শঙ্করানন্দ, স্বামী ওঁকারানন্দ, স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ), স্বামী ভূতেশানন্দ, স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী জ্ঞানদানন্দ, স্বামী অজয়ানন্দ, স্বামী নির্লেপানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, স্বামী আত্মস্থানন্দ, শ্রীঅক্ষয় চৈতন্য, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী বিশ্বকর্মানন্দ, স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ, স্বামী ঈশাদীশ্বরানন্দ, স্বামী সত্যকামানন্দ, স্বামী ভাবাতীতানন্দ, স্বামী শিবশর্মারূপানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী শর্মানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীবৃন্দ

আর

'প্রবাসী'-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, নন্দীপতি মুখোপাধ্যায়, রায় নগেন্দ্র প্রসাদ, জ্যোতিরিন্দ্রমোহন সেন, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ সরকার, বারীন ঘোষ, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিভা বন্দোপাধ্যায়, বীণাপাণি বসুরায়, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ইত্যাদি মনীষী ও গৃহী ভক্তবৃন্দ।

পৃষ্ঠা সংখ্যা—৩৭২+১৬ :: পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ :: দাম দশ টাকা মাত্র

[জেনারেল প্রিন্টার্স ল্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত]

॥ কলেজ বুক্স ॥ এ-৬৬, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭ ॥

শারদোৎসবে

সশ্রদ্ধ নমস্কার

★

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

কলিকাতা

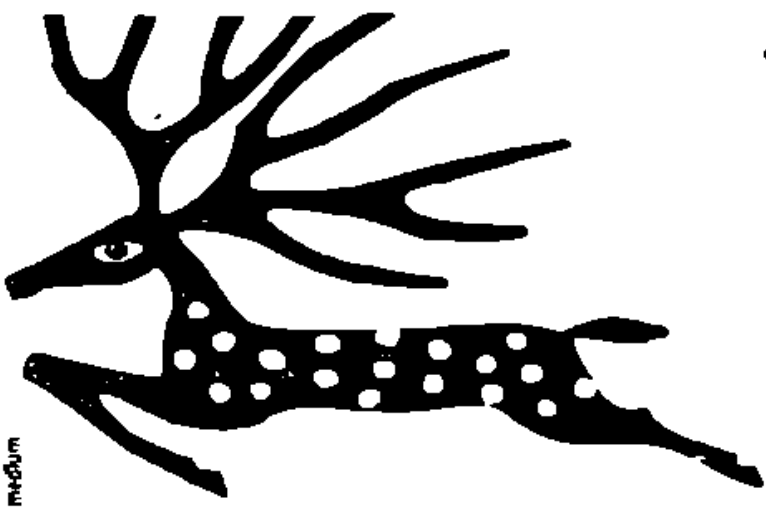

ছুটন্ত কলকাতা

কলকাতা ছুটতে চায়।
বনের হরিণ যেমন করে ছোটে বনে
ব্যগ্র এবং বাধাহীন। কিন্তু পারে না।
শহরের এলাকার তুলনায় বাড়ন্ত
জনসংখ্যা, জনসংখ্যার তুলনায় স্বল্প
যান-বাহন, যান-বাহনের তুলনায়
সংকীর্ণ সড়ক স্বভাবতই তার অগ্রগতির
পথে বাধা। আমরা জানি, কলকাতার
মানুষ আজ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে তাকিয়ে আছে
সেই গতিময় যানটির দিকে, যার নাম
ভূগর্ভ রেল।

কারণ, ভূগর্ভ রেলের হাতেই সেই
ভবিষ্যৎ, যখন ছুটন্ত কলকাতা এক
দৌড়ে পৌঁছে যাবে তার সিদ্ধি এবং
সমৃদ্ধির লক্ষ্যস্থলে; ব্যগ্র এবং বাধাহীন।

MD

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ-রেল
মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং
দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা যো দয়সে সদোষান্
স্বাকে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্ ॥

স্বামী অভেদানন্দ

মহাশক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবী

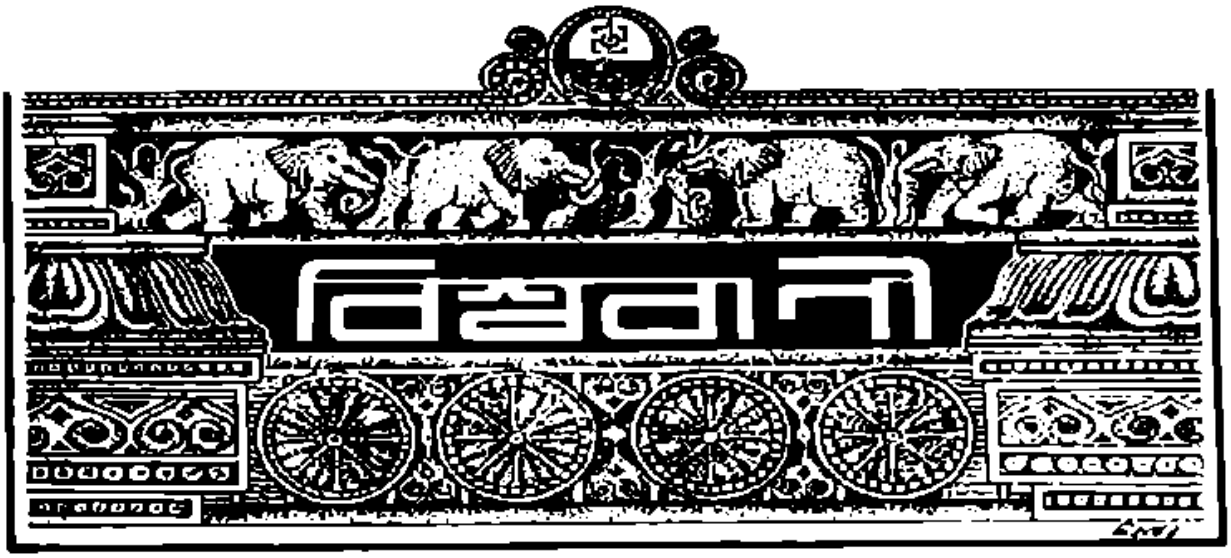

উনচল্লিশ বর্ষ | অষ্টম সংখ্যা | আশ্বিন ১৩৮৪

॥ শ্রীশঙ্করীস্তোত্রম ॥

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

শঙ্করি। ভব-তারিণি। শুভ-
কারিণি। জয় দুর্গে।
দানবকৃত-দুর্গতি চয়-
মোচিতসুরবর্গে।
অয়ি চিন্ময়ি। মঙ্গলময়ি।
করুণাময়ি। মাতঃ॥
খণ্ডয় ভব-বন্ধনভয়
মুদ্ধর করুণাতঃ॥
দৈত্যনিধন-যুদ্ধশিরসি
ভৈরবি। রণচণ্ডি।
নয়নং তব রোষবিষম-
মুদ্ধতবলখণ্ডি।
বিবিধায়ুধ-মণ্ডিতভুজ-
মণ্ডলপরিদৃশ্যে।
কেশরিবর-বাহিনি। সতি।
এহি জননি। বিশ্বে॥
খণ্ডিতশশি-মণ্ডিতবর-
গৌরধরভালে।
লম্বিতসিত-কান্তিলসিত-
পঙ্কজদলমালে।
অরুণাম্বর-সুন্দরতর-
কাঞ্চনরুচিগাত্রি!
পদপঙ্কজ-সন্নতজন-
শাশ্বতপদদাত্রি।
বিশ্বজনন-পালন-লয়-
কারিণি। জগদাদ্যে।
সদয়ান্তর-ধারিণি। বিধি-
মাধবহরসাধ্যে।
শিবসুন্দরি। পরমেশ্বরি।
নির্গুণপরপক্ষে।
পদপল্লব-মর্পয় তব
শরণাগতভক্তে॥

॥ শ্রীশ্রীশারদীয়া-দুর্গাপূজা ॥

প্রজ্ঞানানন্দ

শরৎকালে দশভূজা-মৃন্ময়ী-দুর্গাদেবীর পূজা বহুদিন ধরে ভারতের ও বিশেষ ক'রে বাঙলাদেশের (পূর্বে বৃহত্তর-বাঙলায় ও এক্ষনে পশ্চিমবঙ্গের) বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। শরৎকালে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধনের কথা যে শুধু পণ্ডিত কৃত্তিবাস-রচিত বাঙলা-রামায়ণেই পাওয়া যায়—তা নয়, অকালে শরৎকালে দশভূজার আবির্ভাব-বিবরণ 'বামনপুরাণ' (১৭শ-২০শ অধ্যায়), 'দেবীভাগবৎ' (৫ম স্কন্দ, ২য়—১৮শ অধ্যায়), 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ' (৮২-তম—৮৩-তম অধ্যায়), 'কালিকাপুরাণ' (৬০-তম অধ্যায়), 'কালীবিলাসতন্ত্র' (১ম—২৪শ শ্লোক), 'দেবীপুরাণ' (১ম—২০শ অধ্যায়), স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য-কৃত 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' (১ম পৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায়। শোনা যায়, গৌড়রাজ রাজা গণেশ-কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস ওঝা বাঙলা-সংস্করণ 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন এবং পূর্বপূর্ব পুরাণগুলিতে যেভাবে আশ্বিন মাসে শারদীয়া-দুর্গাপূজার বিবরণ দেওয়া আছে তাদের অনুসরণ ক'রে পয়ারছন্দে 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন। কিন্তু একথা সত্য যে, মহর্ষি বাল্মিকী সংস্কৃতে যে বিশাল সপ্তকাণ্ড 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন তাতে লঙ্কাধিপতি রাবণরাজকে বধের জন্য অকালে-অনুষ্ঠিত বোধন ও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেছিলেন—এ'কথার বা বিবরণের কোন উল্লেখ নাই, বরং আছে সূর্যপূজার কথা।

মহর্ষি বাল্মিকী-রচিত সংস্কৃত-'রামায়ণ'-ই আদি ও প্রামাণিক 'রামায়ণ'-মহাকাব্য এবং পরবর্তী শ্রীরামচন্দ্রকাহিনী যে বাল্মিকী-রামায়ণেরই অনুকরণে রচিত হয়েছিল তা অনুমান করা অসঙ্গত ও অনৈতিহাসিক নয়। সংস্কৃত-রামায়ণে মহর্ষি বাল্মিকী বর্ণনা করেছেন : শ্রীরামচন্দ্র যখন মহাতেজা দশানন-রাবণকে বধ করার জন্য বিশেষ চিন্তামগ্ন ছিলেন তখন মহর্ষি অগস্ত্য শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে আদিত্যহৃদয়-সূর্যদেবের স্তব ও পূজা করতে বলেন। সূর্যবংশজাত শ্রীরামচন্দ্রের পক্ষে সূর্যপূজা করাই সঙ্গত বলে মনে হয়। মহর্ষি অগস্ত্য বলেন—

'রামরাম মহাবাহো শৃণু গুহ্যং সনাতনম্।
যেন সর্বানরীন্ বৎস, সমরে বিজয়িষ্যসে ॥
আদিত্যহৃদয়ং পুণ্যং সর্বশত্রুবিনাশনম্।
জয়াবহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্ ॥

* * *

রশ্মিমন্তং সমুদ্যন্তং দেবাসুরনমস্কৃতম্।
পূজয়স্ব বিবিস্বন্তং ভাস্করং ভুবনেশ্বরম্ ॥

* * *

পূজয়ৈনমেকাগ্রো দেবদেবং জগৎপতিম্ ।
এতত্ত্রিগুণিতং জপ্ত্বা যুদ্ধেষু বিজয়িষ্যতি ॥
অস্মিন্ ক্ষণে মহাবাহো রাবণং ত্বং বধিষ্যসি ।
এবমুক্ত্বা ততোঽগস্ত্যো জগাম স যথাগতম্ ॥
* * *
রাবণং প্রেক্ষ্য হৃষ্টাত্মা জয়ার্থং সমুপাগমৎ ।
সর্বযত্নেন মহতা বৃতস্তস্য বধেঽভবৎ ॥'

—রামায়ণ (যুদ্ধকাণ্ড) ১০৫ অধ্যায় ।

সুতরাং দেখা যায়, আদিত্যহৃদয়-সূর্যদেবের তিনবার আচমন ও স্তব-পূজাদি শেষ ক'রে শ্রীরামচন্দ্র দশানন-রাবণকে বধ করার জন্য ধনুর্বাণ হাতে নিলেন : 'ত্রিরাচম্যশুচির্ভূত্বা ধনুরাদায় বীর্যবান্ ।'

কিন্তু পুরাণসাহিত্যগুলি ও স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য-কৃত 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' এবং মিথিলার ঠাকুর বিদ্যাপতি-কৃত 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-গ্রন্থের বিবরণ সম্পূর্ণ বিপরীত ; অর্থাৎ পুরাণগুলি, দুর্গাপূজাতত্ত্ব ও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী অকাল-বোধনই সমর্থন করেছে এবং তাদের সমর্থনের পক্ষে যুক্তিও দিয়েছেন। দেবীপুরাণে (২২।২৩) শারদীয়াপূজা-সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—

'অশ্বমেধমবাপ্নোতি ভক্তিনা সুরসত্তম ।
মহানবম্যাং পূজয়েৎ সর্বকামপ্রদায়িকা ॥'

দেবীপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণসাহিত্যগুলির অভিমত যে, শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করলে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। বৈদিকসাহিত্যবিদ্‌দের অভিমতও যে, বৈদিকোত্তরকালে অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও পশ্চিমদেশে 'নবরাত্রব্রত'-রূপে প্রচারিত হয়েছে। যদিও বাঙলা, বিহার ও আসামের বাইরে আশ্বিনের শুক্লা-প্রতিপদ থেকে নবমী-তিথি-পর্যন্ত শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তথাপি 'নবরাত্রব্রত'-এর রূপ ও অনুষ্ঠান শ্রীশ্রীদুর্গপূজার রূপ ও অনুষ্ঠান থেকে বেশ-কিছু পৃথক। স্বর্গত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণের অভিমত যে, বাঙলাদেশে পণ্ডিত রঘুনন্দন-কৃত তিথিতত্ত্বের অন্তর্গত 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' ও 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব', মিথিলার বিদ্যাপতি-কৃত[১] 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ও বাচস্পতিমিশ্র-কৃত (এই বাচস্পতিমিশ্র কিন্তু ষড়্‌দর্শনের ভাষ্যকার বাচস্পতিমিশ্র নন) 'কৃত্যচিন্তামণি'-র অন্তর্গত 'দুর্গোৎসবপ্রকরণ' কামরূপ-আসামে কামরূপীয়নিবন্ধের অন্তর্গত 'দুর্গোৎসবপ্রকরণ'-এর সমশ্রেণীভুক্ত নয়। তাছাড়া পণ্ডিত বালক (যাঁর রচিত-গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না), পণ্ডিত শূলপাণি, শ্রীকরদত্ত, শ্রীনাথভট্ট—এই চারজন নিবন্ধকারও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজাতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। শূলপাণি ও শ্রীকরদত্ত পণ্ডিত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী। পণ্ডিত শূলপাণি 'দুর্গোৎসববিবেক', 'দুর্গোৎসবপ্রয়োগবিবেক' ও 'বাসন্তিবিবেক' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 'বাসন্তীবিবেক'-গ্রন্থ থেকে জানা যায়, পণ্ডিত শূলপাণি

১। মিথিলার মহারাজ শিবসিংহের সভাপণ্ডিত। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর পুঁথি বা গ্রন্থ এখন পাওয়া দুষ্কর।

'দেবীভাগবত' (৩।২৬।৩—৭)-এর অভিমত বা নির্দেশ-অনুযায়ী বসন্তঋতুতে চৈত্রমাসে শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজাও সমর্থন করেছেন। দেবীভাগবতের সমর্থনসূত্র হ'ল—

'শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রব্রতং শুভম্।
শরৎকালে বিশেষেণ কর্তব্যং বিধিপূর্বকম্॥
বসন্তে চ প্রকর্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্বকম্।
* * *
শরদ্-বসন্তনামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ।
* * *
বসন্ত-শরদাবেব জননাশকরাবুভৌ॥
তস্মাৎ তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপ্রজনং বুধৈঃ।
চৈত্রেঽশ্বিনে শুভমাসি ভক্তিপূর্বং নরাধিপ॥'

শরৎ ও বসন্ত এ' দুটি ঋতুর নাম 'যমদংষ্ট্রা'। এ' দুটি ঋতুতে বিভিন্ন ভীষণ রোগের প্রকোপ হয় ও বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মানুষের দুর্গতি নাশ করেন বলে ঐ সময়ে পূজিতা দেবীর নাম দুর্গতিনাশিনী 'দুর্গা'। শ্রীশ্রীজগদম্বা-মহামায়া দুর্গা-রূপে আবির্ভূতা হন আশ্বিন মাসে এবং বসন্তঋতুতে চৈত্রমাসে। এজন্য শরতে আশ্বিনমাসে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও বসন্তে চৈত্রমাসে শ্রীদুর্গারই অভিন্ন রূপ শ্রীশ্রীবাসন্তী বা শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গাপূজার অনুষ্ঠান হয়।

পূর্বেই বলেছি যে, কবি বিদ্যাপতি-ঠাকুর, বাচস্পতিমিশ্র ও কামরূপীয় নিবন্ধকার তিনজনে স্মার্ত রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী। তবে একথাও আবার ঠিক যে, মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্রের পূর্ববর্তী, কেননা পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্র তাঁর 'কৃত্যচিন্তামণি'-র দুর্গোৎসবপ্রকরণে বিদ্যাপতি-কৃত 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-গ্রন্থের নামোল্লেখ করেছেন। স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য অন্যূন চারশত বৎসর পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

দশভুজা-মৃন্ময়ী শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর প্রচলনকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, নদীয়ার তথা কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে দশভুজা-মৃন্ময়ী-দুর্গাপূজার প্রবর্তন হয়। কিন্তু এ'কথা বা সিদ্ধান্ত ঠিক ইতিহাসসম্মত নয়, কেননা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় সাধক রামপ্রসাদ, অযোধ্যানাথ গোস্বামী বা আজু গোঁসাই, কবি ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি বর্তমান ছিলেন, কিন্তু শক্তিসাধক রামপ্রসাদ ও কবি ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের কোন বর্ণনায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে সর্বপ্রথম দশভুজা-মৃন্ময়ী-শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করেছিলেন সে'কথার উল্লেখ পাওয়া যায় না, বরং সাধক রামপ্রসাদ দেবী জগদীশ্বরীর উপাসক ছিলেন এবং তদানীন্তন গ্রন্থসকলে দেবীর সঙ্গে রামপ্রসাদের লীলাবৈচিত্র্যের বহু কথাই উল্লিখিত হয়েছে। তবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং স্মার্ত রঘুনন্দনের প্রাদুর্ভাবকালে স্মার্ত রঘুনন্দন-রচিত 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' ও 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব'-গ্রন্থদুটি অনুশীলন করলে বোঝা যায়—স্মার্ত রঘুনন্দনের সময়ে (আজ থেকে প্রায় চারশো বৎসর পূর্বে) বর্তমানে অনুষ্ঠিত শরৎকালে দশভুজা-মৃন্ময়ী শ্রীশ্রীদুর্গাপূজারই প্রচলন ছিল। পণ্ডিত রঘুনন্দন ঐ দুটি গ্রন্থে বিশেষভাবে দশভুজা-মৃন্ময়ী-মূর্তিপূজা-সম্বন্ধে আচার-বিচার ও পদ্ধতি প্রভৃতি

পূজানুপুঙ্খরূপে লিখে গেছেন। তবে আনুমানিক আড়াইশো বৎসর পূর্বে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ যে দশভূজা-মৃন্ময়ী-মূর্তি পূজা করেছিলেন সেকথাও অনেকের জানা আছে।

পণ্ডিত রঘুনন্দন লিখেছেন : "ততঃ আচারাদপরাজিতালতাবদ্ধাং নবপত্রিকাং বিল্বশাখাঞ্চ স্থাপয়িত্বা…" (দুর্গাপূজাতত্ত্ব, পৃঃ ৫১)—অর্থাৎ সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা পূজামণ্ডপে স্থাপন ক'রে অপরাজিতালতার-দ্বারা বেষ্টন করতে হয় ··। মোটামুটিভাবে পূজার বিধি যেভাবে বৃহন্নন্দিকেশ্বর কালিকাপুরাণ, দেবীপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে, স্মার্ত রঘুনন্দন তার সমর্থন জানিয়েছেন। যেমন, দেবী পঞ্চমীতিথিতে আসেন শবরাদি নিম্ন জাতিদের গৃহে, ষষ্ঠীর দিনে বিল্ববৃক্ষে, সপ্তমীর দিনে আসেন পূজামণ্ডপে। তাছাড়া পূজার বিধি বা প্রণালী হ'ল : ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষে পূজার পর সপ্তমীর দিন দেবীর বিল্বশাখাযুক্ত কলস (এজন্য বিল্বশাখা ছেদন ক'রে পূজামণ্ডপে ঘটের সঙ্গে রাখা হয়) ও পরে মৃন্ময়ীরূপে পূজামণ্ডপে স্থান লাভ করেন। তখন নবপত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তারপর মহাস্নান। তখন দেবীর প্রতিমূর্তি দর্পণের ওপর সিন্দূরে অঙ্কিত ক'রে তাতে মহাস্নান করানো হয় এজন্য যে, তাতে দেবীমূর্তির ক্রমিক বিকাশতত্ত্ব অব্যাহত থাকে : প্রথমে বিল্ববৃক্ষ বা বিল্বশাখাপূজা, তারপর বিল্বশাখাসহ মঙ্গলঘট-স্থাপন, তারপর নবপত্রিকার পূজা, তারপর দেবীর মনোময় মূর্তি দর্পণে স্নান করানো, তারপর বাস্তব মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির চক্ষুদান ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা, তারপর ন্যাসাদি-অনুষ্ঠানের পর যথারীতি মৃন্ময় মূর্তিতে শ্রীশ্রীদেবীর পূজা।

কালিকাপুরাণে (৬০-তম অধ্যায়ে) দেবীর আবির্ভাবের কথা উল্লিখিত আছে : (১) প্রথম-কল্পে ভগবতী মহামায়া অষ্টাদশভূজা উগ্রচণ্ডা-রূপে আবির্ভূত হ'য়ে মহিষাসুরকে বধ করেন (কথিত যে, মহাদেবের বরলাভ ক'রে অসুর রম্ভাসুরের ঔরসে মহিষাসুর-রূপে তিনবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন ও দেবী তিনবার বা তিনকল্পেই তিনরূপে মহিষাসুরকে বধ করেন)। (২) দ্বিতীয়-কল্পে ষোড়শভূজা ভদ্রকালী-রূপে আবির্ভূত হ'য়ে দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন, এবং (৩) তৃতীয়কল্পে দশভূজা দুর্গা-রূপে মহিষাসুরকে হত্যা করেন। হিমালয়ে ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে আশ্বিনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে দেবগণের মিলিত তেজ থেকে দশভূজামূর্তির আবির্ভাব হয়। ঋষি কাত্যায়ন মৃন্ময়ীমূর্তির পূজা করেছিলেন বলে দেবীর নাম কাত্যায়নী। দেবী কাত্যায়নীও দশদিকের অনুকরণে দশভূজা[১] ছিলেন। কালিকাপুরাণে (৬০।৭৭) আছে—

তস্তেজোভির্যুতত্বপূর্দেবী কাত্যায়নেন বৈ।
সন্দৃষ্টিতা পূজিতা চ তেন কাত্যায়নী স্মৃতা॥

বৈদিক যুগে যজ্ঞকুণ্ডে যেমন জ্যোতিষ্মতী 'দক্ষ-তনা'-র পূজার প্রচলন ছিল, তেমনি ছিল 'হব্যবাহিনী-দেবী'-র পূজা। এই হব্যবাহিনীদেবীই পরে ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে পূজিত হয়ে 'কাত্যায়নী'-নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। দেবীপুরাণে আছে, শ্রীরামচন্দ্রের মতো ঋষি কাত্যায়ন

১। 'কাত্যায়ন্যা প্রবক্ষ্যামি জন্ম দশভুজাত্মনঃ।'

দশভূজা দেবী কাত্যায়নীর অকালে বোধন ও পূজা করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (৪৩।৪৪—৪৬) দেখি,

কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

ব্রজকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে পতি-রূপে পাওয়ার জন্য মৃন্ময়ী-কাত্যায়নীর পূজা করেছিলেন। দেবীর বাসস্থান কল্পিত হয়েছিল কৈলাসপর্বতে, আবির্ভাবস্থল বিন্ধ্যাচলে ও হিমালয়ে। 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব'-গ্রন্থে (পৃঃ ৪৩) স্মার্ত রঘুনন্দন সেজন্য উল্লেখ করেছেন,

আবাহয়ামাহং দেবীং মৃন্ময়ে-শ্রীফলেঽপি চ।
কৈলাসশিখরাদ্ দেবি বিন্ধ্যাদ্রেহিমপর্বতাৎ॥
আগতা বিল্বশাখায়াং চণ্ডিকে কুরু সন্নিধিম্॥

মৃন্ময়ে অর্থাৎ মৃত্তিকানির্মিত দশভুজামূর্তিতে। শ্রীফল বিল্বফল বা বিল্ববৃক্ষ। এজন্য বৈদিক ঘটপূজা বা যজ্ঞগৃহপূজা, তারপর স্থূলপূজা, তারপর বৃক্ষপূজা (বিল্ব বা অশোকাদি নবপত্রিকা, অর্থাৎ নববৃক্ষশাখাপূজা) ও তারপর দর্পণে প্রতিভাস বা প্রতিচ্ছায়াপূজা, তারপর বাস্তব মূর্তি-পূজার প্রবর্তন হয়—সেকথা বলেছি। কালিকাপুরাণে (২৬—৩৩ অধ্যায়) শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধনের কথা আছে। বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ[৩] সেকথার উল্লেখ ক'রে বলেছে,

'রামস্যানুগ্রহার্থায় রাবণস্য বধায় চ।
রাত্রাবেব মহাদেবী ব্রহ্মণা[৪] বোধিতা পুরা॥
• • •
নিহতে রাবণে বীরে নবম্যাং সকলৈঃ সুরৈঃ।
বিশেষপূজাং দুর্গায়াশ্চক্রে লোকপিতামহঃ॥
ততঃ সম্প্রেষিতা দেবী দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ।'

দশমীতে শাবরোৎসবের কথা উল্লেখ করেছেন কালিকাপুরাণকার, কিন্তু ইতিহাসে দেখি যে, প্রাচীনকালে বিন্ধ্যাচলে অনুন্নত শাবরজাতিরা মদ্য-মাংস দিয়ে দেবী দুর্গার (শবরী-দুর্গার) পূজা করেছিলেন এবং সে' দেবীমূর্তিও ছিল মৃন্ময়ী। ঐসকল কথার আলোচনা করেছি আমার 'শ্রীদুর্গা'-গ্রন্থে।[৫]

মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখি, বৈশ্য সমাধি ও রাজা সুরথ অকালে শরৎকালেই দেবীপূজা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁরা মৃন্ময়ী-প্রতিমারই পূজা করেছিলেন—

'তৌ-তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্তিং মহিময়ীম্।
অর্হণাকল্পতন্ত্রাভ্যাং পুষ্পধূপাগ্নিতর্পণৈঃ॥' ১৩।৭

৩। 'বৃহন্নন্দিকেশ্বর'-পুরাণ বর্তমানে পাওয়া দুষ্কর। শোনা যায়, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মাগ্‌রী অক্ষরে তার একটি সংস্করণ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।

৪। ব্রহ্মা—দেববাদ্য বা দেবতা। লক্ষ্মীতন্ত্রে এঁকে 'ক্রহিণ'-ব্রহ্মা বলা হয়েছে।

৫। 'শ্রীদুর্গা'-গ্রন্থ বর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা চলেছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও (৬৪-তম ও ৬৫-তম অধ্যায়) দেখি যে, মেধস ঋষির উপদেশে রাজা সুরথ শরৎকালে কৃষ্ণপক্ষীয় নবমীতে বোধন ক'রে মহানবমী-পর্যন্ত একপক্ষকাল মৃন্ময়ী-দুর্গাপ্রতিমার পূজা করেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত বাচস্পতিমিশ্র ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রমাণ উল্লেখ ক'রে বলেছেন, সুরথ ও রামচন্দ্র উভয়েই বসন্তে চৈত্রমাসে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গার পূজা করেছিলেন (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে, প্রকৃতিখণ্ড ৬৪।৭, ৬৪।৩, ৬৪।১)। এখানে অবশ্য দেখা যায়, পূজার সময় বা ক্ষণ-কাল নিয়ে মতভেদ আছে। 'কৃত্যচিন্তামণি'-গ্রন্থে উল্লিখিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রমাণও ঐ মর্মে উদ্ধৃত দেখা যায়। দেবীভাগবতে আছে, শ্রীরামচন্দ্র প্রথমে শ্রীশ্রীশারদীয়াপূজা করেন ও পরে পুনরায় শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গার পূজা করেন। কালিকাপুরাণে (৬১-তম অধ্যায়ে) আছে, শুম্ভ ও নিশুম্ভ অসুরদ্বয়কে বধ করার জন্য শ্রীশ্রীভগবতীর শরীরকোষ থেকে কৌশিকীমূর্তির আবির্ভাব হয় হিমালয়ে মাতঙ্গ বা মতঙ্গমুনির আশ্রমে। এই কৌশিকীদুর্গাও সিংহবাহিনী দশভুজা। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'দেবীভাগবত'-গ্রন্থে (৩।২৬।৩—৭ অধ্যায়) শরৎকালে শ্রীশ্রীশারদীয়া এবং বসন্তঋতুতে চৈত্রমাসে শ্রীশ্রীবাসন্তীদুর্গার পূজা প্রাচীনকাল থেকেই বিহিত ছিল—'বসন্ত-শারদা বেব জননাপকরাবুভৌ'।[৩]

সুতরাং শ্রীশ্রীদুর্গাদেবী যে আসলে বৈদিক দেবতা সেকথা জানা যায় বৈদিক যজ্ঞকুণ্ডে 'দক্ষ-তনা'-র পূজা ও দেবী হব্যবাহিনীর আরাধনা থেকে। ঋগ্বেদে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের উল্লেখ আছে। সেখানে দেখা যায়, শ্রীশ্রীভগবতী স্বয়ং অম্ভৃণ ঋষির 'বাক্'-নাম্নী-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ ক'রে দেবীসূক্ত রচনা করেছিলেন। অনেকের অভিমত যে, দেবীসূক্ত দেবী দুর্গারই সূক্ত—'তমগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং···দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ।' তাছাড়া মারিচীকল্পে 'দুর্গাসপ্তশতী'-র (চণ্ডীর) পুরশ্চরণপ্রয়োগে দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্তের দ্বারা হোমের ব্যবস্থা আছে (এ' সম্বন্ধে গুপ্তবতীটীকার উপোদ্‌ঘাতপ্রকরণে মারিচীকল্প দ্রষ্টব্য)। ঋষি শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা'-গ্রন্থেও শ্রীশ্রীদুর্গার উল্লেখ আছে। তাছাড়া বিষ্ণুসংহিতায় 'দুর্গাসাবিত্রী'-র উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং শ্রীশ্রীদুর্গা দেবী যে বৈদিক দেবতা সে'বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তবে পরবর্তীকালে দেবী পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবীরূপেও পরিচিত হয়েছিলেন।

দেবী দুর্গার রূপভেদ আছে, যেমন মহিষমর্দিনী-দুর্গা, নবদুর্গা, অপরাজিতা-দুর্গা, বনদুর্গা, নিস্তারিণী-বনদুর্গা, অন্নপূর্ণা-দুর্গা, জগদ্ধাত্রী-দুর্গা প্রভৃতি। তারপর দেবী কালিকা যেমন মহাবিদ্যা, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যা, তেমনি নবদুর্গা-দুর্গারও ন'টি মূর্তি কল্পনা ক'রে পূজা করা হয় (এখনও হাওড়া, শিবপুরে এই নবদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে)। দুর্গাদেবীর প্রচলিত ধ্যানে অষ্টশক্তির কল্পনা করা হয়েছে, আর ঐ অষ্টশক্তি দেবী দুর্গারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, অর্থাৎ অভিন্ন রূপ—

'উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা।
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্।'

৩। পুরাণগুলিতেও পূজা-সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়।

দশভুজা-দেবী অষ্টশক্তিদ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিতা। দেবীপূজার প্রারম্ভে দেবীকে পূজামণ্ডপে আবাহনের সময়ে ঐ অষ্টশক্তিকেও আবাহন করতে হয়—"ওঁ আগচ্ছ মদ্‌গৃহে দেবী অষ্টাভিঃ শক্তিভিঃ সহ।" দেবীর নাম ভগবতী, কালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী প্রভৃতি। কলাবৌ এবং নবপত্রিকাও দেবীর অভিন্ন রূপ, এজন্য নবপত্রিকার (রম্ভা, কচু, হরিদ্রা, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান, ধান্য প্রভৃতি) পূজার বিধি আছে। তাছাড়া দেবী ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, বারাহী, নৃসিংহ, ইন্দ্রানী, চামুণ্ডা, কাত্যায়নী, কালী প্রভৃতি। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজায় কাত্যায়নীর পূজার পরই শ্রীশ্রীনবদুর্গার পূজা করা হয়। কাত্যায়নীর প্রণামমন্ত্র—

ওঁ কাত্যায়নীং দশভুজাং মহিষাসুরমর্দিনীম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং বরদাং প্রণমাম্যহম্॥

নবদুর্গার প্রণামমন্ত্র—

ওঁ চণ্ডিকে নবদুর্গে ত্বং মহাদেব মনোরমে।
পূজাং সমস্তাং সংগৃহ্য রক্ষ মাং ত্রিদশেশ্বরি॥

(১) দেবী দুর্গার ধ্যান—

ওঁ জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
• • •
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

দেবী দুর্গার অপর ধ্যানমন্ত্রও আছে।

(২) দেবী অপরাজিতার ধ্যান—

ওঁ স্মিতমুখীং পীতবস্ত্রামলঙ্কৃতামুপরিস্থিতে।
দক্ষিণে করে খড়্গাং বামে চর্ম, দক্ষিণেঽধোহস্তে,
বরং বামেঽভয়ং বিভ্রতীং ত্রিনেত্রান্॥

অপরাজিতাপূজায় দেবীর দক্ষিণে জয়া ও বামে বিজয়াদেবীর চিন্তা ও পূজা করতে হয়।

(৩) দেবী কাত্যায়নী-দুর্গার ধ্যান—

ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ,
শঙ্খং চক্রধনুঃশরাংশ্চ দধতীং নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কনরণৎকাঞ্চীকণত্নূপুরা,
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥

এখানে দেবীর 'চতুর্ভির্ভুজৈঃ'—চারটি ভুজ বা হস্ত বর্ণিত। তাছাড়া দশভুজা-মৃন্ময়ী-প্রতিমাও শাস্ত্রসম্মত—'প্রবক্ষ্যামি রূপং দশভুজস্যথা'। কাত্যায়নীর ভিন্ন ধ্যান আছে—'ওঁ সব্যপাদ সরোজেনালঙ্কতোরু।.....'

(৪) সন্ধিপূজায় দেবীকে আদ্যাশক্তি কালী-রূপে চিন্তা করা হয়। তখন দেবীর ধ্যান—

ওঁ কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী।
বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা॥
দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥

দেবী দুর্গা যে দেবী কালিকার অভিন্ন রূপ বা মূর্তি তা অষ্টমী-নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজার ধ্যানমন্ত্র প্রমাণ করে।

(৫) নিস্তারিণী-বনদুর্গার ধ্যান—

ওঁ দেবী দানবমাতরং নিজমদাঘূর্ণন্মহালোচনাং,
দংষ্ট্রাভীমমুখীং জটালিবিলসন্মৌলীং কপালস্রজম্।
বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্দ্রহারোজ্জ্বলাং,
সর্পাবদ্ধনিতম্ববিম্ববিপুলাং বাণানাং ধনুর্বিভ্রতীম্॥

(৬) জয়দুর্গার ধ্যান—'ওঁ কালাভ্রভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং····'—প্রভৃতি।

দেবী দুর্গা বিশ্বপ্রসবিনী ও জগজ্জননী মহাপ্রকৃতিরই প্রতিমূর্তি। কালে ও অকালে—বসন্তকালে ও শরৎকালে (উভয় সময়েই) দেবীর পূজায় বিশ্বকল্যাণ সাধিত হয়।

●

॥ বৈষ্ণবী-শক্তি চণ্ডী ॥

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

পুরাণ-বর্ণিতা মহিষমর্দিনী চণ্ডী দুর্গা-পার্বতীর সঙ্গে অভিন্না হয়ে শিবগেহিনী শিবানীরূপে স্বীকৃতা এবং পূজিতা হন। দেবী-প্রতিমার চালচিত্রে মাথার উপরে শিবের চিত্রপট অংকিত থাকে। দুর্গাপূজার সঙ্গে দেবাদিদেবের পূজাও নির্দিষ্ট। বঙ্গবাসী মহিষমর্দিনী চণ্ডীকে আদরিণী কন্যা উমারূপে গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। অসম-বয়ে উমার বিবাহ হয়েছে। বৃদ্ধ নিঃস্ব ভিখারী ধুস্তুর গঞ্জিকাসেবী মহাদেবের পত্নী হয়ে স্বর্ণপ্রতিমা দশভূজা উমার দুঃখের অন্ত নেই। তাঁর জন্য পিতা গিরিরাজ আর মাতা মেনকা তথা সমগ্র বঙ্গবাসীর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। তাই মা মেনকার কাতর অনুনয়ে গিরিরাজ বৎসরে মাত্র একবার আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত মাত্র তিনদিনের জন্য ভোলানাথের অনুমতি নিয়ে ঘরে আনেন উমাকে। এই তিনটি দিন প্রিয়তমা কন্যাকে কাছে পেয়ে আনন্দ-উৎসবে কোথা দিয়ে দিন কেটে যায় বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধ নরনারীর। চতুর্থদিনে অর্থাৎ দশমীতে বৃষবাহন ভোলানাথ এসে হাজির হন, মা মেনকার কাতর ক্রন্দন ব্যর্থ হয়—যোগেশ্বর মহাদেব প্রিয়তমা পত্নীকে নিয়ে যাত্রা করেন কৈলাসে। এই বিশ্বাস—এই হাসিকান্না আনন্দ-শোকের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে আগমনী বিজয়ার গান—বাঙ্গালী ভক্ত-কবির আন্তরিক ভক্তির অর্ঘ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে দুর্গাপূজার মূল আকর গ্রন্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর

উপাখ্যানে শিবের সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শিবের যতটুকু সম্পর্ক শিবের সঙ্গে তার বেশী নয়। বরঞ্চ বিষ্ণু-নারায়ণের সঙ্গেই দেবীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর বোধ হয়।

চণ্ডী-উপাখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহিষাসুরের অত্যাচারের কাহিনী শুনে প্রথম কুপিত হয়েছিলেন বিষ্ণু, তৎপরে শিব-শম্ভু।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রুকুটি কুটিলাননৌ॥ (চণ্ডী ২।৯)

তারপর তেজ নির্গত হয়েছিল প্রথমে ক্রুদ্ধ বিষ্ণুর মুখ থেকে, তৎপরে শিব ও অন্যান্য দেবতাদের মুখ থেকে।

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥ (চণ্ডী ২।১০)

শিব বিষ্ণু ব্রহ্মা ছাড়াও অন্যান্য দেবতাদের বদনমণ্ডল থেকে নির্গত তেজ একত্র সমন্বিত হয়ে এক অপূর্ব জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি পরিগ্রহ করে।

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
* * *
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেব শরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥ (চণ্ডী ২।১১, ১৩)

সমস্ত দেবতাদের তেজোরূপা যে নারীমূর্তি তিনিই মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী—মহাশক্তি—বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিলয়কারিণী। কোন্ দেবতার তেজে দেবীর কোন্ অঙ্গ গঠিত হয়েছিল চণ্ডীর উপাখ্যানে তারও বিবরণ আছে। শিবের তেজে নির্মিত হয়েছিল দেবীর মুখ, যমের তেজে কেশ, বিষ্ণুর তেজে বাহুসমূহ, চন্দ্রের তেজে স্তনদ্বয়, ইন্দ্রের তেজে দেহমধ্যভাগ ইত্যাদি। দেবীর কায়াগঠনে অন্যান্য দেবতাদের ভূমিকা যতটুকু শিবের ভূমিকা তার থেকে বেশী নয়। দেবী কায়া পরিগ্রহ করলে দেবতারা নিজ নিজ অস্ত্র দিয়ে তাঁকে সজ্জিত করলেন। এক্ষেত্রেও মহাদেব অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে সমান অংশ গ্রহণ করেছেন। শিব দেবীকে দিয়েছিলেন শূল, কৃষ্ণ দিয়েছিলেন চক্র, ইন্দ্র দিলেন বজ্র, ব্রহ্মা দিলেন কমণ্ডলু। শিবের সঙ্গে চণ্ডীর সম্পর্ক এইটুকু।

চণ্ডীর চতুর্থ অধ্যায়ে দেবগণকৃত দেবীস্তবে বলা হয়েছে—গৌরী ত্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা (৪।১১)। শশি মৌলি অর্থাৎ শিব। দেবীর প্রতিষ্ঠা শিবে। শিবে প্রতিষ্ঠা বললে শিব-পত্নী বোঝাতে পারে। কিন্তু শিবের উপরেও যিনি প্রাধান্য বিস্তার করেছেন—এমন অর্থও ত হতে পারে। দেবতেজঃ সম্ভূতা দেবী শিবা নামেও অভিহিতা—অস্যাসাঞ্চৈব দেবানাং সম্ভবত্তেজসাং শিবা। (২।১৮)। শুম্ভ নিশুম্ভ বধের প্রাক্কালে দেবগণকৃত চণ্ডীস্তুতিতে দেবীকে 'শিবে' বলে সম্বোধন করা হয়েছে—

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ (চণ্ডী ১১।১০)

এখানে শিবা অর্থে কল্যাণকারিণীও হতে পারে, আবার শিবানীও হতে পারে। অনুরূপভাবে ত্র্যম্বকা শব্দে শিবপত্নী এবং ত্রিনয়নবিশিষ্টা—দুই-ই হতে পারে। সুতরাং মহিষাসুরঘাতিনী শুম্ভনিশুম্ভপ্রমথিনী চণ্ডী যে শিব-গৃহিনী তেমন সম্পর্ক উল্লেখ কোথাও পাই না। শুম্ভ দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে সকল দেবতার শক্তি দেবীকে সাহায্য করেছিলেন। সেই সময়ে ব্রহ্মাণী, কৌমারী, বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতির সঙ্গে মাহেশ্বরীও দেবীর সহায়তায় অগ্রসর হয়েছিলেন।

কিন্তু বিষ্ণুর সঙ্গে চণ্ডীর সংযোগ গভীরতর। চণ্ডী উপাখ্যানের প্রথম অধ্যায়েই মধুকৈটভবধ-প্রসঙ্গে দেবী চণ্ডী বিষ্ণুমায়ারূপে উপস্থাপিতা হয়েছেন। দেবী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা—

নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ। (চণ্ডী ১।৫৪)
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্রকৃতালয়াম্॥ (চণ্ডী ১।৬২-৬৩)

বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী বিষ্ণুমায়া চণ্ডী ব্রহ্মার স্তবে প্রীতা হয়ে বিষ্ণুর নাসিকা, বাহু, চক্ষু, নেত্র ও বক্ষঃস্থল থেকে বিনির্গতা হয়ে ব্রহ্মার প্রত্যক্ষদর্শনের বিষয়ীভূতা হলেন। যোগ-নিদ্রামুক্ত বিষ্ণু স্বীয় কর্ণমলজাত মধু ও কৈটভ দানবদ্বয়কে বধ করেছিলেন। মহিষাসুর বধের পর দেবগণ দেবীর স্তুতি-প্রসঙ্গে দেবীকে বিষ্ণুর হৃদয়স্থিতা লক্ষ্মী বলে উল্লেখ করেছেন—

শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়ৈককৃতাধিবাসা। (চণ্ডী ৪।১১)

শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের পূর্বে দেবতারা বিষ্ণুমায়া চণ্ডীর স্তুতি করেছিলেন—'দেবীং বিষ্ণুমায়াং প্রতুষ্টুবুঃ' (৫।৭)। এই স্তবেও দেবতারা বলেছেন—যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা (৫।১৪)। শুম্ভ বধের পর দেবতারা দেবীর স্তব করে বলেছেন—'ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্ত-বীর্যা'—তুমি অনন্তবীর্যশালিনী বৈষ্ণবী শক্তি। এই স্তুতিতে দেবগণ বারংবার 'নারায়ণি নমোঽস্তুতে' বলে স্তুতিনতি করেছেন। এই স্তবেই দেবগণ বলেছেন—

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥ (চণ্ডী ১১।১৭)

শঙ্খচক্রগদা ও ধনুরূপ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রধারিণী, হে বৈষ্ণবীরূপিণী, হে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।

এই স্তুতিতে দেবী বরাহরূপিণী, নৃসিংহরূপিণী। অবশ্য তিনি মাহেশ্বরী, কৌমারী, ঐন্দ্রী প্রভৃতিও। অর্থাৎ তিনি সর্বদেবময়ী। দেবীর ভাবী অবতারের অন্যতমা—'নন্দগোপগৃহেজাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা' (১১।৪২) বিষ্ণুমায়া যোগনিদ্রা। সুতরাং দেবী চণ্ডী বিষ্ণুমায়া ও বৈষ্ণবী শক্তিরূপে বারংবার অভিহিতা, বর্ণিতা এবং স্তুতা হয়েছেন।

মহাভারতে দুটি দুর্গাস্তব আছে। একটি বিরাটপর্বে যুধিষ্ঠির-কৃত দুর্গাস্তব, অপরটি ভীষ্মপর্বে অর্জুনকৃত। দুর্গাস্তব যুধিষ্ঠির-কৃত স্তবে দেবী দুর্গা নারায়ণপ্রিয়া নন্দগোপকন্যা যোগমায়া কৃষ্ণভগিনী—

যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্॥

কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়করীম্।
শিলাতটবিনিক্ষিপ্তমাকাশং প্রতি গামিনীম্॥
বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্যবিভূষিতাম্॥
(বিরাট পর্ব ৭।১-৪)

যশোদাগর্ভজাতা—নারায়ণের প্রিয়তমা, নন্দগোপকুলে জাতা, কংসধ্বংসকারিণী, প্রস্তরগাত্রে নিক্ষিপ্তা হয়ে আকাশে উড্ডীনা, বাসুদেবের ভগিনী, দিব্যমাল্যভূষিতা।

অপর স্তবটিতেও দেবী কৃষ্ণা, কৈটভনাশিনী, গোপেন্দ্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অনুজা ও নন্দবংশজাতা। (ভীষ্মপর্ব ২৩ অঃ)। কৃত্তিবাসী রামায়ণেও দেবী নীলকণ্ঠপ্রিয়া নারায়ণী নিরাকারা। (লংকাকাণ্ড)।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেবী চণ্ডী শিব-গৃহিণী শিবানী উমার সঙ্গে অভিন্না হয়ে গেলেন। বিষ্ণুশক্তির পরিবর্তে তিনি হলেন শিব-শক্তি। অবশ্য চণ্ডীর উপাখ্যানেই দেবী পার্বতী, অম্বিকা, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি নামেও অভিহিতা। দেবী যে সর্বদেবময়ী,—অর্থাৎ সকল দেবতার তেজ বা শক্তির সমবায়ে উদ্ভূতা, তা দেবীর বহুবিধ নামেও প্রকাশিত।

ঋগ্বেদে বিষ্ণু ও সূর্য এক এবং অভিন্ন। সূর্যরূপী বিষ্ণু তিন পদক্ষেপে বিশ্ব পরিক্রমণ করেন—স্থাবরজঙ্গমের চক্ষু ও আত্মারূপে প্রকাশিত হন—জগতে ঋতুচক্রের এবং দিবা, মাস, বর্ষ ইত্যাদি বিভাগের প্রবর্তন করেন, এই সূর্য-বিষ্ণু ও অগ্নি অভিন্ন। অগ্নির তিন রূপ—সূর্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নি। ভারতীয় দেবতা এক সূর্যাগ্নির তেজোরূপা শক্তির ভিন্ন প্রকাশ। গুণকর্ম অনুসারে একই দেব-সত্তার পৃথক পৃথক সত্তারূপে পৃথক পৃথক দেবতার অস্তিত্ব কল্পিতা সূর্য-বিষ্ণুর তেজোরূপা শক্তিই চণ্ডী দুর্গা। সুতরাং দেবী চণ্ডী অবশই বিষ্ণুশক্তি বৈকবী-মায়া—নারায়ণী। দেবতাদের তেজে তাই চণ্ডীর অবয়ব গঠিত।

রুদ্র ও বিষ্ণু অভিন্ন। একই শক্তির সৃষ্টি, পালন ও লয়ের মূর্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। এই হিসাবে দেবী ব্রহ্মাণী এবং রুদ্রাণীও। চণ্ডীতে তাঁকে পার্বতী বলা হয়েছে, কারণ তিনি হিমালয়ে অবস্থান করেছিলেন—'হিমাচল কৃতাশ্রয়া'। পর্বতরাজকন্যারূপে চণ্ডীতে তাঁকে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি। দেবী যখন অশিব অসুরশক্তি নাশ করেন তখনই রুদ্রশক্তি রুদ্রাণী—শিবানী। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্রী তিনিই—'সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং হেতুভূতে সনাতনি' (১১।১১)। সুতরাং চণ্ডী বৈকবী শক্তি বিষ্ণুমায়া হয়েও শিবশক্তি। যজুর্বেদে রুদ্রের ধ্বংসকার্যের সহায়িকা রুদ্রভগিনী অম্বিকা। অম্বিকা শরৎরূপিণী। অম্বিকা রুদ্রযজ্ঞের অগ্নি এবং শরতে মহামারীর সৃষ্টিকর্ত্রী। রুদ্রভগিনী অম্বিকা পরে বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুমায়ার সঙ্গে মিলিতা হয়ে হলেন শিবগৃহিনী দেবী দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী চণ্ডী। দক্ষরাজদুহিতা সতী এবং পর্বত-রাজকন্যা উমাও এসে মিশে গেলেন চণ্ডীর অবয়বে। দেবী হলেন সর্বশক্তিস্বরূপিনী মহাশক্তি—সর্বদেবময়ী,—সর্বময়ী সর্বরূপিনী হয়েও শর্বানী—শিবানী।

●

॥ মাতৃসঙ্গীত ॥

শিবানন্দ তীর্থনাথ

[শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর নানাপ্রকার ধ্যান সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। পূজাকালে বা পাঠকালে এই ধ্যানগুলি থেকে সাধককে যে কোনও একটি ধ্যান করতে হয়। উক্ত ধ্যানগুলি অবলম্বনে এই মাতৃসঙ্গীতগুচ্ছ রচিত। পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য পাদটীকায় মূল ধ্যানগুলি পাঠান্তরসমেত উল্লেখ ক'রে বঙ্গানুবাদ করলুম। চতুর্থ ধ্যানটি আবার শ্রীশ্রীবগলামুখীদেবীর ধ্যানরূপেও পরিচিত। মূল ধ্যানের পঙ্‌ক্তি-অষ্টকের প্রথম চারটি পঙ্‌ক্তি মাত্র শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর ধ্যানে প্রযুক্ত হয়।]

॥ এক ॥

বন্ধুককুসুমসম রক্তাভ বরণী,
শিবোপরি সমাসীনা কে তুমি জননী।
নবোদিত চন্দ্রকলা, মুকুট করেছে আলা,
কণ্ঠে শোভে মুণ্ডমালা ভব জিনয়নী॥

পুস্তক ও অক্ষমালা ধৃত দুটি করে,
বর ও অভয়মুদ্রা দ্বিভুজেতে ধরে।
পরিধানে রক্তাম্বর, ঘটসম পয়োধর,
আগম-মানিতা দেবী ভবের সরণি॥[১]

॥ দুই ॥

নীলনবঘনদ্যুতি মহেশঘরণী,
জিনয়নে উদ্ভাসিত সুন্দর-বদনী।
অমৃত আলোক ভরা, রক্ত মুকুট-পরা,
ঊর্ধ্বমুখ সুধাভরা পীনোন্নতস্তনী॥

১। ওঁ বন্ধুককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্নমুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্॥
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্।
পুস্তকাক্ষমালাঞ্চ বরাভয়করাং ক্রমাৎ।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুদ্ভরাম্নায়মানিতাম্॥

যিনি বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণা ও শিবোপরি অধিষ্ঠিতা; উদীয়মান চন্দ্রের কলা যার মুকুটে রত্নরূপে বিরাজিত, যিনি মুণ্ডমালা শোভিতা, ত্রিনেত্রা, রক্তবসনা ও ঘটের মত পীনোন্নত স্তনযুগলসংযুক্তা; যিনি চতুর্ভুজে যথাক্রমে পুস্তক ও অক্ষমালা এবং বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধারণ করেন; আগমশাস্ত্র-মানিতা সেই দেবীকে নিত্য উদ্ভমরূপে স্মরণ (ধ্যান) করবে।

রতন নূপুর বাজে চরণকমলে,
কটিতে মেখলা শোভে, হার দোলে গলে।
রতনে মণ্ডিত বস্ত্র, সহস্র ভুজেতে অস্ত্র,
অভীষ্ট প্রদানে কালী বন্দিলে আপনি ॥[১]

॥ তিন ॥

নমঃ চণ্ডী, নমঃ চণ্ডী, নমঃ চণ্ডী, নমো নমো নমঃ চণ্ডিকা,
নমঃ বিশ্বেশ্বরী, নমঃ ত্রিভুবনপালিকা,
নমো নমো নমঃ চণ্ডিকা ॥
মধুকৈটভাদি-দৈত্যবিনাশিনী,
মদমত্তমহিষাসুরমর্দিনী,
ধূম্রলোচনাদি-চণ্ড-মুণ্ডাসুরঘাতিকা,
নমো নমো নমঃ চণ্ডিকা।
নমঃ চণ্ডী, নমঃ চণ্ডী, নমঃ চণ্ডী, নমো নমো নমঃ চণ্ডিকা ॥
রক্তরক্তবীজ-ভক্ষণকারিণী,
শুম্ভনিশুম্ভাদি-অসুরনাশিনী,
প্রচণ্ড প্রমত্ত ভীম যত দৈত্যদলিকা,
নমো নমো নমঃ চণ্ডিকা।
নমঃ চণ্ডী, নমঃ চণ্ডী, নমঃ চণ্ডী, নমো নমো নমঃ চণ্ডিকা ॥
নবকোটী সহচরী দিয়ে ঘেরা,
মহাশক্তি সর্বাপেক্ষা সেরা,
স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলে পরা সিদ্ধিদায়িকা,
নমো নমো নমঃ চণ্ডিকা।
নমঃ চণ্ডী, নমঃ চণ্ডী, নমঃ চণ্ডী, নমো নমো নমঃ চণ্ডিকা ॥[৩]

১। ওঁ কালীং রত্ননিবদ্ধনূপুরলসৎপাদাম্বুজাম্বিতাং
কাঞ্চীরত্নকুলহারললিতাং নীলাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম্।
শূলাদ্যস্ত্রসহস্রমণ্ডিতভুজামূর্ধ্বস্তু পীনস্তনীং
অভীষ্টামৃতরশ্মিরত্নমুকুটাং বন্দে মহেশপ্রিয়াম্ ॥

যাঁর পাদপদ্মযুগল রত্নখচিত নূপুর দ্বারা শোভিত; যিনি অভীষ্টপ্রদায়িনী; যিনি কালী, রত্নময় বস্ত্র ও হার দ্বারা সুশোভিতা; যিনি নীলবর্ণা ও ত্রিনয়নোজ্জ্বলা; যাঁর সহস্রভুজ শূলাদি সহস্র অস্ত্রে মণ্ডিত; যিনি ঊর্ধ্বমুখ পীনস্তনযুগল শোভিতা; যিনি অমৃতরশ্মিযুক্ত-রত্নখচিত মুকুটধারিণী; সেই মহেশপ্রিয়া কালীকে বন্দনা করি।

৩। ওঁ যা চণ্ডী মধুকৈটভাদিদৈত্যদলনী যা মাহিষোন্মূলিনী
যা ধূম্রেক্ষণচণ্ডমুণ্ডমথনী যা রক্তবীজাশনী।
শক্তিঃ শুম্ভনিশুম্ভদৈত্যদলনী যা সিদ্ধিদাত্রী পরা
সা দেবী নবকোটীমূর্তিসহিতা মাং পাতু বিশ্বেশ্বরী।

যে চণ্ডী মধুকৈটভাদি-দৈত্যদলনী, যিনি মহিষাসুরমর্দিনী, যিনি ধূম্রলোচন-চণ্ড-মুণ্ডাসুরসংহারিণী, যিনি রক্তবীজ-ভক্ষয়িত্রী, যে শক্তি শুম্ভনিশুম্ভ-অসুরনাশিনী ও শ্রেষ্ঠা সিদ্ধিদায়িনী, নবকোটী সহচরী পরিবৃতা সেই বিশ্বেশ্বরী দেবী আমাকে পালন (রক্ষা) করুন।

॥ চার ॥

একি অপরূপ রূপের মাধুরী
　　হেরিনু নয়ন ভ'রে,
কহিতে সে কথা অবুঝ রসনা
　　পড়েছে বিষম ঘোরে।
সুধার সাগরে মণিমণ্ডপেতে,
রত্নবেদী এক তাহারি মাঝেতে,
রাজে সিংহাসন উপরেতে তারি,
　　জননী তাহার পরে॥
পীত নহে শুধু তনুর লাবণী,
　　পীতবসন পরণে,
সর্বাঙ্গ ভূষিত পীত মালিকায়,
　　পীতবরণ ভূষণে।
শত্রুজিহ্বা ধরি টানি সব্যহাতে,
দক্ষহস্ত দিয়ে মুদ্গর আঘাতে,
দ্বিভুজাজননী দনুজদলনী
　　পীড়ন তাহারে করে॥[৪]

॥ পাঁচ ॥

বিদ্যুদ্দামসমদ্যুতি তুমি কে জননী,
সিংহপৃষ্ঠে সমাসীনা আলোকি ধরণী।
করবাল-খেট ধ'রে,　　কঙ্কাগণ সেবা করে,
ভয়ঙ্করী মহাভীমা দেবী ত্রিনয়নী॥

৪। ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-
　　সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকমালাভূষিতাঙ্গীং।
　　দেবীং ভজামি * ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং
　　বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাঘাতেন চ দক্ষিণেন
　　পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥

পাঠান্তর :— ১ কনকভূষণমাল্যশোভাং, * নমামি।

সুধাসাগর মধ্যে মণিমণ্ডপ, তন্মধ্যে রত্নবেদী, তার উপরে সিংহাসন। তদুপরি উত্তম পীতবর্ণ, পীতবস্ত্রপরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কার ও মাল্যশোভিতা দেবী উপবিষ্টা। তাঁর হস্তে ধৃত মুদ্গর ও শত্রুজিহ্বা। সেই দেবীকে ভজনা করি। বামহস্তে শত্রুর জিহ্বাগ্র ধারণ ক'রে তিনি দক্ষিণহস্তের গদাঘাতে তাকে পীড়ন করছেন। পীতবস্ত্রাবৃতা সেই দ্বিভুজা দেবীকে প্রণাম করি।

চক্র, ধরালি, খেট, হস্ত ধৃত অস্ত্র,
বিশিখাদি, চাপ, গুণে সুরাসুর ত্রস্ত।
তর্জনীমুদ্রা যে করে, শিরে শোভে শশাধরে,
অনলস্বরূপা দুর্গে ত্রিলোক-বরণী ॥[৩]

●

॥ অব্যাকৃতা ॥

ডক্টর রমা চৌধুরী

"হেতুঃ সমস্তজগতাঃ ত্রিগুণাপি দোষৈর্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা।
সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূতমব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা ॥"

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৬—৭

সমস্ত জগতের হেতুভূতা তিনি।
ত্রিগুণা তাঁকে জানেন না দোষদুষ্ট ॥
জানেন না হরি-হরাদি দেবতা।
জানেন না সংসার-কামনা-পুষ্ট ॥
● ● ●
সর্বাশ্রয়া তিনি সর্বপালক
জগৎ তাঁর অংশস্বরূপ ॥
তথাপি অবিকৃতা তিনি সদা
পরমা আদ্যা প্রকৃতিরূপ ॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৬—৭

৩। ওঁ বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং,
কন্যাভিঃ করবাল-খেট-বিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্।
হস্তৈশ্চক্রধরালি-খেট*-বিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং,
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গে ত্রিনেত্রাং ভজে ॥

পাঠান্তর :— হস্তৈশ্চক্রধরাদিখেট।

বিদ্যুৎমালার মত প্রভাময়ী; সিংহপৃষ্ঠারূঢ়া; ভয়ঙ্করী; করবাল (খড়্গ) ও খেট (ঢাল)-শোভিত হস্তযুক্তা কন্যাগণ (শক্তিগণ)-কর্তৃক সেবিতা; হস্তসমূহে চক্র, ধরালি, খেট, বিশিখসমূহ, চাপ, গুণ ও তর্জনীমুদ্রাধারিণী; জ্যোতির্ময়ী; চন্দ্রকলাশোভিতা; ত্রিনেত্রা দুর্গাদেবীকে ভজনা করি।

শ্রীশ্রীমাতৃলীলাতত্ত্বের শ্রেষ্ঠগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই অনুপম শ্লোকে ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠ অংশ বেদান্তের একটি মূলীভূত সমস্যার আভাস দেওয়া হয়েছে অতি-সুন্দরভাবে। সেটি হ'ল এই—

ব্রহ্ম, অথবা তাঁর সঙ্গে অভিন্ন, শক্তিস্বরূপা পরমা জননী, সমস্ত জগতের "হেতুঃ", অর্থাৎ, তিনিই পরমকারণ যিনি জীব-জগৎরূপ কার্যের স্রষ্টা। বলাই বাহুল্য যে, এটি শঙ্করের একত্ববমূলক অদ্বৈত-বেদান্ত ব্যতীত, রামানুজ-নিম্বার্কাদির ত্রিতত্ত্বমূলক বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদাদির মতবাদ। শঙ্করের মতে, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, জীব-জগৎ মিথ্যা মায়ামাত্র, এবং সেজন্য ব্রহ্ম কারণ নন, জীব-জগৎও কার্য নয়, বস্তুতঃ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম স্রষ্টা নন কোনোক্রমেই। কিন্তু রামানুজ-নিম্বার্কাদির মতে, ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ সমান সত্য এবং কারণ-ব্রহ্ম থেকেই সত্য-সত্যই জীব-জগৎ কার্যরূপে সৃষ্ট হয়। এই মতবাদের নাম 'পরিণামবাদ', এবং এই সুযোগ্য নামটি থেকেই এই মতানুসারী সৃষ্টিকার্যটির প্রক্রিয়ার বিষয় সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। এই প্রক্রিয়া অনুসারে, কারণ, অথবা, উপাদান-কারণ, স্বয়ং কার্যে পরিণত হয়েই, তাকে সৃষ্ট করে। যেমন, একটি মৃন্ময় ঘটকে আমরা কার্যরূপে দেখছি। এক্ষেত্রে মৃৎপিণ্ড 'উপাদান-কারণ', যন্ত্রাদিসমন্বিত, তাদৃশ-শক্তিধারী কুম্ভকার 'নিমিত্ত-কারণ', এবং নিমিত্ত-কারণ উপাদান-কারণ মৃৎপিণ্ডকে নিয়ে, স্বশক্তিবলে তার থেকে একটি সুন্দর ঘটের সৃষ্টি করেন এবং মৃৎপিণ্ডও মৃন্ময় ঘটে পরিণত হয়।

আসুন, আমরাও এই মূলীভূত তত্ত্বটিকে ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা করি সম্প্রদায়। এক্ষেত্রে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের বাইরে কিছুই নেই বলে, ব্রহ্মকেই অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান-কারণরূপে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ, এস্থলে, স্বয়ং ব্রহ্ম নিজেই (নিমিত্ত-কারণ) নিজেকে (উপাদান-কারণ) জীব-জগতে পরিণত করেন। অতএব এই উভয় দিক থেকেই তিনি অসংখ্য পরিবর্তনভাগী হন। অথচ সর্ববাদিক্রমে, তিনি "নির্বিকার", অথবা, সকল প্রকার "বিকার", অথবা পরিবর্তনরহিত। সেজন্য সাধারণ ক্ষেত্রে যে ষড়্‌বিকার অবশ্যম্ভাবী তা তাঁর নেই একেবারেই। যথা জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, জরা ও মরণ। তাহলে, তিনি পুনরায় জীব-জগতে পরিণত হ'য়ে পরিবর্তনভাগী হবেন কিরূপে? কারণ, তা' যে হবে একটি বৃহৎ স্ববিরোধদোষ।

বস্তুতঃ, ত্রিতত্ত্ববাদী ও পরিণামবাদী বৈদান্তিকগণের এইটিই হ'ল একটি মূলীভূত সমস্যা—নির্বিকারের পরিণাম। এস্থলে তাঁরা একটি সুকঠিন উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হন অনিবার্যভাবেই—"যদি ব্রহ্ম জীব-জগতে পরিণত হন, তাহলে তিনি নির্বিকার থাকেন না; এবং যদি ব্রহ্ম জীব-জগতে পরিণত না হন, তাহলে জীব-জগতের সৃষ্টিই হয় না।

হয় তিনি জীব-জগতে পরিণত হন; নয় তিনি জীব-জগতে পরিণত হন না।

সুতরাং, হয় তিনি নির্বিকার থাকেন না; নয় জীব-জগতের সৃষ্টিই হয় না। তাহলে উপায়? উপায়ের প্রচেষ্টা করেছেন সকল ত্রিতত্ত্ববাদী ও জগৎসত্যত্ববাদী বৈদান্তিকগণ যথাসাধ্য—দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের দিক থেকে তার প্রকৃত মূল্য যাই হোক না কেন।

তাঁদের মতানুসারে, প্রথমতঃ, প্রত্যেক পরিণাম হলেই যে পরিবর্তন হতেই হবে তা একেবারেই নয়। স্বয়ং উপনিষদেই এর উল্লেখ আছে—

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্লতে চ।
যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি।
তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।" —মুণ্ডকোপনিষদ ১।১।৭

উর্ণনাভ যেরূপে করে সৃষ্টি ও গ্রহণ।
যেরূপে হয় পৃথিবী থেকে ওষধি সৃষ্ট।
যেরূপে হয় পুরুষ থেকে কেশলোমাদির উদ্ভব।
সেরূপেই হয় অক্ষর থেকে সৃষ্ট বিশ্ব গরিষ্ঠ।

অর্থাৎ, এস্থলে অবিকৃত-পরিণামের ঋষি সর্বজনজ্ঞাত তিনটি উদাহরণ দিচ্ছেন—উর্ণনাভ (মাকড়সা) স্বীয় দেহ থেকে কারণরূপে কার্য তন্তুর সৃষ্টি করে; অথচ নিজে অবিকৃতই থাকে। জীবিত পুরুষ থেকে কারণরূপে, কার্য কেশলোমাদির উদ্ভব হয়; অথচ কারণ পুরুষ অবিকৃতই থাকে। পৃথিবী থেকে কারণরূপে কার্য ওষধি প্রভৃতির উদ্ভব হয়; অথচ কারণ পৃথিবী অবিকৃতই থাকে।

তাহলে সর্বশক্তিমান, অঘটনঘটনপটু অসংখ্য-অনন্তদৈব গুণাধার ব্রহ্মেই বা কেন অবিকৃত-পরিণাম সম্ভবপর হবে না?

এতদ্ব্যতীত, যুক্তির সাহায্যেও দ্বিতত্ত্ববাদী বৈদান্তিকগণ তাঁদের এই অভিনব মতবাদ স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। বস্তুতঃ, পরিণামজনিত পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ কি? তা' হল এই যে, পরিবর্তনীয় প্রথম দ্রব্য অথবা কারণটি একটি ভিন্ন পরিবর্তিত দ্বিতীয় দ্রব্য অথবা কার্যে পরিণত হয়, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, বহির্গত। যথা, কারণ 'মৃৎপিণ্ড' তার বহির্গত একটি ভিন্ন দ্রব্য 'মৃন্ময় ঘটে' পরিণত ও পরিবর্তিত হয়—এক্ষেত্রে দ্বিতত্ত্ব-বাদিগণের মতে কারণ 'মৃৎপিণ্ড' এবং কার্য 'মৃন্ময় ঘট' এক ও অভিন্ন নয় একেবারেই, যেহেতু কারণ ও কার্য স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হলেও, গুণতঃ ভিন্ন, এবং শেষ পর্যন্ত গুণই যেন স্বরূপ থেকে বড় হয়ে উঠে কারণ ও কার্যের স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করছে। সে যাহোক, এস্থলে কারণ মৃৎপিণ্ড স্ব-বহির্ভূত কার্য মৃন্ময় ঘটে পরিণত হ'য়ে পরিবর্তিত হচ্ছে।—কিভাবে? কেবলমাত্র গুণগতভাবে, স্বরূপগতভাবে নয় একেবারেই। যথা, গুণের দিক্ থেকে বলা চলে যে, মৃৎপিণ্ড ছিল গোলাকার; মৃন্ময় ঘট হয়ে পড়ল ডিম্বাকার। মৃৎপিণ্ড ছিল জলাহরণে অক্ষম। মৃন্ময় ঘট হয়ে পড়ল জলাহরণে সক্ষম ইত্যাদি। এস্থলেও কিন্তু আমরা দেখ্‌ছি যে, 'পরিণামের' ফলে বিশেষ কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে না, যেহেতু আসল ও প্রধান বস্তু যে 'স্বরূপ', তা'ইত থাকছে অপরিবর্তিত—তার কয়েকটি গুণেরই কেবল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। আমরা যদি সেই শাশ্বত প্রশ্নে ফিরে যাই—'স্বরূপ বড়, না গুণ বড়?'—তাহলে ত' বলতেই হয় যে, 'স্বরূপই' নিশ্চয় 'গুণ' থেকে বড় ব'লে

এস্থলেও ত' সত্যই কোনো পরিবর্তনই নেই, পরিণাম থাকলেও। কারণ, কেবলমাত্র 'গুণের' পরিবর্তনে 'স্বরূপের', বা সমগ্র বস্তুটির পরিবর্তন হবে কেন?

তাহলে, সাধারণ ক্ষেত্রেই যদি এরূপ চিন্তার অবকাশ থাকে, তাহলে ব্রহ্মের ক্ষেত্রে 'পরিবর্তনের' প্রশ্নই উঠে কিরূপে? কারণ, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী ব'লে তিনি বাইরের কোনো ভিন্ন, দ্বিতীয় দ্রব্যে, পরিণত, পরিবর্তিত, রূপান্তরিত হতেই পারেন না একেবারেই। সেজন্য, এস্থলে তিনি নিজেই নিজের মধ্যেই সানন্দে, সাদরে, স্বাচ্ছন্দ্যে, সাগ্রহে যেন পরিণত বা পরিবর্তিত হচ্ছেন। যেমন, যে কোনো ব্যক্তি তাঁর যে কোনো শক্তিকে প্রকাশিত করতেও পারেন, না করতেও পারেন—কিন্তু তাতে ত' তাঁর শাশ্বত সমগ্র স্বরূপের পরিবর্তন সাধিত হয় না। যেমন—দক্ষ কুম্ভকার তাঁর মৃন্ময়-ঘটোৎপাদিকারূপ শক্তিবিশেষ প্রকটিত ক'রে মৃন্ময় ঘট সৃষ্টি করতে পারেন; পুনরায়, না'ও পারেন। তাতে 'নিমিত্ত-কারণ' তাঁর কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না; এবং তাঁর উপাদান-কারণেও স্বরূপতঃ কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না; কেবল গুণতঃ হয়—যা' পূর্বেই বলা হ'ল।

সেজন্য, ব্রহ্মের ক্ষেত্রেও, সর্বব্যাপী ব্রহ্ম স্ব-বহির্ভূত ও স্ব-ভিন্ন বাইরের কোনো বস্তুতে পরিণত ও পরিবর্তিত হতে পারেন না। তিনি কেবল, যা' পূর্বেই বলা হল, সানন্দে, স্বেচ্ছায় নিজেই নিজের মধ্যে পরিণত ও পরিবর্তিত হচ্ছেন, এবং এতে স্বভাবতঃই তাঁর নির্বিকারত্বের বিন্দুমাত্রও হানি হচ্ছে না।

কিন্তু কেন ব্রহ্মের এরূপ আচরণ? কেন তিনি এইভাবে অযথা নিজেই নিজের মধ্যে পরিণত বা পরিবর্তিত হচ্ছেন। কি প্রয়োজন ছিল তাঁর এরূপ আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন ব্যবহারের? না, এ'ত অর্থহীন নয়—এ' তাঁর স্বরূপজাত ব্যাপার। তাঁর স্বরূপ কি? এককথায় "আনন্দ"—সৎ, চিৎ, আনন্দ, সৎ ও চিৎ-র শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'আনন্দ'; এবং আনন্দেরও স্বরূপ হল 'প্রকাশ', অন্তরের আনন্দের বাইরের "লীলায়" প্রকাশ। 'লীলা' কি? 'লীলা' ক্রীড়া বা খেলা। মনে গভীর আনন্দ হলে, স্বভাবতঃই তা' প্রকাশের পন্থা অন্বেষণ করে'—এবং 'লীলাই' ত' সেই শ্রেষ্ঠ পন্থা। সেজন্যই সৃষ্টি প্রসঙ্গে, বেদান্তদর্শনের বাণী, মধুর-অভয়-অশোক-অমৃত বাণী—

"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ (ব্রহ্মসূত্র ২।১।৩৩) অর্থাৎ" লোকে যেরূপ দেখা যায়—কেবল সেরূপ লীলাই মাত্র"—সৃষ্টি কেবল লীলাই মাত্র। লোকে কি দেখা যায়? লোকে দেখা যায় যে, সার্বভৌম, দিগ্বিজয়ী নৃপতির কোনো অভাব নেই বলেই পরিপূর্ণ আনন্দ আছে; এবং সেই সুগভীর আনন্দের আবেগে তিনি নানাপ্রকার ক্রীড়ায় রত হন নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, নির্দ্বিধায়। একই ভাবে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, আনন্দরসঘন ব্রহ্ম লীলাচ্ছলে নিজেকে যেন দুই অংশে বিভক্ত করছেন—কারণ একাকী ত' খেলা জমেনা, খেলার সঙ্গী ত' চাই-ই—যেজন্য গুরুগম্ভীর সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ—বৃহদারণ্যকোপনিষদকেও বলতে হয়েছে সাধারণ জনদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে লীলাচঞ্চল, মধুরমোহন, আবেগরসঘন ভাবে—

"স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয় মৈচ্ছৎ। স ইমমেবাত্মানং

ধেধাপাতয়ত: পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মা-দয়মাকাশ: স্ত্রিয়া পূর্যত এব, তাং সমভবত্ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।" (১।৪।৩)

"তিনি আনন্দলাভ করলেন না। সেজন্য কেহ একাকী আনন্দলাভ করেন না। তিনি দ্বিতীয় একজনকে ইচ্ছা করলেন। তিনি নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করলেন। তার থেকে পতি ও পত্নীর উদ্ভব হল। সেজন্য উভয়ের প্রত্যেকে একটি পূর্ণবস্তুর সমান অর্দ্ধাংশই মাত্র। এই কারণে, পতির জীবনের শূন্যস্থান পত্নীর দ্বারাই পূর্ণ হয়। উভয়ের সপ্রেম মিলনের ফলে, মানবগণের উৎপত্তি হয়।"

এরূপে সর্বব্যাপী, নিত্য, নির্বিকার, শান্ত, পূর্ণ, আনন্দরসঘন ব্রহ্ম লীলাভরে নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করলেন—ব্রহ্ম ও পরাশক্তি—রাধা বা উমা পরমা জননী, হ্লাদিনীরূপিণী, অনন্ত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঐশ্বর্যবিমণ্ডিতা, ব্রহ্মের অংশরূপা, সমান দ্বিতীয়রূপা, ভিন্নরূপা হয়েও প্রকৃতপক্ষে তাঁর সঙ্গে এক ও অভিন্না। এরূপে ব্রহ্ম ও পরাশক্তি নিরন্তর সপ্রেমে, সানন্দে, স্বচ্ছন্দে লীলায় রত কত রঙ্গে-ভঙ্গে, কত সৌন্দর্যে-মাধুর্যে, কত তৃপ্তিতে-শান্তিতে, কত আনন্দে-অমৃতে, কত বৈভবে-বৈচিত্র্যে। সেই আধ্যাত্মিক, সার্বজনীন লীলার সঙ্গীতের সুরে-সুরে, নৃত্যের তালে-তালে, বাদ্যের ছন্দে-ছন্দে, আনন্দের স্রোতে-স্রোতে, শান্তির উৎসে-উৎসে যে অপরূপ অমৃত-সুধা-মধু-রস উত্থিত হচ্ছে—তাই ত' হল সৃষ্টি, তাই ত' হল সৃষ্ট, তাই ত' হলাম আমরা, তাই ত' হল আমাদের আদরের জগৎ। কে বলে—আমরা দীন-হীন, ক্ষুদ্র-ক্ষীণ, পাপী-তাপী, জড়-মৃত, অপূর্ণ-অশুদ্ধ, নিরানন্দ-নিরাশ্রয়? কে বলে—জগৎ সর্ববিঘ্নাধার, সর্বদুঃখদায়ক, সর্বনৈরাশ্যব্যঞ্জক? না, ঠিক তার বিপরীত। অকারণেই কি তুলমূল্য তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। তেন জাতানি জীবন্তি। তৎ প্রয়ন্ত্যভি-সংবিশন্তীতি।" (৩।৬)

"আনন্দ থেকেই এই জগতের সৃষ্টি; আনন্দেই তার স্থিতি; আনন্দেই তার লয়।"

কোথায় বা অভাব, কোথায় বা বিকারভাগিতা; কোথায় বা পাপজনকতা; কোথায় বা তাপপ্রবলতা; কোথায় বা সংসারচক্রবিঘূর্ণন; কোথায় বা অদৃষ্টবন্ধন? কোথাও কিছুই নেই—আছে কেবল একটি সত্য ও শাশ্বত পদার্থ—"আনন্দ"। সেইটিই ত' হল যুগযুগান্তব্যাপী, বিরাট-বিশাল, গভীর-গম্ভীর ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধর্ম ও দর্শন, সাধনা ও আরাধনা, ভাব ও ভাবনা, আবেগ ও আকূতি, লক্ষ্য ও আদর্শের চরমা ও পরমা কথা, একমাত্র কথা—"আনন্দ"। শ্রীশ্রীমাতৃপূজারও সমভাবে, এইটিই ত' হল মর্মবাণী—"আনন্দ", আনন্দময়ীর আগমনে "আনন্দ"—স্বার্থপর, স্বতন্ত্র, সঙ্কীর্ণ "সুখ" নয়, পার্থিব "ভোগ" নয়, সাংসারিক "কামনা" নয়—নিঃস্বার্থ, সর্বব্যাপী, সার্বজনীন "আনন্দ"—সকলকে নিয়ে, সকলকে দিয়ে সকলকে হাসিয়ে, সকলকে মাতিয়ে, সকলকে উঠিয়ে, যে "আনন্দ", তাই ত' হল প্রকৃত-প্রকৃষ্ট আনন্দ; তাই ত' হল প্রকৃত-প্রকৃষ্ট মুক্তি; তাই ত হল প্রকৃত-প্রকৃষ্ট পূর্ণতা ও সার্থকতা।

আসুন, কবি রবীন্দ্রনাথের সেই অনুপম আনন্দবাণী আমরাও এই আনন্দের দিনে আমাদের চিত্তবীণায় ঝঙ্কৃত করে নিই—

"আনন্দে প্রভাতে জাগ্রত হও, আনন্দে দিনের কর্ম কর; দিবাবসানে নিঃশব্দ, স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে আনন্দে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দাও। কোথাও যাইতে হইবে না, কোথাও খুঁজিতে হইবে না, সর্বত্রই যে আনন্দরূপে তিনি বিরাজ করিতেছেন, সেই আনন্দরূপের মধ্যে তুমি আনন্দলাভ করিতে শিক্ষা কর—যাহা-কিছু তোমার সম্মুখে উপস্থিত, পূর্ণ আনন্দে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইবার সাধনা করো।"

"একবার যদি চোখ খোলে, যদি দৃষ্টি পাই, হৃদয়ের মধ্যে নিমেষের জন্যও যদি সেই আনন্দ সপ্তকে সপ্তকে বাজিয়া উঠে, যে আনন্দে জগদ্ব্যাপী সমস্ত সুর মিলিয়া যায়, তবে যেখানেই চোখ পড়ে, সেখানে তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। বন্ধে-বন্ধনে, দুঃখে-দারিদ্র্যে, অপমানে-অপকারে তাঁহাকেই দেখি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।"

●

॥ শাক্তপদসাহিত্যে সুভাষিত সমীক্ষা ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

বাংলাসাহিত্যের যে দুই শাখা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ক্ষেত্রকে বিপ্লাবিত করিয়া গঙ্গাযমুনার মতো বহিয়া যাইতেছে সেই দুইটি হইল শাক্তপদাবলী ও বৈষ্ণব-পদাবলী। আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কবি রামপ্রসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশশতাব্দী পর্যন্ত বহু কবির ভাবনার ধারা শাক্তপদসাহিত্যের সুরতরঙ্গিণীকে কল্লোলিনী করিয়া রাখিয়াছে। বাঙ্গালী বারংবার সেই পতিতোদ্ধারিণীর পূতসলিল স্পর্শে নিজেকে ধন্য করিয়াছে, করিয়াছে সঞ্জীবিত সকলকে।

বাঙ্গালীর মনের কথা ইহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, শাশ্বত সত্য হইয়াছে প্রকাশিত। তাই অন্তরের প্রীতিবিমিশ্র আগ্রহবশে শাক্তগীতিগুলির বহুপাঠ ও বহুশ্রুতি তাহার পদ-কিনিচয়কে সুভাষিতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শাক্তসাহিত্যের জনপ্রিয়তা প্রাক্-অর্বাচীনের বিভেদ ঘুচিয়াছে, তাহার বাক্যাবলী জনসাধারণের মুখে মুখে সঙ্গীত ও আবৃত্ত হইয়া ফিরিয়াছে।

বাঙ্গালীর বাৎসল্যভাবনাই গৌরীকে কন্যার আসনে সমাসীন করিয়াছে, বঙ্গভূমি এবং গিরিপুরীর ভেদ দূর করিয়াছে। বৎসরান্তে তনয়াকে পিতৃগৃহে আনিতে হইবে। মেনা গিরিরাজকে পাঠাইয়াছেন কৈলাসমুখে, অপেক্ষা করিয়া আছেন অধীর প্রতীক্ষায়। বৈরাগী-বাউলের দল খঞ্জনী-একতারা বাজাইয়া বাংলার গ্রামে-গঞ্জে পথে-ঘাটে সোনালী শরতের শিশির-ধোওয়া ভোরের আলো ফুটিতে না ফুটিতে গাহিয়া ফিরিতে থাকে—

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী

P 30410

পদকার দাশুরায় যেন বঙ্গজননীর কোনো প্রতিবেশিনী। দূর হইতে বনসীমান্ত ছাড়াইয়া উমাকে আসিতে দেখিয়া কপাটবরণের ঘরা জাগাইতেছেন।

শাক্তসাহিত্যোদ্ধৃত এই গীতের কথা কি বাঙ্গালী ভুলিবে। নবমীর অন্তে দুর্গার বিদায়। বিজয়া। বাঙ্গালীর আনন্দের হাট যায় ভাঙিয়া। সেই নবমীরাত্রি শেষ হইয়া যাউক্ কোন্ বঙ্গবাসী বা চাহিবে? চিরকালের বাঙ্গালী মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালীর অন্তরের ভাবনাকে তাঁহার কবিতায় মুক্তি দিলেন—

যেয়ো না রজনী আজি ল'য়ে তারা দলে
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে।

ভক্ত কবির হৃদয়ে সেই দুর্গাই হইলেন জগজ্জননী। জগজ্জননীর মৃন্ময়ী মূর্তি গড়িতে গিয়া অকস্মাৎ কবি রামপ্রসাদের মনে যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসে, তিনি যে চিন্ময়ী, গাহিয়া উঠেন—

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই, মনের ভ্রমি মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥

এই সম্বিৎ দৃঢ় হয়, যখন তাঁহার মনে আসে ত্রিনয়নী জগজ্জননীর যে-নয়নত্রয় চন্দ্র-সূর্য হুতাশনে গঠিত সেই-নয়নত্রয় কোন্ কারিগর নির্মাণ করিতে পারিবেন। তিনটি তো দূরের কথা একটিরও নির্মাণ কি কাহারো সামর্থে কুলাইবে? সেই পূর্বের পদে কবির প্রশ্ন, না কি আত্ম-জিজ্ঞাসা—

মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য আর হুতাশন,
কোন্ কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?

শাক্তপদসাহিত্যের 'মা কি ও কেমন'-শাখার শক্তিদেবতা নগ্নিকা কালীর প্রতি রামপ্রসাদের এক বিনীত প্রার্থনা সকলের প্রার্থনা হইয়া কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইতেছে। যিনি প্রকৃত কবি, তিনি যে দেশ-কাল-গোষ্ঠীর উর্দ্ধে, তাঁহার কবিতা তাই সার্বজনীন; তাহার পঙ্‌ক্তি তাই সুভাষিত পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত।

মা বসন পর,
বসন পর বসন পর, মাগো বসন পর তুমি।

অনেক কথা বলার পর শেষে বলেন, যেখানে কারণ উল্লিখিত—

মা হ'য়ে বালকের পাশে উলঙ্গ কেমনে গো॥
আপনি পাগল, পতি পাগল, মাগো আরও পাগল আছে—
দ্বিজ রামপ্রসাদ হ'য়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো॥

শ্যামভাবনায় ভাবিত শক্তিগীতিগুলির মধ্যে রামপ্রসাদের—

কালী হলি মা রাসবিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে

এবং কমলাকান্তের—

জাননারে মন পরমকারণ শ্যামা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়।

গীত দুইটি বহু বিখ্যাত। 'কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণ কলৌ গোপালকালিকা।'—একথা ঠিকই। তবে বাংলার যে-মৃত্তিকায় শক্তিসাধনা গড়িয়া উঠে, সেই-মৃত্তিকায় বৈষ্ণবসাধনা কি করিয়া গড়িয়া উঠে,—বিস্ময়ের বিষয়। বাংলা এক অদ্ভুত দেশ, বাঙ্গালী এক অদ্ভুত জাতি। চিত্তের অভিনব রসায়ণে তাহারা বিষমধাতুর বিবাহ দিয়াছে। কালী মিলিয়াছে কালায়, গঙ্গা যমুনায়, হরহররব হরিহরিধ্বনিতে, খঞ্জনী-মৃদঙ্গে, বিল্বদল-তুলসীপত্রে, রক্তচন্দন-হরিচন্দন-দ্রবে, অসি-বাঁশীতে, জবা-মাধবীতে। ভক্তজনের শরণাগতির মধ্যে কালী-কালায় শ্যামা-শ্যামের একাকার অদ্বয়রূপের অভিব্যক্তি। এহেন সঙ্গীত বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে আকুল করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এইগুলিকে কেবল সুভাষিত বলিলে কম বলা হয়।

ভবযন্ত্রণায় কাতর ভক্তচিত্তের আকুতি শাক্তকবিবৃন্দের রচনায় বহুধা প্রকাশিত। এই সংসারের মায়ামোহময় বিবিধ বন্ধনে বাঁধা পড়ে মানুষ। কিন্তু একসময় উপলব্ধি করে এই সকল বন্ধন যন্ত্রণাভোগ, বৃথা পরিশ্রম, অনর্থক প্রাণান্তকর কষ্টবরণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। মানুষের সখেদ অভিব্যক্তিগুলি কবিকণ্ঠের বাঙ্ময় প্রকাশনে সার্থক। শাক্তপদাবলীতে ইহা 'ভক্তের আকুতি' নামে সংজ্ঞিত। এই পৃথিবীর যাতনাব্যথিত মানবের যন্ত্রণামুক্তির অভীপ্সাকে রামপ্রসাদ বাংলার বিখ্যাত কলুর তেলের ঘানিতে চোখবাঁধা বলদের উদাহরণে ব্যক্ত করিলেন—

মা আমায় ঘুরাবে কত,
কলুর চোখঢাকা বলদের মত ?

এই একই পদে শ্যামামায়ের নিকট কবির সাভিমান অনুযোগ—

কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখনতো।
রামপ্রসাদের এই আশা মা অন্তে থাকি পদানত॥

বৃথা শ্রম তো ভূতের বেগার খাটা। সংসারের আকর্ষণে মানুষ মিথ্যা মায়ায় বদ্ধ হইয়া পুত্র-পরিবারের জন্য সবটাই খাটিয়া মরে। শ্যামার নাম পর্যন্ত লইতে ভুলিয়া যায়। লাভ-ক্ষতির হিসাব মিলাইয়া যখন দেখে, কোনো উদ্বৃত্তই দেখিতে পায় না। সেই অবস্থার মানুষের মনকে রূপ দিয়া রামপ্রসাদ বলেন—

ম'লেম ভূতের বেগার খেটে,
আমার কিছু সম্বল নাইকো গেঁটে।

মানুষ যখন বুঝিতে পারে, সে যে-আত্মীয়-স্বজনের জন্য নানা মিথ্যা, অন্যায়, ছলচাতুরী পর্যন্ত পরিশ্রমকে আশ্রয় করিয়া জীবন কাটাইয়াছিল সেই আত্মীয়-স্বজন ভবমুক্তির কেহ নয়, তখন নিজেকে একান্ত নিরাশ্রয় ভাবে। রামপ্রসাদ নিরালম্ব হতাশাদীর্ণ মানুষের মানসিক পরিস্থিতিকে গানে প্রকাশ করিয়া বলেন—

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা।

তখন মা কালীর উপর কি অভিমানই না হয় ভক্তের। সে বিদায় চায় এই জগৎ হইতে। গীতিকার নরচন্দ্র রায়—

যে ভাল করেছ কালী আর ভালতে কাজ নাই।
ভালয় ভালয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই॥

এক সময় ভক্ত আত্মদোষ-উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়। পাচালীকার দাশুরায় বলেন—

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাতসলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

চতুর ভক্ত রামপ্রসাদ তো একবার শ্যামা-মার ভক্তিরত্নভাণ্ডারের তবিলদারী খুঁজিলেন, নিমকহারাম নন, তাহাও সোচ্চারে বলিলেন—

আমায় দেমা তবিলদারী,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।

এই উক্তিত্রয় যে সুভাষণের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, তা বাঙ্গালীমাত্রেরই পরিজ্ঞাত সত্য।

পদকর্তা নবাই ময়রা যে গীতে শ্যামা-মাকে শ্যামরূপে শ্রীমতী রাধাকে বামে লইয়া নাচিতে বলিলেন সে গীত বাঙ্গালীর অতি প্রিয়। শ্যামাকে নাচিতে হইবে রাসমন্দিরে। একা নাচিলে চলিবে না। বামাঙ্কে বার্ষভানবী রাধা থাকিবেন সঙ্গিনী হইয়া। সে রাসমন্দির বৃন্দাকাননে নয়। ভক্তের হৃদয় সেই রাস-রস-ভূমি।

হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
একবার হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা,
শ্রীরাধারে বামে লয়ে।

শ্যামারূপে নাচিবার স্থান আছে। শোকদুঃখযন্ত্রণার চিতাগ্নি যে ভক্তচিত্তে অবিরত জ্বলিতেছে, সেই ভক্তচিত্ত শ্যামা-মার নৃত্যস্থলী—

শ্মশান ভালবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি ;
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি ব'লে নিরবধি।

কৃষির দেশ বাংলাদেশ। রামপ্রসাদের কৃষিরূপক শ্যামাসঙ্গীত কিষাণেরও মুখে মুখে ফেরে। সেখানেও কৃষি, তবে মাটির জমিনে নয়, মানব জমিনে।

মনরে কৃষি কাজ জাননা।
এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ ক'রলে ফলতো সোনা।

যেমন জমিন তার তেমন ফসল। মানব মনের মাটির জমিনে ভক্তিসোনার ফসল। কিষাণ মানুষের মন।

এ অনবদ্য সুভাষিত।

শাক্তপদসাহিত্যের পদে পদে বহু বহু সুভাষিত। আর একটি অতুলনীয় সুভাষিত পর্যায়ের উৎকলন এখানে রাখিয়া আমরা দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি শেষ করিব।

সঙ্গীতসন্দর্ভ মতে রচয়িতা নরচন্দ্র, সাধারণ্যে গীতটির রচয়িতা দেওয়ান রামদুলাল নন্দী।

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্গে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি ;
কারে দেও মা ঈশ্বর পদ, কারে কর অধোগামী।
যে বোল বলাও তুমি সেই বোল বলি আমি ;
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি।

শাক্তপদাবলীর পঙ্‌ক্তিচয় কেন সুভাষিত পদ্যাবের মর্যাদায় বিভূষিত এ প্রসঙ্গে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি একান্ত প্রাসঙ্গিক। "একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল —প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশালবিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদুপবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গ চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিভিতেছিল। যে বারাণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজী কবিতায় তাহা হইল না। ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত' কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে—

"সাধো আছে মা মনে,
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী জীবনে।"

"তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গলাভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম —এ' জাহ্নবীজীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ, সকলই আপনার বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

শাক্তপদাবলী 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'। তাহার প্রমাণ সমানধর্মা পাঠকের অনুভূতি। 'সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্'।

●

॥ স্মৃতিচারণ ॥

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

আমরা যখন মঠে যোগ দিই তখন স্বামী-শিষ্য সংবাদ প্রণেতা ৺শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় কলিকাতায় একটি সাব-পোষ্টাফিসের ডেপুটি পোষ্টমাস্টার। সেখানে তিনি নিরন্তর কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার শতকাজ সত্ত্বেও অবসর পাইলেই তিনি মঠে আসিতেন ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানগণের সহিত আলাপ ও রহস্যাদি করিতেন। তাঁহারাও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন দেখিলাম তিনি তামাক খাইতে খাইতে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিলেন ও মহাপুরুষ মহারাজকে বলিলেন "মাহাপুরুষ আপনি তামাক খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন? (তখন হাঁপানীর জন্য মহাপুরুষ মহারাজ ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তামাক খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন।) আমি কিন্তু স্বামীজীর ঐ আদেশটি এখনও পালন করিতেছি। স্বামীজীতো বলিয়াছেন 'একটি নেশা লইয়া থাকিও' তাই আমি এই নেশাটি লইয়াই আছি।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ একটু হাসিলেন ও তাঁহার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। এইরূপে তিনি অন্যান্য মহারাজদের সহিতও প্রাণ খুলিয়া মিশিতেন। তাঁহারা ও তিনি স্বামীজীর শিষ্য ও স্বামী-শিষ্য-সংবাদের লেখক বলিয়া তাঁহাকে খুব স্নেহ করিতেন। আমাদিগকেও তাঁহার লিখিত স্বামী-শিষ্য-সংবাদ পড়িতে উৎসাহ দিতেন। উহা পড়িয়া শরৎ বাবুর প্রতি আমাদের খুবই শ্রদ্ধার সঞ্চার হইয়াছিল এবং তিনি যে একজন যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ ও গৃহস্থ হইয়াও স্বামীজীর অশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন উহা জানিয়া খুবই মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

তখনও তাঁহার সহিত ঘনিষ্টভাবে মিশিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। উহা হইয়াছিল ১৯৩১/৩২ সালে যখন তিনি তাঁহার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন ও নিজ গ্রামে আসিয়া নূতন করিয়া তাঁহার গৃহাদি নির্মাণ করিতেছেন। আমরা তখন বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যভার লইয়া আছি। সেখানে মিশনের অন্যান্য কার্যের মধ্যে একটি ছোটখাট ছাত্রনিবাসও ছিল। উহাতে সেখানকার কলেজের কয়েকটি মেধাবী ছাত্র বাস করিত। তাহাদিগকে লইয়া আমরা অনেক সময় ব্যস্ত থাকিতাম। তাহাদের যাহাতে দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সর্ববিষয়ে উন্নতি হয় তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতাম। সেই সময়ে বরিশালের নিকটবর্তী বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার প্রিয়কাঠি নামক গ্রামে ব্রহ্মচারী প্রিয়মোহন নামক একটি সাধু সেখানে একটি ছোটখাট আশ্রম করিয়া থাকিতেন। তাঁহার সরল ব্যবহারের জন্য তিনি মঠে অনুষ্ঠানিকভাবে যোগ না দিলেও পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ প্রভৃতি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমরাও তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতাম ও তাঁহাকে আমাদের নিকট আসিয়া ছাত্রদের সহিত মিশিয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু উপদেশ দিতেও অনুরোধ করিতাম। সেই সময় একদিন তিনি আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন যে "দেখুন, স্বামী-শিষ্য-সংবাদ

প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া এখন তাঁহার গ্রামে আসিয়াছেন এবং সেখানে তিনি তাঁহার নূতন বাসস্থান নির্মাণ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু তিনি আমাদিগের কাহাকেও দেখিলে সকল কাজ ফেলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের, মা ও স্বামীজী সম্বন্ধে আলাপ করিতে খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন ও সেই সকল আলাপ বাস্তবিকই খুবই হৃদয়স্পর্শী ও শিক্ষাপ্রদ হয়। একদিন চলুন, তাঁহার বাড়ীতে গিয়া আমরা উপস্থিত হই। তখন দেখিবেন মঠ ও মঠের সাধুদের প্রতি তাঁহার কি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি। যাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া ঐ ছাত্রাবাসের একটি ছাত্রকে লইয়া একদিন রাত্রি থাকিতে তাঁহার বাসস্থানের দিকে আমরা রওনা হইলাম। ঐ গ্রামটি প্রিয়কাঠি গ্রামের নিকটবর্তী। সেখানে যাইতে হইলে কিছু কিছু পথ স্টীমারে যাইতে হইত। আমাদের দুর্ভাগ্য সেদিন বরিশাল হইতে স্টীমার ছাড়িতে খুব দেরী করিল। কাজেই প্রত্যুষে তাঁহার ওখানে না পৌঁছাইয়া আমরা বেলা নয়টা দশটার সময় সেখানে পৌঁছাইলাম। দেখিলাম সত্যই তিনি তাঁহার নূতন বাড়ী নির্মাণ কার্য লইয়া খুবই ব্যস্ত রহিয়াছেন। নূতন পুকুর কাটিবার জন্য লোক আসিয়াছে। চালাঘরাদি বাঁধিবার জন্যও ঘরামী উপস্থিত। কিন্তু তিনি আমাদের দূর হইতে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিলেন ও বলিলেন "এসো বাবা এসো" ও ঘরামী প্রভৃতি সকলকে বলিতে লাগিলেন "আজ আর কোন কাজ হবে না—আজ সাধুরা এসেছেন। সাধুরা এসেছেন আর এরা যে-সে সাধু নন, বেলুড় মঠের সাধু।" তখন যে কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সকলকেই তিনি ঐরূপে নিরস্ত করিতেছিলেন। তারপর আমাদের একরূপ টানিয়াই তাঁহার নবনির্মিত ছোট একটি ঘরের বারান্দায় বসাইলেন ও তখন হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও গিরীশবাবু সম্বন্ধে কত কথাই না বলিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলেরা পরের দিনই পড়িবার জন্য কলিকাতায় যাইতেছে—তাঁহার নিকট তাহারা বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলে তাহাদেরও তেমনভাবেই নিরস্ত করিলেন। আমরা তো দেখিয়া অবাক। স্বামীজীর একান্ত অনুরক্ত ও স্বামীজীর আশীর্বাদপুষ্ট বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ এই প্রৌঢ় ভক্তটির এ কি বিস্ময়কর অদ্ভুত শ্রদ্ধাপূর্ণিত আচরণ।

কিছুক্ষণ পরে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন 'তোমরা করছ কি? তোমরা কি শোনোনি যে স্বামীজী আমাদের কি বলতেন?' ইহা বলিয়া তিনি যোগোপনিষদ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইলেন।—

মেরু সর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্য খদ্যোতয়োরিব।
সরিৎ সাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষু গৃহস্থয়োঃ॥

অর্থাৎ মেরু ও সর্ষপের সহিত যে প্রভেদ সূর্য্য ও খদ্যোতে (জোনাকিতে) যে পার্থক্য, সরিৎ (ক্ষুদ্র জলাশয়) ও সাগরে যেরূপ পার্থক্য, সরিৎ (ক্ষুদ্র জলাশয়) ও সাগরে যেরূপ পার্থক্য, ভিক্ষু ও গৃহস্থের সহিত তদ্রূপ পার্থক্য। বলিলেন দেখ, স্বামীজী নিত্য আমাদের এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে বলিতেন।"

ইহা বলিয়াই বলিলেন, 'তোমারা কি জান স্বামীজী কে ছিলেন? আমি নিম্নলিখিত ঘটনাটি বহুপূর্ব্বে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের মুখে শুনেছিলাম, আবার এবার মঠে গিয়ে তাঁর নিকট ঐ বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করে শুনে এসেছি :—

একদিন অনেক রাত্রে বরাহনগর মঠে স্বামীজী ও মহাপুরুষ মহারাজ একই মশারির ভিতর শুয়ে আছেন। উভয়ই নিদ্রিত, এমন সময় একটি আলোর ঝলকে মহাপুরুষ মহারাজের ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখেন, মশারির বাইরের দিকে শিবাকৃতি ছোট ছোট মূর্ত্তি—ত্রিশূল হাতে বসে আছেন—তাঁদের শরীর ও ত্রিশূল হতে অদ্ভুত জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। ওটা তাঁর মনের ভ্রম মনে করে তিনি পুনরায় চক্ষু বুজিলেন, কিন্তু আলোর ঝলকে ঘুম হলো না। চেয়ে দেখেন সেই মূর্ত্তিগুলি একইভাবে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি সঠিক বুঝতে না পেরে তিনি স্বামীজীকে ডেকে সব বললেন ও তাঁদের দিকে তাঁকে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী কিন্তু ওতে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করে পাশ ফিরে শুলেন এবং তাঁকেও ওরূপ করতে বললেন। অগত্যা এভাবে রাত্রিটি কেটে গেল। সকালে উঠে পুনরায় মহাপুরুষ মহারাজ স্বামীজীকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। স্বামীজী নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, 'ওঁরা আর কেউ নন—বটুক ভৈরব, আমার ছেলে বেলা থেকেই ওঁরা ঐভাবে আমাকে রক্ষা করে আসছেন।'

আর একদিন কথা বলিতে গিয়া শরৎবাবু বলিলেন আমি তখন কলকাতায় চাকরি করি। প্রায়ই মঠে গিয়ে স্বামীজী ও অন্যান্য মহারাজদের দর্শন করে আসি। একদিন দ্বিপ্রহরে মঠে রয়েছি স্বামীজী দ্বিপ্রহরের আহারের পর আমাকে বলিলেন "দেখ বাঙ্গাল! (স্বামীজী শরৎ বাবুকে বাঙ্গাল বলিয়া ডাকিতেন) আজ তুই আমাকে একটু massage (ডলাই মলাই) করে দেতো। স্বামীজীর নিকট হতে তৎপূর্বে আমার দীক্ষা হয়েছে। গুরু সেবা করবার সুযোগ পেলাম বলে আনন্দে তাঁকে massage করতে লাগলাম। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই স্বামীজী বললেন, "না এ তোর কাজ নয়, রাজাকে (শ্রীশ্রী মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীকে) ডেকে দেতো"। তখন মহারাজ দ্বিপ্রহরের আহার করে শুয়ে পড়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁর ঘরের নিকট গিয়ে তাঁর দরজায় টোকা দিলাম। মহারাজ জেগে ছিলেন। 'কে?' বলে দরজা খুলে দিলেন এবং ঐ সময় টোকা দেবার কারণ কি জিজ্ঞেস করলেন। তখন আমি সসঙ্কোচে বল্লাম যে স্বামীজী আপনাকে একটু ডাকছেন। এ-কথা শুনে মহারাজ মৃদু হেসে বল্লেন, 'মেজাজ সরিফ ত?' (এ সময়ে অসুখে ভুগে ভুগে স্বামীজী একটু খিটখিটে মেজাজের হয়েছিলেন তাই মহারাজ ওরূপ প্রশ্ন করলেন।) আমি বল্লাম, "হাঁ তাঁর মেজাজ ঠিকই আছে, তবে তাঁকে ডলাই-মলাই করবার জন্য আমাকে বলেছিলেন। আমি কিছুক্ষণ করবার পর তিনি আমাকে বল্লেন যে 'না এ তোর কাজ না, একটু রাজাকে ডেকে দে' তাই এ সময় আপনাকে বিরক্ত করলাম।"

মহারাজ কিন্তু তৎক্ষণাৎ কতুয়াটি গায়ে দিয়ে, কাপড় মালকোঁচা করে পরে স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করলেন। স্বামীজী বল্লেন, 'দেখ্ রাজা আজ শরীরটা খারাপ বোধ করছি, তাই এই বাঙ্গালটাকে massage করতে বলেছিলাম কিন্তু ও কিছুই করতে পারল না,

তাই তোকে একটু ডেকেছি'। মহারাজ বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে তখনই স্বামীজীকে ডলাই-মলাই করতে লাগলেন ও পুরো দু' ঘণ্টা ওরূপ করে ঘর্মাক্ত শরীরে বাইরে এলেন এবং তাঁর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তাঁর গা, হাত পা মুছতে আরম্ভ করলেন। আমি ঘরের বাইরেই ছিলাম, কিছুক্ষণ ইতস্তত: করে পুনরায় ধীরে ধীরে তাঁর দরজায় টোকা দিলাম। মহারাজ পুনরায় 'কে?' বলে দরজা খুলে দিলেন ও আমাকে দরজার নিকট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পুনরায় ওরূপ ঘা দেবার কারণ কি জিজ্ঞেস করলেন। তখন অতিশয় সঙ্কোচের সঙ্গে তাঁকে বল্লাম, 'মহারাজ! আজ আমার মনে বড় একটা সংশয় জেগেছে তাই ওটি দূর করবার জন্য আপনার নিকট পুনরায় এ সময়ে এসে বিরক্ত করছি।' মহারাজ অভয় দিয়ে বল্লেন, 'কি বল?' তদুত্তরে বল্লাম, 'মহারাজ। শুনেছি আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মানস পুত্র, স্বামীজীর গুরুভাই। স্বামীজীও আপনাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন অনেক সময় দেখেছি, কিন্তু আপনাকে ডেকে ওরূপ massage করালেন কেন বুঝতে পারছি নে। একথা শুনেই শ্রীশ্রী মহারাজ জিভ কেটে বল্লেন, 'বলিস কি রে? তিনি যে সাক্ষাৎ শিব। তুই কি জানিস নে? শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ঐভাবে দেখতেন' পরে শরৎবাবু পুনরায় আমাদিগকে বল্লেন, 'দেখ মঠের অন্যান্য মহারাজগণও স্বামীজীকে ওরূপ শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন, দেখেছি'।

একবার স্বামীজী নিয়ম করলেন মঠবাসী সকলকেই রাত চার ঘটিকায় উঠতে হবে। আমার উপরই ভার পড়ল ঘণ্টা বাজিয়ে সকলকে জাগাবার। স্বামীজী সকলকে ডেকে বলে দিলেন 'ঘণ্টা বাজাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে কেউ মন্দিরে না গেলে তাঁকে সেদিন ভিক্ষা করে খেতে হবে।' স্বামীজী নিজেও যথাসময় মন্দিরে যেতেন ও অন্যান্য সকলেও নির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরে উপস্থিত হতেন। একদিন কিন্তু পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের মন্দিরে যেতে কিছু দেরী হয়ে গিয়েছিল। স্বামীজী সেটি লক্ষ্য করেছিলেন। ধ্যান হতে সকলে উঠে নিজ নিজ কাজে গেলে তিনি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে ডেকে বল্লেন—'তারক দা আজ আপনার তো মন্দিরে যেতে দেরী হয়েছে।' পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, 'হ্যাঁ স্বামীজী, দশমিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল।' স্বামীজী ধীরে ধীরে তখন বলিলেন, 'তারক দা, আমরা তো নিয়ম করেছি ঐরূপ দেরী হলে ঐদিন ভিক্ষা করে খেতে হবে।' পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, 'নিশ্চয়ই, আমি এখনই ভিক্ষায় বের হচ্ছি, এবং যা পাবো, তাই খাবো।' ইহা বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। যথাসময়ে মঠে ভোগ উঠিল ও খাওয়ার ঘণ্টা পড়িল। সকলেই খাইতে গেলেন, কিন্তু স্বামীজী গেলেন না, মঠের পশ্চিমের বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। কিছু পরে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ ভিক্ষা করিয়া ফিরিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই স্বামীজী সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, 'দেখি তারকদা, কি কি এনেছেন? অনেকদিন ভিক্ষায় গ্রহণ করিনি; আসুন, আজ আমরা দুই ভাইয়ে বসে এটি ভাগ করে খাই।' এই বলিয়া দুইজনে পরম পরিতোষ সহকারে সেই পক্ক ভিক্ষায় খাইতে লাগিলেন।

স্বামীজীর অপার স্নেহের কথাও শরৎবাবু সেইদিন আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন। বলিলেন,—তোমরাত 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' পড়িয়াছ কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শনের পর স্বামীজীর

মন যেন বাহ্য জগৎ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল, সর্বদাই তাঁহার খাটে তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকিতেন। মাঝে মাঝে গুনগুন করিয়া গান করিতেন ও প্রায়ই 'শিব শিব' বলিয়া উঠিতেন। মঠের মহারাজগণ তাঁহার এইরূপ তন্ময় অবস্থা দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইয়া আমাকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া লইলেন। অসময় তাঁহাদের এইরূপ আহ্বানে একটু বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং মঠে পৌঁছাইয়া তাঁহাদিগকে ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা স্বামীজীর সেই তন্ময়ভাবের কথা সোবেগে বর্ণনা করিলেন এবং এইভাবে বেশীদিন থাকিলে তাঁহার শরীর যে থাকিবে না, ইহাও তাঁহারা আশঙ্কা করিতেছেন বলিলেন। তাঁহারা তাঁহার গুরুভাইরা থাকিতে এ বিষয়ে আমি কি করিতে পারি, নিবেদন করিলাম। তদুত্তরে শ্রীশ্রীমহারাজ বলিলেন, 'দেখ্, তিনি তোকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। স্নেহ নিম্নগামী, তাই আমরা যা করতে পারিনি, তোকে দেখলে হয়তো তাঁর মন একটু নিম্নগামী হবে।' তাঁদের কথায় যথাসময়ে স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। স্বামীজী তখন ধ্যানস্থ ছিলেন। আমার শব্দ শুনিয়াই চক্ষু ধীরে ধীরে উন্মীলন করিলেন, দেখিলাম—চক্ষু দুইটি জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। আমার দিকে চাহিয়াই কিন্তু পুনরায় চক্ষু বন্ধ করিলেন। আমি তখন কাঁদিয়া ফেলিলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম, 'স্বামীজী, সকল মহারাজই অত্যন্ত শঙ্কিত, আপনি এইভাবে কিছুতেই থাকতে পারবেন না।' এই বলিয়া আবদার করিতে লাগিলাম। দেখিলাম—ধীরে ধীরে তাঁহার মন একটু বহির্মুখ হইতেছে; পরে বলিলেন, 'যা, একটু তামাক সেজে আন।' স্বামীজীর এই কথা শুনিয়া আমি আনন্দে ঘর হইতে বাহির হইলাম। স্বামীজী তামাক খাইতে চাহিয়াছেন শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়া বলিলেন, 'দেখলি, তোর প্রতি স্নেহবশেই তিনি মনটিকে নামিয়েছেন, না হলে কি হত কে জানে।'

আর একদিনের কথায় শরৎবাবু বলিলেন যে একদিন বলরাম বাবুর বাড়ীতে স্বামীজী ও তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা রহিয়াছেন, আমিও সেদিন সেখানেই ছিলাম। সে সময় স্বামীজী হঠাৎ তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে বলিলেন যে আজ চল, আমরা বেলুড় মঠে যাই। সকলে উহাতে সম্মত হইলেন ও তদনুযায়ী মঠেও খবর দেওয়া হইল। কিন্তু বৈকালে যখন সেখানে যাইবার জন্য স্বামীজী তৈরী হইয়া তাঁহাদের নিকট গেলেন তখন দেখিলেন যে তাঁহারা কেহই যাইবার জন্য প্রস্তুত হন নাই। উহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন আজ এখন বৃহস্পতিবারের বারবেলা পড়িয়াছে এ সময়ে আমাদের এখান হইতে মঠে রওনা হওয়া ঠিক হইবে না। উহা শুনিয়া স্বামীজী একটু গম্ভীর হইয়া আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "কি রে বাঙ্গাল, আমি তো তোর গুরু? আমার সঙ্গে মঠে যেতে তোর কি আপত্তি আছে?" আমি বলিলাম "না মহারাজ," যদিও মনে মনে আমিও একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। তখন স্বামীজী একমাত্র আমাকে লইয়া বাগবাজার ঘাট হইতে নৌকা করিয়া মঠের দিকে রওনা হইলেন। কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে জোরে হাওয়া বহিতে লাগিল ও নৌকা টলমল করিতে লাগিল। আমি মনে মনে বিপদ গণিলাম, কিন্তু স্বামীজীর দিকে তাকাইয়া দেখি তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার। নিজ মনে গুণগুণ করিয়া গান

গাইতেছেন। যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে সেই জোর হাওয়া থামিয়া গেল ও আমরা নিরাপদে মঠে পৌছিলাম। ঘাটে পৌছাইয়া দেখি সেখানে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। স্বামীজীর সঙ্গে আর কাহাকেও না দেখিয়া বলিলেন 'আর সব কোথায় গেল?' স্বামীজী গম্ভীর হইয়া বলিলেন "আজ বিদ্যুতের বার বেলায় সে সব শালাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।" পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ আর কোন কথা না বলিয়া স্বামীজীকে তাঁহার ঘরে নিয়া বসাইলেন।

রাত্রে যথা সময়ে খাওয়ার ঘন্টা পড়িল। পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীকে খাওয়ার ঘরে লইয়া গেলেন। আমিও তাঁহার সহিত গেলাম ও তাঁহার পাশেই বসিলাম। ইতিপূর্বেই পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ অন্যান্য মহারাজগণ আসিবেন বলিয়া প্রসাদের যথেষ্ট আয়োজন করিয়াছিলেন। আর কেহ নাই দেখিয়া উহার প্রায় সবই স্বামীজীকে দেওয়া হইল। স্বামীজীও উহার অধিকাংশ ধীরে ধীরে আমার পাতে উঠাইয়া দিলেন এবং বলিলেন "দেখলি রে বাঙ্গাল বিদ্যুৎবারের বার বেলা আমাদের জন্ত কিরূপ আয়োজন করেছে' সেই শালাদের ভাগ্যে নাই তাই হলো না'।

শরৎবাবু বলিলেন এইরূপে স্বামীজী বিভিন্ন সময়ে আমাদের উপর কি স্নেহেই না বর্ষণ করিয়াছেন তাহা আর কি বলিব। আমরা গৃহস্থ জানিয়াও আমাদের সহিত কত তত্ত্ব কথাই না বলিতেন ও যাহাতে আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আমাদের জীবন যাপন করিতে পারি তজ্জন্য কত না উৎসাহ দিতেন।

ঐ দিনই অন্যান্য কথা প্রসঙ্গের পরে শরৎ বাবু বলিলেন "শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর যাইবার পরে তিনি কিভাবে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন দিয়াছিলেন তোমরা কি জান? আমি ইহা পূজনীয় মহারাজদের নিকট হইতে শুনিয়াছি'। এই বলিয়া বলিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর গেলে শোক সন্তপ্তা শ্রীশ্রীমা যখন যোগেন মহারাজ প্রভৃতিকে লইয়া রেলে বৃন্দাবন অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন তিনি একদিন হঠাৎ দেখিলেন রেলের যে কামরায় তিনি আছেন তাহার জানালার ধারে কে যেন একটি কালো মেয়ে দাড়াইয়া আছে—তাঁহার ঘাড়টী একটু বেঁকা। উহা দেখিয়া মা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে গা? তিনি বলিলেন "কেন আমাকে চিনতে পারছো না? আমি যে সেই দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী।" তখন মা বলিলেন "তুমি ঘাড়টী ওরূপ বাঁকিয়ে রেখেছ কেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন 'আমার যে গলায় অসুখ করেছে।' তদুত্তরে শ্রীশ্রীমা বলিলেন তোমার আবার গলায় কি অসুখ হয়েছে? সে তো তাঁর হয়েছিল।" বলতেই তিনি উত্তর দিলেন "সে ও আমি কি ভেদ? ইহা শুনিয়াই মা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরে মহারাজগণ পরবর্তী স্টেশনে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া তাঁহাকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হন ও চোখে মুখে জল দিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা ফিরাইয়া আনেন। তখন তাঁহার নিকট হইতে ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা পরমবিস্মিত ও আনন্দিত হন। শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর গেলে শ্রীশ্রীমা যে 'আমার মা কালি কোথায় গেল' বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন—ইহা যেন তাহারই আর একটি সাক্ষ্য।

আমরা ঐদিন এবং তার পরদিন বিকেল চারটা পর্যন্ত শরৎবাবুর নিকট ছিলাম। স্নানাহার ও নিদ্রার সময় ব্যতীত তিনি সকল সময়েই ঐরূপ শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী ও মায়ের কথা বলিয়া কতই না আমাদের আনন্দ দিয়াছিলেন। দীর্ঘ দিন পরে তাহার যতটুকু মনে আছে এখানে সন্নিবেশ করিলাম।

পরিশেষে আমাদের ফিরিয়া আসিবার সময় শরৎবাবু সস্নেহে বলিলেন "বাবারা তোমরা এমন সময়ে আসিয়াছ যে আমি তোমাদের কিছুই আপ্যায়িত করিতে পারিলাম না। তোমরা বোধ হয় জান না যে স্বামীজীর একটি কথা এখনও আমি সর্বদা পালন করি। স্বামীজী বলিতেন 'দেশ বাঙ্গাল যদি গৃহস্থ হোস্ তো দুঃখ—চেটে (দুঃখ চাটা) গৃহস্থ হোসনি।' আমি সেই কথাটি খুবই মনে করিয়া রাখিয়াছি ও তদনুযায়ী আমার পেন্সনের টাকা মাসের প্রথমে পাইলেই বাজারে গিয়া ভাল ভাল জিনিষ খরিদ করিয়া থাকি এবং সকলে মিলিয়া আনন্দ করিয়া খাই। মাসের শেষের দিকে উহা ফুরাইয়া যায়—তখন আবার যে শাকভাত সেই শা-ভাত। দুঃখের বিষয় তোমরা বাবারা মাসের শেষেই আসিয়াছ কাজেই তোমাদের লইয়া আনন্দে উহা উপভোগ করিতে পারিলাম না।

যাহা হউক এইরূপ প্রায় দুইটি দিন তাঁহার পুণ্যস্পর্শে কাটাইয়া আমরা বরিশাল আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। সেই দুই দিনের স্মৃতি এখনও আমাদের মনে গাঁথিয়া আছে। শ্রীশ্রী স্বামীজীর যে অজস্র আশীর্বাদ শরৎবাবুর উপর পড়িয়াছিল তাহার কিছু অংশ ঐ অল্প সময়ের মধ্যে পাইয়া আমরাও ধন্য হইয়াছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর নাম জয়যুক্ত হউক।

●

॥ ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

স্বামী প্রভানন্দ

প্রাক্‌কথন

(এক)

উনিশ শতকের নবোন্মেষের একটি বিশিষ্ট দিক ব্রাহ্ম-আন্দোলন।

উনিশ শতকের বাঙলা তথা ভারতের নবোন্মেষ ও ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় কালের রেনেশাঁর মধ্যে মিলের চাইতে গরমিলই বেশী। ইংলণ্ডে রেনেশাঁর প্রকৃতি মূলতঃ শিল্প ও সাহিত্য-ভিত্তিক, আর এদেশের নবোন্মেষ নিঃসন্দেহে ছিল ধর্মাশ্রয়ী। ষোড়শ শতকে ইংরাজের রাজ্যসম্প্রসারণের দামামার পটভূমিতে শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছিল, অপরপক্ষে বিদেশী ইংরাজের শাসন ও শোষণের তমোন্ধকারের মধ্যে জাতির লুপ্তপ্রায় আত্মপ্রত্যয় ধর্মকে আশ্রয় করেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, সেই নবার্জিত আত্মপ্রত্যয়ের বলে জাতি বিভিন্ন সৃজনীমূলক কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে উঠেছিল। রামমোহন-পন্থী পত্রিকা 'বেঙ্গল হেরাল্ড' এই নবোন্মেষের উষালগ্নকে আখ্যা দিয়েছিল 'Dawn of new era'.

পলাশীযুদ্ধে পরাজয়ের পর ইংরাজশাসন ও শোষণ, ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, সর্বোপরি খ্রীষ্টিয়ানির প্রবল আক্রমণ এদেশের জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরাজয়ের গ্লানিতে দেশ তখন ধুঁকছিল; জড়তায় তামসিকতায় জাতি তখন বিমূঢ় বিভ্রান্ত; আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে বিব্রত সন্ত্রস্ত।[১] রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মোঘল-শক্তি ক্ষীণ হলেও হিন্দু উচ্চবর্ণের অত্যাচারে ক্লিষ্ট পীড়িত নিম্নবর্ণের মধ্যে ইসলামের আগ্রাসী ধর্মান্তরকরণ শিকড় বিস্তার করছিল। হিন্দুদের গৌরব বেদ-বেদান্ত তখন সমাজে উপেক্ষিত সে-সময়ে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মের আচ্ছাদনে ব্যভিচার অনাচার সমাজকে পঙ্গু করেছিল। নানা বিধিনিষেধের বাঁধনে, পঞ্জিকা হাঁচি-টিকটিকির অনুশাসনে সাধারণ মানুষ দুর্বল হতে দুর্বলতর হতে থাকে। তখন ধর্ম মানে লোকাচার, যার সুযোগ নিয়ে অধিকার-ভোগীরা অনাচার অবিচারের জাঁতকলে সাধারণ মানুষকে পিষেছে। তখনকার দেশীয় পণ্ডিতবর্গের ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ: 'চলছে সেথা শূন্য তর্ক সদাই দিবারাত্র, / পাত্রাধার কি তৈল কিম্বা তৈলাধার কি পাত্র।' দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজের সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখেছেন, "যত ভয়ানক দুষ্কর্ম এই দলের ভেতর থেকে বেরুবে,

---

১। ক্রম-বর্ধমান ইংরাজশক্তির প্রভাবের ফল বিশ্লেষণ করে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন, "With the growth of the British power the old order weakened and the confidence of the Indians in their own culture diminished. Many were dazzled by the civilisation of the West, which seemed to be better adapted for the acquisition of temporal power." (Memories of my Life & Times, Vol. II, p. xii).

দায়মালী জেল ওর করেও তত পাবেন না।' প্রজাপুঞ্জ সম্বন্ধে শাসকগোষ্ঠীর অভিমত জানা যায় গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের উক্তিতে: হিন্দুস্থানের প্রত্যেকটি অধিবাসী দুর্নীতি-পরায়ণ একথা নিশ্চিতভাবে জানি। (Every native of Hindustan, I verily believe is corrupt.)[২] এই রুগ্ন দুর্বল সমাজের সম্বন্ধেই স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছেন, "হিন্দুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, ব্যস্।" অতীতের গৌরবময় ঐতিহ্য বিস্মৃত, বর্তমানের শক্তি-সামর্থ্য বিকৃত কূপমণ্ডূক সমাজ তখন এতই বিমূঢ় যে তার অভাববোধ পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল।

সে-সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা[৩] ও সংস্কৃতির মহাপ্লাবন ভারতীয় জাতির ধ্যানধারণার অচলায়তনে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। পাশ্চাত্যের শিল্পবিপ্লবের তরঙ্গ, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও চিন্তার স্বাধীনতা চিরাচরিত সংস্কারপীড়িত আচারসর্বস্ব জাতির জীবনে নাড়া দিয়েছিল। তন্ত্রমন্ত্র, শাস্ত্র ও কিম্বদন্তীর লোহাই কিছুই নূতন প্লাবনকে বাঁধতে পারে না। বিদেশী বিদ্বজ্জনের অনুসন্ধিৎসা ও নৈষ্ঠিক প্রয়াস শ্রদ্ধাবনতচিত্তে স্বীকার করে ভারতবাসী: হেয়ার কলিন পামরাস্চ কেরী মার্সম্যানস্তথা। / ইতি পাশ্চাত্যগোরাং স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥ ভারতবর্ষের মহিমময় প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কার করতে সাহায্য করেন উইলিয়ম জোনস্, জোনাথন ডানকান, কোলব্রুক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। হীনমন্যতা রোগ হতে ভারতবাসী ক্রমমুক্তি লাভ করে।

পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তরকরণ চলতে থাকে। মিশনারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল এদেশের লোককে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। হিদেনদের অনন্তনরক হতে মুক্ত করে যীশুর স্বর্গরাজ্যে নিয়ে যাওয়া ছিল তাদের লক্ষ্য। "Cost what it may, in men and money, in prayers and labours, India must be won to the Christ" খ্রীষ্টধর্মকে জনপ্রিয় করার পদ্ধতি ছিল হিন্দুদের গালিগালাজ ও খ্রীষ্টিয়ানদের স্তুতিবাদ। এ বিষয়ে একটি উদাহরণই যথেষ্ট। জনৈক উদ্ধত মিশনারি ঘোষণা করেন, "All your Gods are nothing else but demons; you will go to hell to expatiate in eternal flames the crime of your idolatry."[৪] (তোমাদের সব দেবতাই দৈত্যদানব। পৌত্তলিকতার পাপের জন্য তোমাদের গতি হবে অনন্তকালের নরকাগ্নি।) মিশনারিদের চূড়ামণি আলেকজাণ্ডার ডাফ্ মনে করতেন যে মিথ্যা ধর্মগুলির প্রধানতম হচ্ছে হিন্দুধর্ম। এদের আগ্রাসী আয়াসপ্রয়াসের ফলে রক্ষণশীল, প্রগতিশীল, নব্যশিক্ষিত সকলশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে খ্রীষ্টাতঙ্ক ও পাদরি-বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে, তৎসত্ত্বেও ধর্মান্তরিতের সংখ্যা বাড়তে

২। History & Culture of Indian People, Vol. X, p. 28 থেকে উদ্ধৃত।

৩। "Fifty years of English education brought greater changes in the minds of the educated Hindus of Bengal than in the previous thousand years." (History & Culture of the Indian people, Vol. X, p. 89)

৪। K. K. Dutta: Dawn of Renascent India, 2nd Edn. (p. 6 এ উদ্ধৃত)

থাকে। উপজাতি ও নিম্নবর্ণের অশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে প্রসার ঘটলেও শিক্ষিতদের মধ্যে প্রভাব সীমিত থাকে। সমগ্র উনিশ শতকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিতের মধ্যে শিক্ষিত হিন্দুদের সংখ্যা আনুমানিক শতকরা একভাগ।[৫]

নূতন চিন্তা নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা ধর্ম সমাজ রাজনীতি সাহিত্য শিল্পকলার বিভিন্নক্ষেত্র বিচিত্র দুর্লভ ফসল তুলেছিল, সে-সঙ্গে নব্যশিক্ষিতদের আচারে বিশ্বাসে বিকৃতি দেখে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮১৭ সালে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজ সত্যানুসন্ধানের নূতন দিগন্ত উদ্ঘাটন করে। সেখানে ডিরোজিও যোগদানের পর নব্যশিক্ষার প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। লালবিহারী দের ভাষায় নব্যশিক্ষিতেরা began to reason, to question, to doubt. ডিরোজিওর ছাত্রবন্ধুরা তাদের একাডেমিক এসোসিয়েশনে স্লোগান তুললেন, 'Down with Hinduism ! Down with orthodoxy." ডিরোজিও ছাত্র মাধবচন্দ্র মল্লিক Atheneum পত্রিকাতে সগর্বে লিখলেন, 'If there is anything that we hate from the bottom of our heart it is Hinduism." (হিন্দুধর্মকে আমরা অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ঘৃণা করি।) তাদের কাছে দীক্ষিত কৃষ্ণমোহন তাঁর 'ষড়দর্শন সংবাদে' ঘোষণা করেন যে বেদ হচ্ছে 'সুবর্ণাভাস মিথ্যা মুদ্রা' আর বাইবেল হচ্ছেন 'বিমলা সুবর্ণময়ী মুদ্রা'। নব্যশিক্ষিত জনৈক তাঁর পিতৃদেবের সঙ্গে কালীঘাটে গিয়ে মা কালীকে 'গুড মর্ণিং ম্যাডাম' বলে অভিবাদন করলেন। তাছাড়াও নব্যশিক্ষিতদের মদ্য ও নিষিদ্ধ মাংস বিষয়ে অতি-উদার আচরণ সমাজে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। এদের হালচাল সম্বন্ধে ঈশ্বরগুপ্ত লিখলেন." এরা না 'হিন্দু', না 'মোছলমান',/ ধর্মধনের ধার ধারে না। / নয় 'মগ' 'ফিরিঙ্গী' বিষম 'খিঙ্গী' / ভিতর বাহির যায় না জানা।" এদের নিয়েই 'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠী। নবজিজ্ঞাসা ও যুক্তিবোধের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত 'ইয়ংবেঙ্গল' তাদের Enquire পত্রিকায় ঘোষণা করে, "Persecution is high for we have deserted the shrine of Hinduism... If opposition is violent and insurmountable, let us aspire to martyrdom than desert a single inch of the ground we have possessed."[৬] (আমরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছি তাই বিষম অত্যাচার সইতে হচ্ছে।...শত্রুপক্ষ অপ্রতিরোধ ও হিংসাশ্রয়ী হলে আমরা বরঞ্চ জীবন দেব তবুও আমরা যে জয়যাত্রায় অগ্রসর হয়েছি তা ছাড়ব না।) ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ, প্রচলিত বিশ্বাস রীতিনীতির বিরুদ্ধে অকুতোভয় আচরণ প্রভৃতি প্রগতির পীঠস্থান কলিকাতায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলেও জনজীবনের সঙ্গে এই গোষ্ঠী কখনই নিবিড়যোগ স্থাপন করতে পারেননি। তাছাড়াও ইয়ংবেঙ্গলের বৈপরীত্য, আত্মখণ্ডন প্রভৃতি তাদের ভূমিকাকে সীমিত করেছিল।

ধর্মজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে উনিশশতকের উষাকালে আবির্ভূত হলেন প্রতিভাধর রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। শাস্ত্রপারঙ্গম রামমোহন হিন্দু, খ্রীষ্ট, ইসলাম, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের

৫। History & Culture of the Indian People, Vol X, p. 166.

৬। বিনয় চৌধুরী :—সমসাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩ / পৃঃ ২৬ তে উদ্ধৃত।

মূল গ্রন্থাদি নিষ্ঠার সঙ্গে অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮২৮ সালে তিনি 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্মের' চর্চার জন্য ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রামমোহন পন্থীরা ছিলেন উন্নতিশীল হিন্দু। ডিরোজিওর মতে 'হাফ্-লিবারেল' (আধা উদারপন্থী)। রামমোহন প্রজ্বলিত সম্মিলিত ব্রহ্ম-উপাসনার দীপটি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তেরো বছর সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) হাতে তুলে দেন। রামমোহন প্রদর্শিত পন্থার ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা তাঁর চোখে পড়ে। তিনি "আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের সাহায্যে ঔপনিষদিক উৎস হতে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ রচনা করেন, ব্রাহ্মসমাজ সংগঠন করেন, প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে রামমোহনই ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা। ঐতিহাসিক টয়েনবি মনে করেন যে, রামমোহন হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মিশ্রণ করে ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টি করেছিলেন।[৭] দেবেন্দ্রনাথ মনে করেন যে হিন্দু শাস্ত্র ও যুক্তির ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের সংস্কারই ছিল রামমোহনের উদ্দেশ্য। খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্মসমাজে প্রচণ্ড প্রাণশক্তির সঞ্চার করেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকেই প্রথম অব্রাহ্মণ আচার্য নিয়োগ করেন, 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি দেন। দুজনের চরিত্রগত ও আদর্শগত মত পার্থক্য ব্রাহ্মসমাজকে দ্বিখণ্ডিত করে। কেশবপরিচালিত প্রগতিশীল গোষ্ঠী 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করে ১৮৬৬ সালে। কিন্তু কেশবচন্দ্রের বিশাল প্রতিভা ও গভীর আধ্যাত্মিকতা ও তাঁর গোষ্ঠীকে সুসংহত রাখতে ব্যর্থ হয়। এদের মধ্যে যারা অতি প্রগতিশীল তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' সংগঠন করেন ১৮৭৮ সালে। কেশবানুগামীরা কেশবচন্দ্রের চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি 'নববিধানের' আশ্রয় নেন। ত্রিধা-বিভক্ত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে মনীষী মোক্ষমূলার মনে করেন যে রামমোহন রোপিত ছাড়া বড় সুস্থ সবল বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তারই তিনটি শাখা ব্রাহ্মসমাজের তিনটি সম্প্রদায়।

ব্রাহ্মসমাজের প্রায় সমগোত্রীয় প্রার্থনা সমাজ। ১৮৬৭ সালে কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় মহারাষ্ট্রে গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের মতে প্রার্থনা সমাজ হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব বা অবতারবাদ মানতেন না। প্রার্থনা সমাজ মহারাষ্ট্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনা সমাজের প্রকৃতি ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনজন ঐতিহাসিক লিখেছেন: "The Brahmo Samaj and the Prarthana Samaj were largely products of ideas associated with the West, and represent the Indian response to Western rationalism."[৮] (ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজ প্রধানতঃ পাশ্চাত্যের ভাবধারা-সঞ্জাত। পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের সংঘাতে ভারতীয় প্রতিক্রিয়া হতেই এর জন্ম)।

১৮৭৫ সালের ১০ই এপ্রিল সংগ্রামী সন্ন্যাসী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) 'আর্যসমাজ' স্থাপন করেন। বেদের বিশুদ্ধ অংশের ভিত্তিতে হিন্দুসমাজকে সংস্কৃত ও সুসংবদ্ধ

৭। Arnold J. Toynbee: A study of History (Abd. Edn), p. 302

৮। R. C. Mazumder, H. C. Raichoudhuri & K. K. Dutta: An advanced History of India, p. 882.

করার জন্য ব্যাপক আন্দোলন শুরু করেন। ধর্মান্তরিতদের হিন্দুসমাজে ফিরিয়ে আনার জন্য 'শুদ্ধি' আন্দোলন প্রবর্তন করেন। আর্যসমাজ বহুদেবতার উপাসনা মানে না, খ্রীষ্টিয়ান'ও ইসলামের একেশ্বরবাদ স্বীকার করে না। বেদের সংহিতা ভাগ, বিশেষতঃ ঋগ্বেদ সংহিতাই গ্রাহ্য, সায়ন বা মহীধরের ভাষ্যটীকাদিও গ্রাহ্য নয়। আর্যসমাজের প্রভাব উত্তরভারতে ব্যাপক ও গভীর। আর্যসমাজের প্রভাবে হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হয়, সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়। ১৮৭৩ সালের জানুয়ারীতে উত্তর কলিকাতায় সিথিতে দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ ঘটেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-অবস্থা দেখে দয়ানন্দজী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "আমরা এত বেদ-বেদান্ত কেবল পড়েছি কিন্তু এই মহাপুরুষে তার ফল দেখছি। এঁকে দেখে প্রমাণ হ'ল যে পণ্ডিতেরা কেবল শাস্ত্র মন্থন করে ঘোলটা খান, এরূপ মহাপুরুষেরা মাখনটা সমস্ত খান।"

১৮৭৫ সালে নিউইয়র্কে মাডাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অলকট থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য, বিশ্বভ্রাতৃত্ব স্থাপন, প্রাচীন ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা ও মানুষের মধ্যে দৈবশক্তির উদ্বোধনের চেষ্টা। কর্ণেল অলকট ১৮৮২ সালের ৪ই এপ্রিল কলকাতা টাউনহলে বক্তৃতা করেন। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল, "The Scientific Basis of Religion"। ৬ই এপ্রিল যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বৈঠকখানায় সমিতির পত্তন হয়। মাদ্রাসে মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে থিওসফির প্রধান প্রবক্তা এ্যানি বেসান্ত বলেছিলেন, "The Indian work is, first of all, the revival, strengthening, and uplifting of the ancient religions." থিওসফি আন্দোলন হিন্দুসমাজের ধর্মচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। থিওসফি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করা হলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "ভগবান লাভ যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লেই ভাল। চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, নক্ষত্রলোক, মহাত্মা এই নিয়ে কেবল থাকলে ঈশ্বরকে খোঁজা হয় না।··· নানা জিনিস থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাতে লাগাতে হয়।"

ইসলাম ধর্মেও সংস্কারের ঢেউ পৌঁছেছিল। পাঞ্জাবে খ্রীষ্টান ও আর্যসমাজের ক্রিয়াকলাপ প্রতিহত করার জন্য মির্জা গুলাব আহমদ কিছু সংস্কার করেছিলেন। আরবের 'ওহাবী আন্দোলনে' অনুরূপ শরিয়ৎ-বিরোধী রীতি-নীতি সংস্কারের আন্দোলন শুরু করেছিলেন সৈয়দ আহমদ্ ব্রেলভি। তাদের 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় প্রচুর হিন্দুদলন উত্তরভারতে হিন্দুদের শঙ্কিত করে তুলেছিল। ১৮৭৪ সালে স্যর সৈয়দ আহমদ্ খানের নেতৃত্বে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, মুসলমান জাগৃতির পথ উন্মোচিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সুফীমতে সাধন করে ইসলামের সাধ্যবস্তুকে লাভ করেন। সে এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীদের আগ্রাসী নীতি, ইসলামের প্রসার, নব্যশিক্ষিতদের বিকৃত আচার-আচরণ, ব্রাহ্মসমাজের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য হতে আত্মরক্ষার জন্য রক্ষণশীল প্রগতিশীল হিন্দুসমাজের সকল অংশেই আত্মবিস্তর চেতনা আসে। 'ধর্মসভা', 'গৌড়ীয় সমাজ', 'হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভা' ইত্যাদি বিভিন্ন আক্রমণ হতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, অপরদিকে ধর্মীয় আচরণ ও

সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করে। দেশের কিছু পত্রপত্রিকাও এগিয়ে আসে। 'নিত্যধর্মানুরঞ্জিকা' পত্রিকা যুক্তিসহকারে প্রমাণ করে "হিন্দুধর্মের তুল্য কোন জাতীয় ধর্ম নহে।" কিন্তু হিন্দুসমাজের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিত্তবান ব্যক্তিরা, যারা ব্যক্তিগত জীবনে ভোগবিলাসে ডুবে থাকতেন। যাঁরা দুর্গাপূজোপলক্ষে বাইজীনাচ বসাতেন, সাহেবদের ভোজে আপ্যায়িত করার জন্য "বিফস্টেক, মটন চপ ও বৎস-মাংস ও ব্রাণ্ডি সাম্পেন সেরি" বসাতেন। সনাতন হিন্দুধর্মের এই প্রহরীদের দায়িত্বে হিন্দুসমাজের অগ্রগতি আশা করাই বৃথা। তখনকার সমাজের চিত্র, স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, "সত্যিকার জাতি—যাহারা কুটীরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম।"[৯]

১৮৭০-৮০ দশককে পণ্ডিত শিবনাথশাস্ত্রী হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকাল বলে নির্দেশ করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী আরও লিখেছেন, "চিন্তা করিয়া যতদূর অনুভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মসমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হ্রাস পাইতে লাগিল।"[১০] যোগেশ চন্দ্র বাগল কিঞ্চিৎ সংশোধন করে বলেছেন যে এটি হচ্ছে ভারতসংস্কৃতি তথা ভারতধর্মের পুনরুত্থান। তাঁর মতে ১৮৬৫-৮৫, এই কুড়ি বছরে রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি আমাদের জাতীয় জীবনকে একটা সম্যক পরিপূর্তির দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এই কালেই বিস্মৃতপ্রায় হিন্দুঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পুনরুদ্ধার ও প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। বিভিন্ন আচার বিশ্বাস সংস্কারের পরিশোধন হতে থাকে। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ও সংস্কার সমন্বিত হয়ে উপস্থিত হয় জাগরণ। আঘাতের প্রতিঘাতে জাতীয় জীবন জেগে উঠল। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্রের বিশেষ উদ্যোগে সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। চতুর্দিকে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। বিক্ষুব্ধ বৃদ্ধ রাজনারায়ণ "হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা" শীর্ষক বক্তৃতায় বলেন, "আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্বে যেমন হিন্দু জাতি বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা, ধর্মের জন্য পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।" মনোমোহন বসু প্রভৃতি হিন্দুধর্ম ও আচারের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঐতিহাসিক প্রণালীতে হিন্দুধর্মশাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে লেখেন, "জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শচরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।"[১১] আর অন্যত্র তিনি Rhys Davids-এর শাক্যসিংহ সম্বন্ধে ব্যবহৃত শব্দনিচয় উদ্ধৃত করে বলেছেন যে কৃষ্ণ হচ্ছেন the wisest and Greatest of the Hindus.[১২] পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও মানবতাবাদের আলোকে নবীনচন্দ্র সেন হিন্দুর পুরাণকে

৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬/৪০০ পৃঃ

১০। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ২১৪

১১। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪০৭

১২। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৮১

তুলে ধরেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পৌরাণিক ধর্মের সমর্থনে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের আশ্রয় নেন। এদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কাশী হতে এসে হিন্দুদের মূর্তিপূজা, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন। বাগ্মী কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে জোরালো বক্তৃতা দিতে থাকেন। এ-সকল উদ্যোগের ফলে হিন্দুর ধর্ম ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদের ধারণা পরিবর্তিত হতে থাকে। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধে লেখা হয়, 'প্রথমে যখন ইংরেজী শিক্ষা এতদ্দেশে প্রবর্তিত হয় তখন ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা হিন্দুধর্ম ও হিন্দু আচার-ব্যবহারের প্রতি বিলক্ষণ বিদ্বেষ করিতেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম এবং হিন্দু আচার-ব্যবহার সকলই অপকৃষ্ট নহে ইহা এক্ষনকার ইংরাজীতে কৃতবিদ্য লোকেরা ক্রমে অনুভব করিতেছেন। এক্ষণে ভারতের প্রাচীন মহিমা এবং হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচার-ব্যবহারের প্রশংসাসূচক বক্তৃতা হইলে তাহারা উৎসাহে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। এক্ষনকার লোকে প্রতীতি করিতে সমর্থ হইয়াছে যে, হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরবিষয়েও এমত সকল ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় যাহা অন্য কোন জাতির ধর্মপুস্তকে পাওয়া যায় না, এবং এমন সকল সুরীতি হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে যাহা অন্য কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই।'[১৩]

কিন্তু সংস্কার ও প্রগতি দেশের ও সমাজের স্থায়ী সুফল আনয়ন করতে পারে তখনই যখন জাতির প্রাণের গভীর হতে জাগৃতির আকাঙ্ক্ষা উদ্ভূত হয়, ফলে জাতির আত্মপ্রত্যয়ের উদ্বোধন ঘটে। ঐতিহাসিক দত্ত নির্দেশ করেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। তিনি লিখেছেন, "...reforms to be successfully introduced and perfectly salutary in a country, must be backed by an urge from within and a new consciousness or renaissance, as we might call it."[১৪] উনিশশতকে যুগসন্ধির আহ্বানে ও ঘটনাপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতীয় নবচেতনা রামমোহন প্রমুখ মণীষিদের মধ্য দিয়ে জাগরণোন্মুখ হয়েছিল, সেই চেতনাই পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে রামকৃষ্ণ—'কেনোপনিষদের' মধ্য দিয়ে।

গঙ্গার উপকূলে কলিকাতা নগরী, উনিশশতকে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের কেন্দ্রবিন্দু। চার মাইল উত্তরে গঙ্গার ধারেই কৈবর্তবংশীয় ধনী রাসমণি মায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণেশ্বর শাক্ত-বৈষ্ণব-শৈব সাধনপীঠ। ১৮৫৫ সালের ৩১শে মে, সেখানে সাধনার আসন পাতেন নিরক্ষর-প্রায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবক শ্রীরামকৃষ্ণ। অশ্রুতপূর্ব কঠোর সাধনা। পুরাণমতে, তন্ত্রমতে, বেদমতে, হিন্দুশাস্ত্রবহির্ভূত মতাদিতে সাধনার পর সাধনা করে সিদ্ধির শীর্ষারোহণ করেন। তিনি সব সাধনার ফল সমর্পণ করেন ফলহারিণী কালীপূজার নিশীতে, ১৮৭৩ সালের ২৫শে মে। জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে, বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে যাওয়া সাধনরাজ্য পেরিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতাত্মার নবীনতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশরূপে আবির্ভূত হলেন। তাঁর মহাদুর্লভ অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে প্রখ্যাত

১৩। বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ২।২৬৫-৬ পৃঃ

১৪। K. K. Dutta : Dawn of Renascent India, 2nd Edn, p. 9.

ঐতিহাসিক টয়েনবি লিখেছেন, "His religious activity and experience were, in fact, comprehensive to a degree that had perhaps never before been attained by any other religious genius, in India or elsewhere." (তাঁর ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও অভিজ্ঞতা প্রকৃতপক্ষে তাঁকে উন্নীত করেছিল সিদ্ধির শীর্ষস্থানে, যেখানে তাঁর পূর্বে ভারতবর্ষ ও অন্যস্থানের কোন ধর্মীয় মহাপুরুষ পৌঁছতে পারেন নি।) রোমা রঁ্যলার ভাষায় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ "তাঁহার ধর্মসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার মণ্ডলটি সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার নিজের কথায়, আহরণ করিয়াছেন জ্ঞান-বৃক্ষের তিনটি ফল—করুণা, ভক্তি, ত্যাগ।"[১৫] এখন তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' নিজেকে উৎসর্গ করলেন।

কেশবচন্দ্রের খ্যাতির সূর্য তখন মধ্যাহ্ন গগণে। দক্ষিণেশ্বর 'পাগলাবামুন' বলে পরিচিত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বেলঘরিয়ার তপোবনে দেখতে যান ১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ। ধর্মের ইতিহাসে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের নব-আত্মপ্রকাশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনা। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা লেখে, "পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। তখন হইতে উভয়ের আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়।" 'সখা' পত্রিকা লেখে, "পরমহংসকে দেখিয়া শ্রীকেশবচন্দ্র সেন মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন।...কেশবচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্য দিয়া 'ভগবান পরিদৃষ্ট হইতেন।' "(God.....was to be seen in him.)"[১৬] কেশবচন্দ্র বিমোহিত হন, তিনি ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণকে উপস্থাপিত করেন।

ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্নগোষ্ঠীর সাধকদের তিনি প্রায় এগারবছর নিজের দিকে টেনে নিয়েছিলেন, প্রত্যেককেই নিজের দিব্যানন্দের ভাগীদার করতে চেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধে রোমাঁ রঁ্যলার ভাষায় বলতে হয়, "রামকৃষ্ণের আনন্দময় প্রবাহধারা আপনাকে সকল আত্মার গোচরীভূত করিত। তিনিই ছিলেন গতিশক্তি, তিনিই ছিলেন নিম্নভূমি, তিনিই ছিলেন প্রবাহ, অন্যসকল ক্ষুদ্র নদী উপনদী তাঁহার মহানদীর দিকেই ধাবিত হইত। তিনি ছিলেন জাহ্নবী।"[১৭] কেশব-নদী শ্রীরামকৃষ্ণ 'জাহ্নবী'তে মিলিত হয়ে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল, সেই দিগন্তে পড়েছিল সারা বিশ্বের দৃষ্টি।

১৫। রোমাঁ রোঁলা : রামকৃষ্ণের জীবন, অনুবাদ কবিদাস, পৃঃ ৮৮

১৬। Romain Rolland : The Life of Ramakrishna, p. 102.

১৭। রোমাঁ রঁ্যলা : রামকৃষ্ণের জীবন, অনুবাদ কবিদাস, পৃঃ ২৩০

॥ শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষে কতশত দেবালয়, মন্দির, মসজিদ, গীর্জা, আশ্রম, মঠ এবং সাধনক্ষেত্র পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত আছে—সেই সকল পবিত্রস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন জগন্মাতা বিশ্বেশ্বরীরই শুদ্ধসত্ত্ব সন্তানগণ এবং তাঁহার আমোঘ আশীর্বাদে আজিও ঐসকল শক্তিতীর্থ ভারতের অধ্যাত্মমহিমাকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিতেছে।

ভিন্ন ভিন্ন তীর্থক্ষেত্র ও পীঠস্থান-সম্বন্ধে বিচিত্র রকমের কিংবদন্তি শুনিতে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতকের বাঙালার আকাশ-বাতাসকে সৌরভিত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বকল্যাণকর্মের ব্রত লইয়া। ইহার কিছু পূর্বে নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে দেখিতে পাওয়া যায় মাতৃসঙ্গীতের মন্দাকিনীপ্রবাহে প্লাবিত করিয়াছিলেন তদানীন্তন বঙ্গ-ভূমিকে শক্তিসাধক রামপ্রসাদ, সাধক কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণ এবং আরও অনেকে। এই সকল সাধক তাঁহাদিগের সঙ্গীতে মৃন্ময়ী ও পাষাণময়ী মাতৃমূর্তিকে চিন্ময়ী ও প্রাণময়ী প্রতিমায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। শক্তিসাধক রামপ্রসাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় অনন্ত-সাধারণ তপশ্চর্যা ও সাধনা মাতৃতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার জন্য। শ্রীরামপ্রসাদ শক্তিসাধনার জন্য কুমারহট্ট-হালিসহরে শক্তিসাধনপীঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ঐস্থানে পঞ্চবটী ও পঞ্চমুণ্ডীর আসন রচনা করিয়া প্রত্যহ একনিষ্ঠভাবে সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঠিক এই মাতৃসাধনার নিদর্শন পাওয়া যায় কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণের জীবনে।

সাধক কমলাকান্তের আরাধ্যাদেবী ছিলেন বিশালাক্ষীদেবী। মাতৃগতপ্রাণ কমলাকান্তের সাধনপীঠ পঞ্চমুণ্ডীর আসন এখনও প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় বর্ধমানজেলায় চাত্রাগ্রামে। তাঁহার আর একটি সাধনপীঠ আছে বর্ধমানে কোটালহাটে এবং সেখানে ত্রিমুণ্ডীর আসন প্রতিষ্ঠিত এখনও আছে। সেখানে আজিও শত-শত ধর্মপ্রেমিক মানুষ একত্রিত হইয়া তাহাদিগের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে।

শক্তিসাধক রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন নাটোরের রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র। তিনি তন্ত্রসাধনা করিয়া বাঙলার বুকে সাধনপীঠ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সেই সাধনপীঠ আজিও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে কাটোয়ার আট-নয় মাইল দূরে গঙ্গাতীরে ঝিরেনপুরগ্রামে। তাহাছাড়া বীরভূম ও বাঁকুড়া-জেলায় পাঁচটি সিদ্ধশক্তিপীঠ এখনও বাঙলার বুকে তন্ত্রসাধনা তথা মাতৃসাধনার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙলার দিগ্‌দিগন্তপ্লাবিত যে ভক্তিরসের আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার মধ্যমণি ছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ী শ্রীরামকৃষ্ণদেব। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও শক্তিসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও রাজা রামকৃষ্ণের মতো তন্ত্রমতে মাতৃসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া-ছিলেন। তিনি মহীয়সী শক্তিসাধিকা ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরীকে গুরুরূপে বরণ করিয়া চৌষট্টিখানি তন্ত্র সাধনা করিয়া সিদ্ধির আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব

বৈষ্ণব, শাক্ত, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্মমতেও সাধনা করিয়া সকল ধর্মের চরম-সিদ্ধি ও লক্ষ্য যে এক ও অভিন্ন তাহা উপলব্ধি করিয়া বুঝিয়াছিলেন—'যত মত তত পথ', সকল ধর্মই সত্য, তবে সাধনার আচার-অনুষ্ঠান বা পথই কেবল পৃথক পৃথক। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আরাধ্যা প্রতিমা ছিলেন শ্রীশ্রীদেবী-ভবতারিণী। এক্ষণে সেই দেবীপ্রতিমা ভবতারিণীর মূর্তি কিভাবে দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র বিশ্বের সমাজে বরেণ্য ও পূজিত হইয়াছিল সেই কথারই এখানে অবতারণা করিব।

সকলেই জানেন যে, রাণী রাসমণি কলিকাতার সন্নিকটে দক্ষিণেশ্বরে মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন: "কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিত-কীর্তি রাণী রাসমণি চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন এবং তদবধি স্বামী রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি স্বল্পকালের মধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

সাধিকা রাণী রাসমণির অপূর্বলীলা-সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য ও কাহিনী অন্যান্য গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহাদেরই অন্যতম তথ্য কুমারহট্ট-হালিশহর-উচ্চবিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'স্মারকগ্রন্থ' হইতে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। ঐ স্মারকগ্রন্থে লিখিত আছে: "নানাবিধ জনহিতকর কার্যের জন্য, অপূর্ব দানশীলতার জন্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও তেজস্বীতার জন্য এবং একনিষ্ঠ ধর্মানুষ্ঠানের জন্য রাণী-রাসমণির নাম ভারতের আদর্শস্থানীয়। পুণ্যশ্লোকা মহীয়সী রমণী সমাজের অগ্রগণ্যা। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তির নিদর্শন দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী-প্রতিষ্ঠা। শ্রীরামকৃষ্ণ পুণ্য-আবির্ভাবের অগ্রদূতরূপে, তাঁহার পালয়িত্রী মাতৃস্বরূপিণীরূপে, বিশ্বমাতা ভবতারিণীর প্রতিষ্ঠাত্রী সেবিকারূপে, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত জগজ্জননীর অষ্ট-নায়িকার অন্যতমারূপে মহীয়সী আদর্শরমণী রাণী রাসমণি দেবীর পর্যায়ে গণ্যা হইয়া 'প্রাতস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা' আখ্যায় ভারত, বহির্ভারত তথা সারা বিশ্বে পূজনীয়া হইয়া আছেন।"

"রাণী রাসমণি তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী প্রথমে হালিশহর বলিদাঘাটাস্থিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধেশ্বরী-কালীকেই আশ্রয় করিয়া তাঁহার পিতৃভূমির নিকট ভাগীরথীতীরেই প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে বলা যায় যে, দক্ষিণেশ্বরের পরিবর্তে হালিশহরে বা কুমারহট্টে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে কুমারহট্টেই ধর্মবিবর্তনকেন্দ্রের সর্বাঙ্গীনতা পূর্ণভাবে প্রকটিত হইত। কিন্তু শোনা যায়, ব্রাহ্মণপ্রধান কুমারহট্টের (হালিশহরের) গোঁড়া ব্রাহ্মণ-সমাজপতিগণ ও অভিমানী উচ্চবর্ণের ভূম্যাধিকারিগণ কুমারহট্টে মন্দির প্রতিষ্ঠা করার প্রবল বিরোধিতা করেন। তাঁহাদিগের মনোভাব ছিল—দরিদ্র ধর্মপ্রাণ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা তাঁহাদের বক্ষের উপর মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণ-সজ্জন-পূজকপাঠকদের পালয়িত্রী হইবেন ও তাঁহার ধ্যান-ধর্ম-ঐশ্বর্যের দীপ্ত মহিমার নিকট তাঁহারা ম্লান, নিষ্প্রভ হইয়া যাইবেন —তাহা কখনই সহ্য করা যাইবে না। সুতরাং তাঁহাদিগের এই অভিমান ও ক্ষুদ্রত্বের জন্য রাণী সারা হালিশহরে পরগণার গঙ্গাতীরে অর্থের বিনিময়েও কোন উপযুক্ত ভূমি সংগ্রহ

করিতে পারিলেন না। সেইজন্য সর্বশেষে কলিকাতা হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে দক্ষিণেশ্বর-গ্রামের অন্তর্গত ইংরাজদিগের এক পরিত্যক্ত কুঠি ও মুসলমানগণের কবরডাঙ্গা ও পীরস্থানের ৬০ বিঘা জমি প্রায় ৬০ হাজার টাকা মূল্যে মন্দির-প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রয় করেন।

"রামপ্রসাদেরই অনুসৃত মাতৃসাধনার সর্বাঙ্গীন সিদ্ধিক্ষেত্ররূপে ভাবান শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যলীলাক্ষেত্ররূপে, বিবেকানন্দ-প্রমুখ ঋষিকল্প বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষগণের গুরুপীঠরূপে, শিব-শক্তি-বিষ্ণু-সাধনার সমন্বয়ধাম বঙ্গের কৈলাস-বৈকুণ্ঠ-লোকের পুণ্য-প্রতীকরূপে মহাতীর্থ-দক্ষিণেশ্বর আজ ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির নিদর্শনস্বরূপ সারা বিশ্বের এক বিস্ময়।"

এই সকল তথ্য ও কাহিনী হইতে বুঝিতে পারা যায়, সকল-কিছু তত্ত্ব ও তথ্য চিরদিন কখনও আবৃত বা লুক্কায়িত থাকিতে পারে না। জানিতে পারা যায়, রাণী রাসমণি কৈবর্ত্য-ঘরের কন্যা ছিলেন, সেইজন্য তিনি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলে কোন ব্রাহ্মণই ঐ মন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। শুধু তাহাই নহে, নীচজাতি বলিয়া শুনা যায়, অনেক ভিখারীও প্রসাদী অন্ন গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। এইরকম সমাজের পরিস্থিতি ও অবস্থা থাকাকালেই রাণী রাসমণি মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে।

শোনা যায়, রাণী রাসমণি একবার স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন এবং সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন স্বামী সারদানন্দ মহারাজ তাঁহার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে। তিনি লিখিয়াছেন: "রাণী রাসমণি ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকল বিষয় স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব-রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—'কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর, আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্যপূজা গ্রহণ করিব'।" আবার অন্যত্র পাওয়া যায়: "রাণী প্রথমে গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসীসমতুল'—এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থান অন্বেষণ করিয়া বিফল মনোরথ হয়েন। রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটি মনোনীত করিলেন—উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙ্গা ও গাজিসাহেব পীরের স্থান ছিল; স্থানটির কূর্মপৃষ্ঠের মতো আকার ছিল, ঐরূপ কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রে নির্দিষ্ট, অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী ঐ স্থানটি মনোনীত করেন।···দেবীমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন: ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্নভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ-পূজাদি করিতেছিলেন; মন্দির ও দেবীমূর্তি নির্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য বীরেশ্বরে শুভদিবসের নির্দ্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল,···ঐ মূর্তি ঘামিয়া উঠে এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে, যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠা কর'।" স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পুনরায় লিখিয়াছেন: "সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালে ১৮ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার

স্নানযাত্রার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে (দক্ষিণেশ্বরে) প্রতিষ্ঠিত করিলেন··· দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।"

এই সকল তথ্য হইতে জানা যায়, রাণী রাসমণি ঐ সকল চিন্তাধারায় আকুল হইয়া দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে দেবী শ্রীশ্রীভবতারিণীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে নানাকারণে শ্রীরামপ্রসাদকে শ্রীশ্রীঠাকুরের উত্তরসূরী বা অধ্যাত্মসাধনার পথে প্রেরণার কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরের শক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজকের পদ গ্রহণ করার সময়ে প্রায়ই মাতৃভাবে আত্মভোলা হইয়া পড়িতেন এবং ঐ সময়ে পঞ্চবটী-সাধনপীঠ হইতে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন : 'মা, এতো যে ডাকছি, তার কিছুই তুই কি শুনছিস না ? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না ?'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনীপাঠে জানা যায়, তিনি মানসচক্ষে দর্শন করিতেন শ্রীশ্রীভবতারিণীর বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি এবং ঐ মূর্তি কখনও হাসিতেছে, কখনও কথা কহিতেছে, কখনও নানাপ্রকারে শ্রীরামকৃষ্ণকে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে। তিনি অনেক সময়ে যন্ত্রনায় কাতর হইয়া পঞ্চবটীর তলার মাটিতে মুখ ঘসড়াইয়া বলিতেন—'মা, আমায় কৃপা কর, দেখা দে।' এইরূপ ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়া তিনি প্রায়ই শ্রীশ্রীভবতারিণীর কাছে জীবনসিদ্ধি ভিক্ষা করিতেন —নিজের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য এবং এজন্যই মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর স্নেহধন্য সন্তানরূপে সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলেন।

মোটকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে শ্রীশ্রীভবতারিণীর নির্দেশেই সর্বদা চলিতেন তাহা তাঁহার জীবনচরিত হইতে জানিতে পারি। তিনি শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজাসমাপনান্তে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত-প্রমুখ সিদ্ধ-ভক্তদিগের রচিত মাতৃসঙ্গীত গাহিতেন এবং গাহিতে গাহিতে তাঁহার নয়নধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইত। এইরূপভাবেই তিনি বিশ্বেশ্বরী মাকে পূজা করিতেন ও আরাধনা করিতেন। তন্ত্রসাধনার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সকল-কিছু উপকরণ-সামগ্রী ও প্রেরণা জোগাইতেন মহাশক্তিরূপিণী ও শ্রীরামকৃষ্ণের চিরসঙ্গিনী শ্রীশ্রীসারদাদেবী। মহাতীর্থ-দক্ষিণেশ্বরে সেই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যসহচারিণী শ্রীসারদাদেবীর মতো সমবেত হইয়াছিলেন কতশত ত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহী, ভক্ত ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সাধকগণ। ঐ সময়েই দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, অভেদানন্দ, শিবানন্দ, যোগানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, প্রেমানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, সারদানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ, তুরীয়ানন্দ, অদ্বৈতানন্দ প্রভৃতি এবং গৃহী ভক্ত-শিষ্যগণের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), ভক্ত-কবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি। আবার আসিয়াছিলেন গৌরীপণ্ডিত, বৈষ্ণবচরণ, ভৈরবী যোগেশ্বরীদেবী, অদ্বৈতবাদী ন্যাংটা তোতাপুরী ও অনেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিগ্বিজয় করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন—'যত মত তত পথ'। তাঁহার মাতৃতত্ত্ব, কালীতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব সকল মানুষের জীবনে মুক্তি ও অভয়দানের আলোকবর্তিকা বিতরণ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে 'বিশ্বরূপিণী মা সারদা'-গ্রন্থের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত ভূমিকা হইতে ঐ প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতেছি। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ লিখিয়াছেন : "এই

মাতৃতত্ত্বের পরিচয় দিতে গিয়া সাধক কমলাকান্ত ভিন্নভাবে পুরুষ-প্রকৃতি বা শিব-শক্তির অভেদ-স্বরূপের পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন,—

জাননা রে মন পরমকারণ
শ্যামা-মা শুধু মেয়ে নয়,
সে, মেয়ের বরণ করিয়া ধারণ
কখনও কখনও পুরুষ হয়।
* * *
যেরূপে যে'জন করয়ে সাধন
সেইরূপে তার মানসে রয়। —প্রভৃতি

পুরুষ ও প্রকৃতি; বা শিব ও শক্তি নামভেদ ও রূপভেদ মাত্র, স্বরূপে একই বিশুদ্ধ অদ্বয়চৈতন্য নিজেকে মহামায়া, পুরুষ, প্রকৃতি, শিব, শক্তি অথবা মাতৃতত্ত্বরূপে প্রকাশ করেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও এই তত্ত্ব উপলব্ধ সত্য। তিনি সকল ধর্মের সাধন করিয়া বুঝিয়াছিলেন পরমসত্য এক, কিন্তু বিভিন্ন সাধকের জন্য সেই সত্য বিচিত্র নামে ও রূপে যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনতত্ত্বরূপিণী শ্রীশ্রীভবতারিণী এই দৃষ্টিই শ্রীরামকৃষ্ণকে দান করিয়াছিলেন যে, সকল দেবতা, মূর্তি বা বিগ্রহ এবং সকল ধর্মসম্প্রদায়ের চরমতত্ত্ব সাকারে ও নিরাকারে সেই একই অখণ্ড ও অদ্বিতীয় সত্যের বিচিত্র প্রতিফলন বা প্রতিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মও এই কথাই বিশ্বের মানুষকে শিক্ষা দেয়।

●

॥ শ্যামাসঙ্গীত ॥

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী

মায়ার হাট তোর ভেঙ্গে দিয়ে
এবার কোলে নে মা তারা,
জগতের মা হয়ে আমার
করিসনিকো মাতৃহারা ॥
ফুরিয়ে আমার আসছে বেলা
ভেঙ্গে দে তোর পুতুলখেলা,
রাঙা পায়ের পরশ দিয়ে
ঘুচিয়ে দে আজ ভব-কারা ॥
পথ ভুলে মা বেড়াই ঘুরে
জেনেও কি তুই থাকবি দূরে ?
মা হ'য়ে সন্তানে ভুলিস
এ'রীতি তোর কেমন ধারা ॥
চোখের জ্যোতি যাবার আগে
আসিস্ মা তুই পুরোভাগে,
নয়নজলে আকুল হয়ে
দেখবো তোকে শিবদারা ॥

●

॥ বাল্মীকির রামায়ণ ও বাঙালীর রামায়ণ ॥

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

রামায়ণ কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন প্রদেশে নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও বহুদেশে প্রচারলাভ ক'রে যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, তার অর্থ এই নয় যে বাল্মীকির রচিত রামায়ণ সর্বত্র প্রচারলাভ ক'রে সর্বত্র সমান ভাবে গৃহীত হয়েছে ; বরং প্রকৃত কথা এই যে, বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যে এমন সব উপকরণ ছিল, যা ভারতের এক এক প্রদেশে গিয়ে সেই প্রদেশের জলবায়ু এবং মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নূতনভাবে রূপায়িত এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ভাষান্তরিত হয়েছে। তার ফলেই দেশবিদেশে তার জনপ্রিয়তা সম্ভব হয়েছে। যদি তা সম্ভব না হতো, তবে বাল্মীকির রামায়ণ ভারতের একখানি প্রাচীন কাব্যরূপে যে মর্যাদাই লাভ করুক, পৃথিবীর এক সুবিস্তৃত অঞ্চলের মানবজাতির জীবনে তার সক্রীয় প্রভাব অনুভব করা সম্ভব হতো না।

বাল্মীকির রামায়ণ রচিত হবার পর ভারতবর্ষে কয়েকটি প্রধান ধর্মের অভ্যুত্থান ও প্রচার হয়েছিল। তাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম এবং তাদের বহু পরবর্তীকালে আবির্ভূত বৈষ্ণবধর্মও উল্লেখযোগ্য। বাল্মীকির মূল রামায়ণ রচনার পর এই তিনটি ধর্মই নিজেদের আদর্শের দিক থেকে রামায়ণ-কাহিনীকে প্রভাবিত করেছিল। তাও ভারতের এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের জনমানসকে প্রভাবিত করেছিল। সুতরাং প্রাচীনকাল থেকেই বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের আদি রূপটি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারেনি। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম-প্রভাবিত রূপটিও নানাভাবে বাল্মীকির রচনার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ ক'রে তার যে একটি মিশ্র রূপ প্রকাশ করেছিল, তাই দেশবিদেশে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার লাভ করেছে। যদি তা না হতো, তবে কেবলমাত্র প্রাক্-বৌদ্ধযুগের বাল্মীকির রচনার প্রতি পরবর্তী যুগের জনসাধারণ কোনো আগ্রহ কিংবা কৌতূহল প্রকাশ করতে পারত না।

রামায়ণের কাহিনী বাংলাদেশে এসে যে কবে প্রবেশ করেছিল, তা বলা যায় না। তবে এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচারের পর তা বাংলাদেশে এসেছিল, তার আগে আসেনি। এ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাসের যে সকল নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয়, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তসাম্রাজ্যের আমলে সংস্কৃত ভাষা বাংলাদেশে প্রথম প্রবেশ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা সত্য, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ পালরাজত্বের পূর্বে এদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ব্যাপক হয়ে উঠতে পারেনি। পাল সম্রাটগণ ধর্মে বৌদ্ধ হলেও যে-কোনো কারণেই হোক, বৌদ্ধধর্মীয় পালিভাষার পরিবর্তে দেবভাষা সংস্কৃতেরই উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁরা পালিভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষাকেই তাঁদের রাজসভা বা রাজকার্য পরিচালনার সরকারী ভাষা-রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যে সকল তাম্রলিপি ও অনুশাসন প্রচার করেছেন, তাদের কোনটিই পালিভাষার মাধ্যমে করা হয়নি, বরং তার পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষাতেই করা হয়েছে। পাল রাজত্বের আমলে বাংলাদেশের বহু স্থানে নানা হিন্দুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বহু ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দান ক'রে তাদের পরিচালনার জন্য তাদের বসতি স্থাপন করবার সুযোগ ক'রে

দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে তখনই দেশে সংস্কৃত চর্চার সূচনা হ'য়ে তার প্রভাব সর্বক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। অনুমান করা যায়, সেই সময়ই রামায়ণ-কাহিনীও এ দেশে প্রবেশ করে এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচারলাভ করে।

এ কথা সত্য মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত সেদিন সংস্কৃত শিক্ষায় শিক্ষিত থাকলেও জনসাধারণ সেদিন নিরক্ষর ছিল। সেইজন্য প্রশ্ন হতে পারে এই নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে রামায়ণ-কাহিনী সেদিন কি ভাবে প্রচারলাভ করেছিল? এই বিষয়টি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

রামায়ণকাব্যের মধ্যেই দেখা যায় যে, রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকি তাঁর কাব্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যটি প্রচার করবার একটি সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন, কারণ, তখনকার দিনে কেবল মুষ্টিমেয় সংস্কৃত-শিক্ষিত পণ্ডিতের মধ্যে তাঁর রচনা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকলে তাঁর উদ্দেশ্য যে পূর্ণ হতে পারে না, তা তিনি গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন। সেইজন্য তিনি সঙ্গীতের মাধ্যমে রামায়ণ-কাহিনী নিরক্ষর জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করবারও ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর রচনা থেকেই দেখা যায়, তিনি রামচন্দ্রের পুত্র লবকুশকে রামায়ণের কাহিনী গান করে প্রচার করবার উপযোগী শিক্ষা দিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের রাজসভায় বাল্মীকির উপস্থিতিতে সঙ্গীতের মাধ্যমেই রামায়ণ প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়েছিল। বাল্মীকি স্বয়ং তাঁর কাব্যের প্রচারের পদ্ধতিটির নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই ধারাই অনুসরণ ক'রে প্রথম থেকেই রামায়ণ-কাহিনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে এসেছে। একথা সহজেই অনুমান করা যায়, সেই সঙ্গীতের ভাষা যে কেবল সংস্কৃতই ছিল, তা নয়, তা জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায়ও পরিবর্তিত হয়ে জনসাধারণের নিকট আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

কথকতা নামক আমাদের দেশে লোকশিক্ষার যে একটি সহজ পদ্ধতি আছে, তা অত্যন্ত প্রাচীন; বৈদিক যুগ থেকেই আমাদের দেশে তা চলে এসেছে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীও প্রথম থেকেই কথকতার সূত্রে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারলাভ করতে আরম্ভ করেছিল। রামায়ণ গান এবং রামায়ণের কথকতা দুটি স্বতন্ত্র ধারা সমান্তরালভাবেই বাংলাদেশেও প্রচলিত হয়েছিল। যেখানেই পাল রাজাদের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু দেবদেবীর মন্দির এবং তাদের পরিচালনার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছিল, সেখানেই হিন্দু ধর্মচর্চারও কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, সে সব স্থান কেন্দ্র করেই রামায়ণ গান এবং রামায়ণের কথকতা হতো। তা থেকে বাংলাদেশে পাল রাজত্বের আমল থেকেই জনসাধারণ রামায়ণ-কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হতে আরম্ভ করেছিল। কথকতা এবং গানের মাধ্যমে রামায়ণ-কাহিনী প্রচার হবার ফলে জনসাধারণের নিরক্ষরতা তাঁদের রামায়ণ-কাহিনী জানবার কিংবা তার রসাস্বাদন করবার কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি। শুধু রসাস্বাদনই নয়, তা থেকে প্রেরণা লাভ করে যে সকল নিরক্ষর ব্যক্তির মধ্যে কিছুমাত্র প্রতিভা থাকত, তারা মুখে মুখে তার কাহিনী নিজেদের ভাষায় রচনা করেও প্রচার করতে লাগল। ক্রমে পণ্ডিতের পুঁথি থেকে গিয়ে রামায়ণ-কাহিনী জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচার হতে লাগল। তারপর মুখে মুখে প্রচারের যে দোষগুণ দু-ই তার কাহিনীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল। তার ভিতর দিয়েই ক্রমে রামায়ণ-কাহিনীর জাতীয়করণের সূচনা হলো। ক্রমে বাংলাদেশেও বাল্মীকির

রামায়ণ আর বাল্মীকির রামায়ণ রইল না, তা বাঙ্গালীর রামায়ণ হয়ে উঠল ; এই বাঙ্গালীর রামায়ণের একটি সুসংবদ্ধ রূপ প্রথম প্রকাশ করবার গৌরব যিনি লাভ করলেন তিনিই বাংলার জাতীয় কবি কৃত্তিবাস।

কিন্তু খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের আগে থেকেই বাংলাদেশে রামায়ণের এই জাতীয়করণ আরম্ভ হয়েছিল। কৃত্তিবাস তার খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপকরণগুলোকে একসূত্রে নিয়ে সুসংবদ্ধ করে দিয়েছেন মাত্র।

কৃত্তিবাসের মধ্যে একটি উদার এবং সংস্কারমুক্ত মন ছিল। তা না থেকে তার মধ্যে যদি কোনো রক্ষণশীলতার মনোভাব থাকত, তবে তিনি বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদ করতেন সত্য, কিন্তু তা কখনো বাঙ্গালীর রামায়ণ হয়ে উঠতো না।

কিন্তু যে উপকরণগুলো দিয়ে কৃত্তিবাস তাঁর অনুবাদের জাতীয়করণ করেছেন, সেই উপকরণ কৃত্তিবাসের আগে থেকেই বাঙ্গালীর মানসক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হতে আরম্ভ করেছিল। সুতরাং কৃত্তিবাস যে সকল জাতীয় উপকরণ দিয়ে তাঁর রামায়ণকে সমৃদ্ধ করেছিলেন, তা কৃত্তিবাসের নিজস্ব উদ্ভাবিত কিংবা স্বাধীন চিন্তার ফল ছিল না। যদি তা হতো তবে কৃত্তিবাস জাতির মানস-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারতেন না। জাতীয় উপাদান ব্যক্তিবিশেষ উদ্ভাবন করে না, জাতির মানসক্ষেত্রে তা ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়। যিনি জাতীয় কবি তিনি তা তাঁর অন্তরের মধ্যে আপনা থেকেই অনুভব করেন এবং তার প্রেরণার বশবর্তী হয়ে নিজের রচনার মুখে তা প্রকাশ করেন। সুতরাং কৃত্তিবাসের পূর্বেই বাংলাদেশে রামায়ণের জাতীয়করণ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। রামায়ণের কাহিনীর ক্ষীণতম একটি ভিত্তি অবলম্বন করে তার উপর জাতীয় জীবনের নানা চিন্তাভাবনা রূপ নিতে আরম্ভ করেছিল ; কালক্রমে কৃত্তিবাসের রসচেতনার মধ্যে যখন তা ধরা দিয়েছিল, তখন তাঁর সমসময়কার রাম-কাহিনীর একটা লিখিত রূপ প্রকাশ করলেও রামায়ণের জাতীয়করণের ধারা তার মধ্যেই অবিচল হয়ে থাকেনি ; বরং তার ধারা অব্যাহত চলেছে। তাই কৃত্তিবাসের পরেও যারা বাংলায় রামায়ণ রচনা করেছেন, তাঁরাও কেউ কৃত্তিবাসকে পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। এমন কি, কৃত্তিবাসের রচনার মধ্যেও পরবর্তীকালে এই জাতীয় জীবনে যে সকল নূতন নূতন উপকরণের উদ্ভব এবং ধ্যান ধারণার উন্মেষ হয়েছে তাও গিয়ে স্থান লাভ করেছে। সেইজন্য খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলতেও আজ আর কিছু নেই, রামায়ণের জাতীয়করণের ধারা অব্যাহত থেকে তাকে নূতন নূতন যুগের উপযোগী করে তুলেছে।

আমরা সকলেই জানি, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই কৃত্তিবাসের অবির্ভাব হয়েছিল। কৃত্তিবাসের সময় বৈষ্ণব ভাবনা কয়েকটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সারা বাংলাদেশব্যাপী প্রচার হয়ে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে যে বৈষ্ণব ধর্মের এত ব্যাপক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তার কারণ কি ? তার কারণ, কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বন করে তাঁর রচনায় তাঁর সমসাময়িক বাঙ্গালীর ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পরই

বাঙ্গালীর ভাব-রাজ্যে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারের ফলে সম্ভব হয়েছিল। কৃত্তিবাসের রচনা তার প্রভাব থেকে কিছুতেই মুক্ত থাকতে পারল না। তার ফলে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হলেন, লঙ্কার রাক্ষসগণ কৃষ্ণ-ভক্ত হয়ে উঠল, এমনকি রাবণও মৃত্যুকালে শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ লাভ করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মুক্তিলাভ করল। তরণীসেন বধের মত ভক্তিমূলক বিস্তৃত কাহিনী তার মধ্যে যুক্ত হলো। কৃত্তিবাসের মূল-রামায়ণের মধ্যে যে এত ব্যাপক বৈষ্ণব প্রভাব ছিল না, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

আগেই বলেছি, কৃত্তিবাসের পরবর্তীকালে যে সকল রামায়ণ-অনুবাদকারীর আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁদের কেউ কৃত্তিবাসকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেন নি, বরং যিনি যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি সেই যুগের চিন্তাধারাকে আদর্শ করে নিয়েছিলেন।

বাঙ্গালী চিরদিনই সংস্কারমুক্ত জাতি। চারিদিককার সকল সংস্কারের বন্ধনকে অস্বীকার করে তার চিন্তা ও ভাবধারার অগ্রগতি চলেছে। সেইজন্য সে কোনদিন বাল্মীকির আদর্শের মধ্যে ত অবিচল থাকতে পারেই নি, এমনকি কৃত্তিবাসের আদর্শের মধ্যেও স্থির হয়ে থাকতে পারেনি। আজকের কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাস আর নেই, নূতন নূতন যুগে নূতন নূতন ভাব এবং চিন্তা নিয়ে কৃত্তিবাসের উত্তরাধিকারীদের তাতে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাঁরা কেউ রামায়ণের কাহিনীকে মূলতঃ পরিত্যাগ না করেও নূতন নূতন যুগে উত্তীর্ণ হয়ে বাঙ্গালী জীবনে নূতন নূতন উপকরণে তাদের জাতীয় কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সে জন্যই কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনীকে জাতীয়করণ করবার পরও বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রামায়ণের আরো কতকগুলো আঞ্চলিক রূপ প্রকাশ পেয়েছিল; সেগুলোকে আঞ্চলিক রামায়ণ বলা যেতে পারে। তাদের মধ্যে সামগ্রিক বাঙ্গালীর জাতীয় অনুভূতি-বিকাশের পরিবর্তে এমন কতকগুলো স্থানীয় বা আঞ্চলিক ভাব এবং উপকরণ প্রবেশ করেছে যে সেগুলো সমগ্র বাংলাদেশে সমানভাবে গৃহীত হতে পারে না। তাদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার বিষ্ণুপুরী রামায়ণ এবং পূর্ববাংলার মেয়েলী রামায়ণ বা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ উল্লেখযোগ্য।

বিষ্ণুপুরী রামায়ণের রচয়িতার নাম শঙ্কর চক্রবর্তী, তাঁর 'উপাধি' ছিল কবিচন্দ্র। অবশ্য কবিচন্দ্র নামে বাংলা-সাহিত্যে প্রায় ত্রিশজন কবির সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে শঙ্কর চক্রবর্তী কবিচন্দ্রের পরিচয় জানতে পারা যায়। তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বিষ্ণুপুর মল্ল-রাজসভার সভাকবি ছিলেন। বাঁকুড়াজেলা তাঁর জন্মস্থান। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করে কবিত্বের খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে তাঁর রচিত রামায়ণ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' নামে পরিচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত বিষ্ণুপুরী রামায়ণও বিশেষত্বপূর্ণ রচনা। তা পশ্চিমবঙ্গ বিশেষতঃ পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গ-অঞ্চলে যেমন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরজেলার ঝাড়গ্রাম-অঞ্চলে ব্যাপক প্রচারলাভ করেছিল এবং এই অঞ্চলের রামলীলা ঝুমুর প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরী-রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, পুরুলিয়াজেলায় রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে যে বিশ্বখ্যাত ছৌনৃত্যনাট্যের প্রচলন আছে, তাও প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরী-রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করেই

অনুষ্ঠিত হয়। বিষ্ণুপুরী-রামায়ণে 'শিবরামের যুদ্ধ' নামে একটি প্রসঙ্গ আছে। তাতে দেখা যায় সেই অঞ্চলে রাম-চরিত্র অপেক্ষা শিব-চরিত্রের সমাজে প্রাধান্য ছিল। বর্তমানে কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত যে রামায়ণ প্রচলিত আছে, তাতে বৈষ্ণব-প্রভাব অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। অথচ কৃত্তিবাসের পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়ে এদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। সুতরাং তাঁর উপর বৈষ্ণব-প্রভাব পরবর্তী যোজনা। বিষ্ণুপুরী-রামায়ণে বৈষ্ণবপ্রভাব কৃত্তিবাসের মতো এত ব্যাপক নয়। তাঁর মধ্যে বরং কতকটা শৈব প্রভাব অনুভব করা যায়। 'শিব-রামের যুদ্ধ' তারই নিদর্শন মাত্র। বিষ্ণুপুরী-রামায়ণের শিবরামের কাহিনীতে দেখা যায় যে, হনুমানের সঙ্গে যুদ্ধে রাম এবং লক্ষ্মণ উভয়ই পরাজিত হয়েছিলেন। অবশেষে শিবের সঙ্গে রামচন্দ্রের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধে যখন রামচন্দ্র প্রায় পরাজিত হতে চলেছেন, তখন পার্বতীর মধ্যস্থতায় তাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এখানে রামায়ণের রাম-ভক্ত হনুমানের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের যুদ্ধের ঘটনাই বিশেষত্বপূর্ণ। বাল্মীকি কিংবা কৃত্তিবাসের ঐতিহ্যের সঙ্গে এখানে মৌলিক বিষয়েই বিরোধিতা দেখা যায়; অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার এই অঞ্চলে শ্রীরামচন্দ্রকে সমাজে স্বীকার করা হয়নি, সেখানে শৈবধর্ম নিজের ধ্বজা বহু পূর্ব থেকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিল বলে অনুভব করা যায়। এই অঞ্চলে 'শিব-শঙ্করীর-রাম' নামেও একটি পুঁথি পাওয়া গেছে। তাতে পার্বতীর সঙ্গে শিবের রাসলীলা বর্ণিত হয়েছে। রাধাকৃষ্ণ এখানে অনুপস্থিত। সুতরাং শৈব-প্রভাব যে এই অঞ্চলে কত গভীর হয়েছিল, তা বুঝতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরী-রামায়ণে তার প্রতিফলন আছে। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে আদ্যোপান্ত মুণ্ডা ভাষায় রচিত একটি মৌখিক রামায়ণের সন্ধান পাওয়া গেছে। রাম-কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত করে মুণ্ডা বা সাঁওতালী ভাষায় রচিত হয়েছিল। কেন্দ্রী নামক একটি বাদ্যযন্ত্রের সহায়তায় একজন মূল গায়েন কয়েকজন দোহারের সঙ্গে মিলিত হয়ে সারারাত্রিব্যাপী এই রামায়ণ গান গেয়ে থাকে। অবশ্য মুণ্ডা-রামায়ণ মুণ্ডাভাষী জাতির হিন্দুসমাজের সান্নিধ্যে বাস করবারই প্রত্যক্ষ ফল, তা আদিবাসী-সমাজেই প্রচলিত। আদিবাসীর পরিকল্পনায় রাবণ-চরিত্রই আদর্শ চরিত্র, এবং মুণ্ডা-রামায়ণে রামচন্দ্রের পরিবর্তে রাবণ-চরিত্রকে নায়ক-চরিত্ররূপে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যায়, রামায়ণ-কাহিনীকে যে যার প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেছে। শক্তি-সম্প্রদায় রামায়ণ-কাহিনীর মধ্য দিয়ে রামচন্দ্রকে দিয়ে চণ্ডীপূজো করিয়ে শাক্তধর্মের মহিমা প্রচার করেছে, বৈষ্ণবেরা রামচন্দ্রকে শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুর অবতার করে 'রাবণ'কেও বৈষ্ণব করে ছেড়েছে, শৈবরা শিবের হাতে বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে শৈবধর্মের মহিমা কীর্তন করেছে; এমন কি, আদিবাসীরা 'রাবণের' মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়েও রামায়ণ-কাহিনীই অবলম্বন করেছিল। এই ব্যাপার চিরকাল ধরেই চলে আসছে। রামায়ণের ব্যাপক প্রচার দেখতে পেয়ে বৌদ্ধসম্প্রদায় রামায়ণের কাহিনী নিজেদের আদর্শে পরিবর্তিত ক'রে নিয়ে প্রচার করতে চেয়েছে—সেই সূত্রেই দশরথ-জাতকের জন্ম হয়েছিল। জৈন সম্প্রদায়ও নিজেদের দিক থেকে রামায়ণ-কাহিনীর পরিকল্পনা করে নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির কাজে নিয়োগ করেছিল। তা-ই জৈন-রামায়ণ বলে খ্যাতি লাভ করেছে।

কিন্তু বাংলাদেশে এমন একটি রামায়ণ রচিত হয়েছিল, যার মধ্যে কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে গার্হস্থ্য-ধর্মকে গৌরবান্বিত করা হয়েছিল। তা পূর্ববাংলার মেয়েলী রামায়ণ বা চন্দ্রাবতীর রামায়ণ। তার মধ্যে বহির্জীবনের যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনার উল্লেখ অতি অল্পই আছে। এমন কি, নাই বললেই চলে। কেবলমাত্র গার্হস্থ্য-জীবনের কথাই তাতে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য প্রকৃতপক্ষে তাকে গার্হস্থ্য-রামায়ণ বলা যেতে পারে।

এই রামায়ণ-রচয়িত্রীর নাম চন্দ্রাবতী; হয়ত লিখিতভাবেই তিনি তাঁর রামায়ণ রচনা করেছিলেন, কিন্তু এখন তা কেবলমাত্র মুখে মুখে প্রচলিত, তার লিখিত কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই রামায়ণে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের পটভূমিকাতেই তার রচয়িত্রী বাল্মীকির রচিত অযোধ্যার রাজ-পরিবারকে কল্পনা করেছেন। রামচন্দ্রই হউক, রাবণই হউক, তাদের গার্হস্থ্য-জীবনের বাইরে আর যে জীবন ছিল, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে এনে উপস্থিত করা হয়েছে। কেবলমাত্র অন্তঃপুরের জীবনকে পল্লবিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে সাম্প্রদায়িক কোনো কথাই নেই।

মেয়েলি-রামায়ণের রচয়িত্রী দ্বিজবংশী-নামক মধ্যযুগের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির বিদুষী কন্যা ছিলেন। হয়ত ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর পিতার সহায়তায় বাল্মীকি রামায়ণও বাংলায় অনুবাদ করতে পারতেন। কিন্তু সেপথে তিনি অগ্রসর হননি। পারিবারিক জীবনের একটি আদর্শ স্থাপন করা বাল্মীকি-রামায়ণের উদ্দেশ্য ছিল, কোনো সম্প্রদায়-বিশেষের মাহাত্ম্য প্রচার নয়, সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সর্বাপেক্ষা সার্থক রচনা বলতে হবে; কারণ, তাতে তা ছাড়া আর কিছু নেই।

●

।। অগ্নিপুরাণে সাঙ্গীতিক ছন্দ, পদ ও বৃত্ত ।।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

পুরাণগুলির সংখ্যা-সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি,—যদিও বিভিন্ন ঐতিহাসিক মনীষীদের মধ্যে পুরাণের নাম, সংখ্যা ও সন-তারিখ নিয়ে কিছু-কিছু মতভেদ আছে। ডক্টর এ. ডি. পুসলকার তাঁর *Studies in the Epics and Purāṇas* (1955)-গ্রন্থে রামায়ণ ও মহাভারতের পর পুরাণগুলির আলোচনা করেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মনীষীদের অভিমতগুলির উল্লেখ করেছেন। পুরাণগুলির সংখ্যা ও শ্রেণী-বিভাগ-সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "The list runs : Brahma, Padma, Vishnu, Vāyu, Bhāgavata, Nāradiya, Mārkandeya, Skanda, Vāmana, Kurma, Matsya, Garuda and Brahmānda. Some *Purāṇas* read Śiva in place of Vāyu. Devi-bhāgavata instead of Vaishnava-Bhāgavata." তাছাড়া আছে উপ-পুরাণগুলি। পূর্বে পুরাণসাহিত্যগুলির নাম ও সংখ্যার উল্লেখ করেছি, কিন্তু মতভেদের পরিপ্রেক্ষিতে মতবাদের আর অন্ত নাই। তাছাড়া শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতাদের অধিদেবতা বলে উল্লেখ ক'রে তাদের সমশ্রেণীর প্রভাবিত মহাপুরাণও কম নেই। তাছাড়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণগুলিকে কেন্দ্র বা সম্পর্কিত ক'রে পুরাণগুলিকে এ'ভাবে ভাগ করা হয়েছে—

১। সাত্ত্বিক—বিষ্ণু, নারদীয়, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ পুরাণগুলি।

২। রাজসিক—ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ব্রহ্ম, বামন ও ভবিষ্য পুরাণগুলি।

৩। তামসিক—মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, অগ্নি ও স্কন্দ পুরাণগুলি।

তাছাড়া শিবের মহিমাসূচক দশটি পুরাণের কথাও অনেকে উল্লেখ করেন। স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মার গ্রন্থের মহিমাসূচক চারটি পুরাণ, আর দুটি দুটি পুরাণ দেবী ও শ্রীহরির মহিমাসূচক। যেমন—

অষ্টাদশ পুরাণেষু দশভির্গীয়তে শিবঃ।
চতুর্ভির্ভগবান্ ব্রহ্মা দ্বাভ্যাং দেবী তথা হরিঃ॥

দেবতাদের কেন্দ্র ক'রে পুরাণগুলিকে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তামিলীয় প্রামাণ্য গ্রন্থের অভিমতে এবং ঐতিহাসিক রামচন্দ্র দীক্ষিতর সেগুলির উল্লেখ ক'রে বলেছেন—

(১) ব্রহ্মাদেবতা—ব্রহ্ম ও পদ্ম,

(২) সূর্যদেবতা—ব্রহ্মবৈবর্ত,

(৩) অগ্নিদেবতা—অগ্নি,

(৪) শিবদেবতা—শিব, স্কন্দ, লিঙ্গ, কূর্ম, বামণ, বরাহ, ভবিষ্য, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ড।

(৫) বিষ্ণুদেবতা—নারদ, ভাগবত, গরুড় ও বিষ্ণু।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অবশ্য ছ'টি শ্রেণীতে সমস্ত পুরাণগুলিকে বিভক্ত করেছেন,—যদিও পুরাণগুলির সৃষ্টি ও বিভাগ-সম্বন্ধে মতভেদ কম নেই—সেকথা পূর্বে বলেছি। মোটকথা

---

* গত 'বিশ্ববাণী' সংখ্যায় (১৩৮৩) 'লিঙ্গপুরাণে সঙ্গীত'-সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

পুরাণসাহিত্যের সংখ্যা মোটেই কম নয়। পুরাণগুলি থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান বহু-কিছু বিষয়ই জানতে পারি, সুতরাং পূর্বেই বলেছি পুরাণগুলি ইতিহাসেরই পর্যায়ভুক্ত, তবে গৌতম-বুদ্ধের সময়ের বা তারপরে ইতিহাসের লিখন-ভঙ্গীতে যেমন সময়, তারিখের ও সঙ্গে সঙ্গে তার পারম্পর্যের একটি স্পষ্ট বা চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যায়, পুরাণ-ইতিহাসগুলিতে তেমনটি ঠিক পাওয়া যায় না। তাহলেও পুরাণগুলির মূল্য ও সার্থকতা কতটুকু সে সম্বন্ধে এ. ডি. পুশলকার লিখেছেন : "The importance of the Purāṇas for the comprehensive history of Indian culture and civilization is immense, as there are sections dealing with polity, sociology, administrative institutions, religion and philosophy, law and legal institutions, fine arts, architecture, etc" লিঙ্গ, অগ্নি, বিষ্ণুধর্মোত্তর প্রভৃতি পুরাণগুলিই তার সাক্ষ্য। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ কিছু পরবর্তীকালের সংকলন-গ্রন্থ হলেও তার বিষয়বস্তু প্রচুর এবং বিশেষ ক'রে চিত্র, ভাস্কর্য, সঙ্গীত প্রভৃতি ললিতকলার পরিচয় পাওয়া যায় তা থেকে চাক্ষুষভাবে। কাশ্মীরে রচিত 'নীলমতপুরাণ'-কে (খ্রীঃ ৫০০-৮০০ শতকে রচিত) কাশ্মীরের শিল্প-সংস্কৃতির একটি ইতিহাস বলে চলে—যদিও পণ্ডিত কহ্লন-রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' এবং পণ্ডিত দামোদর গুপ্ত-রচিত 'কুট্টনীমতম্' কাশ্মীররাজ্যের বহু বিষয় নিয়েই আলোচনা করেছে। তবে পণ্ডিত হেমাদ্রী-রচিত 'আদিত্যপুরাণ' নীলমতপুরাণের চেয়ে প্রাচীন। পণ্ডিত ভিন্টারনিজ *History of Indian Literature*, Vol. I-গ্রন্থে লিখেছেন : "The historian Kalhana (about 1148 A. D.) drew on the *Nilamata* in his *Rājatarangini*' for the ancient history of Kashmir, and he regarded it as a venerable *Purāṇa*. It must, therefore, be several centuries earlier than Kalhana's work." ডক্টর পি. কে. গোডে *Studies in the History of Indian Festivals* (vide 'Journal of the Ganganath Jha Research Institute', Vol. III, Feb. 1946, pt. 2. p. 208)-প্রবন্ধে লিখেছেন : "Presuming that the আদিত্যপুরাণ is earlier than the নীলমতপুরাণ, it is possible to suppose that the নীলমত has borrowed the extract from the আদিত্যপুরাণ which is mentioned by Alberuni (A. D. 1030) in his list of *Purāṇas*."[1]

॥ অগ্নিপুরাণ ॥

অগ্নিপুরাণের অধিদেবতা অগ্নি—যিনি প্রচ্ছন্ন-সূর্য। বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে বিশেষ দুটি দেবতার নাম পাই—বরুণ ও মিত্র, অর্থাৎ আকাশ ও সূর্য। বরুণদেবতাকে কল্পনা করা হ'ত ক্ষীরোদসমুদ্র বা সমুদ্র-রূপে এবং বিশাল ও সর্বত্রব্যাপ্ত বরুণ-সমুদ্রের কোলে মিত্রদেবতা সূর্য সর্বদাই ভাসমান বা সুশোভিত। এজন্য ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রেই 'মিত্রাবরুণৌ'-শব্দের উল্লেখ

1. Vide also Dr. Hazra : *Puranic Records* (Dacca, 1940), p. 90.

পাওয়া যায়। এটা যেন বরুণদেবতার সঙ্গে মিত্র বা সূর্য-দেবতার পরমমিতালী—যেমন মিতালী বা মৈত্রীসম্পর্ক ছিল বৈদিকযুগে দ্যৌ বা স্বর্গ (আকাশ) ও পৃথিবীর সঙ্গে (দ্যৌ-বা দ্যাবা-পৃথিবী)। পরবর্তীকালে সূর্যের অনুকল্প-রূপে দেবতার কল্পনা করা হ'ল অগ্নি বা অগ্নিদেবতাকে বাস্তব রূপ দিয়ে। সেজন্য বলা হ'ত 'আকাশস্থ সূর্য' ও 'পৃথিবীস্থ সূর্য'—সূর্য ও অগ্নি। পৌরাণিক যুগে পুরাণসাহিত্য বা পুরাণেতিহাসগুলি যখন রচিত হয় তখন আধ্যাত্মচেতনার উন্মুক্ত প্রেরণা নিয়ে সেগুলিকে কোন প্রধান দেবতা বা অধিদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হ'ল। আধ্যাত্ম-চেতনার আদিভূমি ভারতবর্ষের মর্মকথা ও দৃষ্টিভঙ্গীও তাই।

অগ্নিপুরাণের রচনাকাল নিয়ে ঐতিহাসিক ও বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। ডক্টর হাজরার মতে, অগ্নি বা আগ্নেয়-পুরাণ ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমপাদে রচিত হয়েছিল। অধ্যাপক পি. ভি. কানের মতে অগ্নিপুরাণের রচনাকাল প্রায় ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। ডক্টর এস. কে. দের অভিমত অনেকটা তাই। মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমতে অগ্নিপুরাণ ৮০০—৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত।

ডক্টর হাজরা বলেন, বর্তমান অগ্নিপুরাণ অর্থাৎ অগ্নিপুরাণ বর্তমানে যে আকারে ও রূপে পাওয়া যায় তা পাঞ্চরাত্র-আগমেরই অনুরূপ। অবশ্য এই অভিমত অনেকে স্বীকার করেন না। তারপর অগ্নিপুরাণের রচনা বা সংকলনকার্য কোথায় আরম্ভ হয়েছিল তাও ঠিক জানা যায় না। মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনুমান যে, অগ্নিপুরাণের প্রথম রচনাকর্ম আরম্ভ হয় বাঙলাদেশে, অথবা বিহারে অর্থাৎ গিরিব্রজে।

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে বিভিন্ন কল্পের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তেমনি অগ্নিপুরাণে ঈশানকল্পের পরিচয় আছে এবং এই পরিচয় দিয়েছিলেন অগ্নিদেবতা বশিষ্ঠদেবকে। এতে রাজা অম্বরিষেরও উল্লেখ আছে। অধিকাংশ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের মতে, অগ্নিপুরাণ রচিত হয় খ্রীষ্টীয় ৯ম শতকে, অথবা ৮ম-৯ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে। ডক্টর হাজরা ডক্টর কাণে, ডক্টর দে, মঃমঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির মতবাদের উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "*Agni-Purāṇa* cannot possibly be earlier than 800 A. D., because from the examination of the *Matsya*, *Varāha*, and earlier *Purāṇas* we understand that the Tāntric elements began to be absorbed appreciably in the *Purāṇas* not earlier than about 800 A. D."

ডক্টর হাজরা মনে করেন, বর্তমান সংস্করণ অগ্নিপুরাণে পাঞ্চরাত্রসংহিতার কিছুটা প্রভাব আছে—সেকথা বলেছি। অগ্নিপুরাণ 'বহ্নিপুরাণ' নামেও প্রচলিত এবং পরাশরস্মৃতিতে মাধবাচার্য এই নামের উল্লেখ করেছেন। নারদীয়পুরাণ রচিত হয় অগ্নিপুরাণের সমসাময়িক-কালে (খ্রীঃ ৮০০ শতকে) বা তার সামান্য-কিছু পরে। নারদের নাম সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত এবং নারদীয়পুরাণ ঋষি নারদের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত, (নারদ চারজন—শিক্ষাকার, সঙ্গীত-উপনিষদ্‌কার, মকরন্দকার ও রাগচন্দ্রিকাকার)। আর আর নারদের নাম আছে রামায়ণে, মহাভারতে, হরিবংশে ও বিভিন্ন পুরাণে, উপপুরাণে ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যে, কিন্তু তাহলেও

নারদীয়-পুরাণে সঙ্গীত-উপাদানের বিশেষ-কিছু উল্লেখ নাই, বরং নারদীয়পুরাণকে স্মৃতিগ্রন্থই বলা যায়।

অগ্নিপুরাণে বিশেষভাবে বিচিত্র ছন্দ (ছন্দসার), ছন্দজাতি, নাটক, শৃঙ্গারাদি রস, স্থায়ী প্রভৃতি ভাব, রীতি, নৃত্যাদি অঙ্গকর্ম, অভিনয়, শব্দালঙ্কার, অর্থালঙ্কার, পদ, পদার্থ, কাব্য, কাব্যগুণ, কাব্যদোষ, ব্যাকরণ, সন্ধি, বিভক্তি, লিঙ্গ, কারক, সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতির উল্লেখ ও আলোচনা আছে এবং এদের মধ্যে নাটক, অভিনয়, রস, ও ভাবের আলোচনাই সঙ্গীতশিল্পের বিশেষ উপযোগী।

॥ ছন্দঃ ॥

অগ্নিরুবাচ—

ছন্দোঽধিকারে গায়ত্রী দৈবী চৈকাক্ষরা ভবেৎ।
পঞ্চদশাক্ষরা সা স্যাৎ প্রাজাপত্যাষ্টবর্ণিকা ॥ ১
* * *
প্রাগ্‌যজুষাং সংজ্ঞা স্যাচ্চতুঃষষ্টিপদে লিখেৎ ॥ ৫

অগ্নিদেবতা বলেন, ছন্দের অধিকারে গায়ত্রী একাক্ষরা, প্রাজাপত্যরূপে অষ্টবর্ণা, যজুর্বেদে ষড়্‌বর্ণা, সামবেদে দ্বাদশাক্ষরা (বারোটি অক্ষর) ও ঋগ্বেদে অষ্টাদশ বর্ণা। * * উষ্ণিক, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুভ, জগতী প্রভৃতি ছন্দ—এরাও গায়ত্রীশ্রেণীভুক্ত ও ব্রহ্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। গায়ত্রী ব্রাহ্মণদের আচরণীয়। প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নকালে ও সায়ংকালে গায়ত্রীর ধ্যান করা হয় তিনটি রূপে। গায়ত্রী সবিতা বা সূর্যের প্রশংসায় মুখরিত।

গায়ত্রী, অনুষ্টুপ, বৃহতী প্রভৃতি ছন্দ সামগানের বিশেষ উপযোগী। গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের বিভিন্ন অক্ষরগুলি বৈদিক স্তোত্রে ও গানে অনেক সময়ে তালের বা কালের অংশরূপে ব্যবহৃত হ'ত। সুতরাং বৈদিক গানে বৈদিক ছন্দ গায়ত্রী প্রভৃতির প্রয়োগ অপরিহার্য ব'লে ঐ ছন্দগুলি যে বৈদিক গান তথা সঙ্গীতের উপযোগী তা বুঝা যায়।

বৈদিকযুগে আজ্যদোহম্, মহাব্রামদেব্যম্ প্রভৃতি সামের মতো গায়ত্রম্ বা গায়ত্রীসাম-ও গান করা হ'ত। বর্তমানে উপনয়নের পর ব্রাহ্মণরা সাবিত্রী-গায়ত্রী পাঠ ও জপ করেন, কেননা সামগানের রীতি বর্তমানে ব্রাহ্মণরা গানের উপযোগী ক'রে শিক্ষা করেন না। 'ওঁ নমঃ সামবেদায়' বলে গায়ত্রীসাম বা গায়ত্রীগানে আরম্ভ হয়। তারপর গানের রীতি ছন্দবিভাগ অনুযায়ী হয়। ছন্দবিভাগ যেমন—

১ ২ ৩ ১ ২য় ৩ ১ ২ ৩ ১ ২
ঋচা ॥ ত ৎ স বি তু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য
১ —২ ৩ ১ ।২ ৩ ১ ২॥
ধীমহী। ধী য়ো য়ো নঃ প্রচো দয়াৎ ॥১

গানে ব্যবহৃত হ'ত স ন্‌ রি (ষড়্‌জ, মন্দ্র-নিষাদ ও ঋণভ) বৈদিকোত্তর লৌকিক স্বর-তিনটি। এগুলি লৌকিক স্বর ও আরোহণধর্মী, কিন্তু বেদের স্বর প্রথম, দ্বিতীয়াদি—অবরোহণধর্মী। এই গানে (গায়ত্রীসামে) ব্যবহৃত হয় দীর্ঘ—৩। পর্ব—৬। মাত্রা—২৪।

আমার *A Comprehensive History of Indian Music*-গ্রন্থের প্রথমভাগে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দ ও তাদের অক্ষরসংখ্যাগুলির বিশেষভাবে আলোচনা করেছি। *Vedic Meter*-গ্রন্থে প্রফেসর অর্নল্ড (Mr. Arnold) সাহেবও ছন্দগুলির বিভাগ ও অক্ষর-সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

অগ্নিপুরাণে গায়ত্রী প্রভৃতি বৈদিক ছন্দের পাদ বা বিভাগ কল্পনা করা হয়েছে সেকথা পূর্বেও বলেছি। পাদগুলির নাম বসু, আদিত্য, বিষ্ণু প্রভৃতি। ছন্দগুলির অধিষ্ঠাত্রীদেবতাও কল্পনা করা হয়েছে এবং এই কল্পনা ভারতের সনাতন আধ্যাত্মদৃষ্টির স্বাক্ষর প্রমাণ করে। মধ্যযুগের সঙ্গীতে ষড়্‌জাদি-স্বর, ভৈরবাদি-রাগ, শৃঙ্গারাদি-রস প্রভৃতিরও অধিষ্ঠাত্রীদেবতা কল্পনা করা হয়েছে, কেননা সঙ্গীত আধ্যাত্মসাধনার অন্যতম উপায়, সুতরাং তার আধার ও কল্পনা থাকা উচিত সঙ্গীত-সাধকের সাধারণ ভূমিক্ষেত্র থেকে ভূমাক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হবার জন্য। এটিই ভারতীয় শিল্পসাধনার বৈশিষ্ট্য ও আদিকথা।

॥ গান বা মাত্রা ॥

গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের অক্ষর ও তাদের সংখ্যা বর্ণনার পর অগ্নিপুরাণে গণ বা গণছন্দের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'গণ'-বলতে আসলে অক্ষরমাত্রা। গণের ব্যবহার সঙ্গীতেও আছে। আচার্য শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে মাত্রার পরিচয় দেবার সময়ে তাদের বর্ণনা করেছেন। শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

'মাত্রা কলা লঘুর্ণঃ স্যাৎ তদ্গণচ্ছন্দপচাত্তদৌ'। ··মাত্রার নাম কলা। বৈদিকমন্ত্রে বা গানে উচ্চারণভঙ্গীকে (method of intonation) 'উচ্চারণকলা' বলা হ'ত। উচ্চারণকলা রস ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবসৃষ্টির কারণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (বাগ্‌প্রকরণে) 'মাত্রা' অর্থে বার্তিকাদি-কলার ব্যবহার করা হয়েছে। আবার মাত্রা বা গণের উপাদান বর্ণ। বর্ণ—'ব্যজ্যতে ইতি-বর্ণঃ'—যা প্রকাশ করে তাই বর্ণ। মাত্রার সার্থকতা মান, অর্থাৎ যা পরিমাপ (measure) করে—'মীয়তে ইতি মাত্রা'। মাত্রা বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত-ভেদে তিন রকম। তিনটি বর্ণের সমষ্টিতে একটি 'গণ' হয়। সঙ্গীতশাস্ত্রে মাত্রৈলা, গণৈলা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার আছে এবং এ' সম্বন্ধে পরে আলোচনা করবো। এভাবে বিভিন্ন বর্ণসমষ্টি নিয়ে বিভিন্ন গণের সৃষ্টি হয়েছে। গণ আটটি : ম-গণ, য-গণ, র-গণ, স-গণ, ত-গণ, জ-গণ, ভ-গণ ও ন-গণ। 'গণ'-গুলির মধ্যে অক্ষরের গুরু ও লঘুভাবের বিকাশ আছে, অর্থাৎ কোনটি অক্ষর গুরু হয় ও কোনটি অক্ষর লঘু হয়। যেমন,

(ক) ম-গণে তিনটি গুরু-অক্ষর থাকে ;

(খ) য-গণের পূর্ব-অক্ষর লঘু ও পরের অক্ষর-দুটি গুরু ;

(গ) র-গণের প্রথমে ও শেষে গুরুবর্ণ ও মধ্যে হ্রস্ব ;

(ঘ) স-গণের প্রথম বর্ণদুটি গুরু ও শেষের বর্ণ লঘু ;

(ঙ) ত-গণের প্রথম বর্ণদুটি গুরু ও শেষের বর্ণ লঘু ;

(চ) জ-গণের মধ্য-বর্ণ গুরু ও প্রথম এবং শেষ-বর্ণ লঘু

(ছ) ভ-গণের শেষ দুটি অক্ষর লঘু ও প্রথম বর্ণ গুরু :

(জ) ন-গণে তিনটি লঘু বর্ণ থাকে।

সঙ্গীত-রত্নাকরে (চতুর্থ—প্রবন্ধাধ্যায়) গণ, মাত্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব লিখেছেন—

গণমাত্রাবর্ণদেশবিশিষ্টোক্তাশ্চতুর্বিধাঃ।
গণঃ সমূহঃ স দ্বেধা-বর্ণমাত্রাবিভেদতঃ॥
গুরুর্লঘুরিতি দ্বেধা বর্ণোঽনুস্বারসংযুতঃ।
সবিসর্গো ব্যঞ্জনান্তো দীর্ঘো যুক্তপরোগুরুঃ॥
* * *

প্রয়োগে শ্লোক গীতাদৌ-স্তত্যাদ্যোক্তানি সূরিভিঃ॥ —সঙ্গীত-রত্নাকর ৪।৫৩—৬২

টীকাকার কল্লিনাথ শ্লোকগুলির অর্থের পরিচয় দিয়েছেন, তবে সিংহভূপালের টীকা ও পরিচিতি আরও বিস্তৃত এবং পরিষ্কৃত। সিংহভূপাল টীকায় লিখেছেন : "** এলাশ্চতুর্বিধা ভবন্তি। গণৈলাঃ বর্ণৈলাঃ মাত্রৈলাঃ দেশৈলেতি।** সমূহো গণ ইত্যুচ্যতে। প্রকরণ-লঘু-গুরুমাত্রাণামিতি লভ্যতে। স-গণো দ্বিপ্রকার :—বর্ণগণো মাত্রাগণ ইতি। বর্ণোদ্বিবিধ :—লঘু-গুরুরিতি। তত্র কো লঘুঃ ? কো বা গুরুঃ ?** অনুস্বারেন সংযুতঃ, বিসর্গসংযুতঃ, ব্যঞ্জনান্তো হলন্তঃ। দীর্ঘ আকারাদিসংযুতঃ ইতি। যুক্তঃ পরো বর্ণো যস্য স যুক্তপরঃ, এতে গুরবঃ। বা পদান্ত ইতি। পদান্তে বর্তমানো, লঘুরপি বর্ণো বিকল্পেন গুরুর্ভবতি। এতল্লক্ষণহীনে। বর্ণো লঘুরিত্যুচ্যতে।** গুরুর্দ্বিমাত্র ইত্যুচ্যতে।** তত্র বর্ণগণ-মাত্রা সা চাষ্টবিধঃ—ম-গণঃ, য-গণঃ, র-গণঃ, স-গণঃ ভ-গণঃ, জ-গণঃ, ভ-গণঃ, ন-গণঃ ইতি। ** এতেষামষ্টানাং দেবতাঃ কথয়তি **। ফলমাহ-ক্রমাৎসুখারিতি। এতেঽষ্টৌ গণাঃ শ্লোক-গীতাদি-প্রয়োগাদ্যর্থস্য বর্ণনীয়স্য নায়কস্য ক্রমাল্লক্ষস্যাদীনি ফলানি জনয়ন্তি। ** অকারাদীনামষ্টানাং বর্ণানাং দেবতাদিনিবেশনেন চ ফলমাহ সোম ইতি। **।"

এরপর সঙ্গীত-রত্নাকরের-৬৩ শ্লোকে শার্ঙ্গদেব লিখেছেন—

'মাত্রা কলা লঘুর্নঃ স্যাৎ তদ্গণাচ্ছপচাস্ত দৌ।
স্যুঃ ষট্পঞ্চ-চতুস্ত্রিদ্বিসংখ্যা মাত্রাযুতাঃ ক্রমাৎ॥৬৩

যথা—sss ইতি ছ-গণঃ। ss। ইতি প-গণঃ। ss ইতি চ-গণঃ। s। ইতি ভ-গণঃ, s ইতি দ-গণঃ। ইতি পঞ্চমাত্রাগনাঃ॥'

মোটকথা ছ-গণ ছ'মাত্রা, প-গণ পাঁচ মাত্রা, চ-গণ চার মাত্রা, ভ-গণ তিন মাত্রা এবং দ-গণ দু'মাত্রাবিশিষ্ট। তারপর গণৈলা তথা, সংকীর্ণা ও বিকৃতাভেদে ত্রিবিধ। শুদ্ধগণৈলা নাগবতী, হংসাবতী, নন্দাবতী ও ভদ্রাবতী-ভেদে চতুর্বিধ।

গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের পাদ বা অংশ-সম্পর্কে অগ্নিপুরাণ পরিচয় দিয়ে বলেছে :

"অগ্নিরুবাচ—

গায়ত্র্যো বসবো জ্ঞেয়া ইত্যাদি-পাদপূরণে।
পাদো জগত্যা আদিত্যা বিরামো দশ ইরিতাঃ॥
ত্রিষ্টুভো রুদ্রঃ পাদঃ স্যাচ্ছন্দ একাদিপদব্যম্।
* * *

বৃহতী আগতত্বরো গায়ত্র্যাঃ পূর্বকো যদি।
তৃতীয়ঃ পথ্যা ভবতি দ্বিতীয়োষ্ণিহসারিন্ ॥
* * *
নিষাদো বর্ণাঃ শ্বেতশ্চ সারঙ্গশ্চ পিশঙ্গকঃ।
কৃষ্ণো নীলো লোহিতশ্চ গৌরো গায়ত্রীমুখ্যাকে ॥
* * *
ভার্গবঃ কৈশিকশ্চৈঃ বাশিষ্ঠো গোত্রমেদিতম্ ॥

—অগ্নিপুরাণ, ৩৩০।১—২০

অর্থাৎ অগ্নি বা অগ্নিদেবতা বলেন, পাদে ও আপদপূরণে গায়ত্রী আট রকম, জগতীর আদিত্যা পাদ, বিরাটের দশ, বিষ্ণুর রুদ্রপাদ, ছন্দ একাধিক পাদ ব'লে খ্যাত।** অগ্নিবেশ্য, কাশ্যপ, গৌতম, আঙ্গিরস, ভার্গব, কৌশিক, বাশিষ্ঠ ক্রমানুসারে ছন্দগুলির গোত্র।

॥ বৃত্ত ॥

"অগ্নিরুবাচ—

বৃত্তং সমমর্ধসমং বিষমঞ্চ ত্রিধা বদেৎ।
সমং তাবৎ কৃত্বাঃ কৃতমর্ধসমঞ্চ কারয়েৎ ॥
বিষমঞ্চৈব রাদূন্তং গলবিন্তং সমাস্তপি।
* * *
বর্ধমানং নৌ স্মৌ নসৌ অথো তো জোর-ঈরিতঃ।
শুদ্ধবিরাড়র্ষভাখ্যং বক্ষে চার্ধসমং ততঃ ॥

—অগ্নিপুরাণ ৩৩২।১—১০

অগ্নি বলেন, বৃত্তরাজ, অর্ধসম ও বিষম তিন প্রকার বৃত্ত। যার চারটি পদে সমান সমান অক্ষর থাকে তার নাম 'সম'। যার প্রথম ও তৃতীয় পাদে ও দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদে সমান সমান অক্ষর থাকে তার নাম অর্ধসম। যার চারটি চরণের প্রত্যেকটির মধ্যে যদি অসদৃশ অক্ষর থাকে তার নাম বিষমবৃত্ত। এ'সকল বৃত্তে য-গণ, ম-গণ, ত-গণ প্রভৃতির সন্নিবেশ থাকে, আর লঘু ও গুরু অক্ষর তো থাকেই।

এরপর অগ্নিপুরাণে সমবৃত্ত ও শিক্ষা-সম্পর্কে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষানিরূপণে অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে—

বক্ষ্যে শিক্ষান্ ত্রিষষ্টিঃ সুবর্ণা বা চতুরাধিকা।
স্বরা বিংশতিরেকশ্চ স্পর্শানাম্ পঞ্চবিংশতি ॥
* * *

অগ্নিপুরাণে শিক্ষাসম্পর্কে আছে যে, বর্ণ ত্রিষষ্টি বা চতুঃষষ্টি (৬৩ বা ৬৪ প্রকারের), স্বরবর্ণ একবিংশতি (২১টি) ও স্পর্শবর্ণ পঞ্চবিংশতি (২৫টি)। আদিবর্ণ অষ্ট বা আটটি,

সম ঢার, অনুস্বার ও বিসর্গ জিহ্বামূলীয়। স্বরবর্ণ ও স্পর্শবর্ণ=৫০টি। এই ৫০টি বর্ণ শক্তি-সম্পন্ন। বর্ণগুলির নাম 'মাতৃকা'। মাতৃকা মূলাধারে সুপ্তা কুলকুণ্ডলিনীরই ('কুল' অর্থে কালী এবং কুণ্ডলিনী—প্রসুপ্ত পরাশক্তি) বিচ্ছুরণ, সেজন্য মাতৃকা বা বর্ণ অসামান্য শক্তিসম্পন্ন। সাধক রামপ্রসাদ বলেছেন : 'কালী পঞ্চাশদ্ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে'। 'কালী' অর্থে কুণ্ডলিনী বা আদ্যাশক্তি—যে শক্তি শান্ত সমাহিত মহাকাল-শিবের বুকে অশান্ত ও নৃত্যচঞ্চলা। নৃত্যচঞ্চলা অর্থে সর্বসৃষ্টিময়ী। মাতৃকা ও দেবী কালিকা অভিন্ন। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণগুলি কি জাতীয় ও তাদের উচ্চারণভঙ্গী কি ধরণের সে'সম্বন্ধেও পরিচয় দিয়েছে অগ্নিপুরাণ। স্বরবর্ণ শক্তিময়ী ও ব্যঞ্জনবর্ণ প্রাণস্বরূপ, কেননা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণই হতে পারে না—যদি তা স্বরবর্ণের সহযোগ না পায়। ক, খ, গ···ঙ, থ, দ···প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণকালে তাদের সঙ্গে থাকে স্বরবর্ণ 'অ'। তাছাড়া সকল বর্ণসমবায়ে ও বর্ণবিন্যাসে 'অ-আ'-দি স্বরবর্ণের সমাবেশ থাকে। এজন্য স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকে শিব-শক্তির সমাবেশ বা সন্নিবেশ বলে। শক্তি ছাড়া শিব শব ও অচঞ্চল, তেমনি শিব ছাড়া শক্তি অচঞ্চলা ও স্পন্দনহীন। বর্ণ ভাষা, সাহিত্য, কাব্য ও সঙ্গীতের তাই প্রাণ। বর্ণ আবার বিভিন্ন রঙের আকারে চিত্রকে প্রাণময় ও সৌন্দর্যময় করে। বর্ণ তাই সাহিত্যাদির সহকারী সামগ্রী। বর্ণ আবার রূপাদির উদ্বোধক। সাধকগণ অধ্যাত্মসাধনায় বর্ণকে ধ্যানে রূপান্বিত ও প্রাণময় করেন। তাই বর্ণের মধ্যে বা পেছনে থাকেন স্তোত্রনাময়ী ও প্রাণময়ী দেবতা।

●

॥ শিল্পী নন্দলাল ও তাঁর অধ্যাত্মভাবনা ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

"পূর্বদিকের সবুজ বনের মাথায়, কাজলা কালো মেঘ, আমার এতো ভালো লাগছে কেন? মনকে এমন নাড়া দিচ্ছে? কারণ আর কিছুই নয়, একই সত্তার, একই চেতনার, এক প্রান্ত হল ঐ মেঘ আর অন্য প্রান্ত হল এই আমি। এক দিকে মেঘ, আর এক দিকে আমি, তাই মেঘের সুখ আমাতে অথবা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হচ্ছে। একই সত্তা বিষয় ও বিষয়ী। একই চেতনার নানান রকম দোলা জাগছে, ঢেউ জাগছে।"

ওপরের কিছু কথা অন্তর দিয়ে চিন্তা করলেই বুঝতে পারা খুব কঠিন হবে না যে শিল্পী সারা জীবন কোন্ পথের সন্ধানে ফিরেছিলেন। আমরা ভারতবাসীরা বিশ্বাস করি—জীবনের সঙ্গে পরমের যোগ আছে আর তাকে জানতে হলে যে-যেপথে কাজ করে চলেছি, সেই পথ ধরেই দেখার অতীতে পৌঁছানর নিরলস সাধনা করে চলতে হবে।

শিল্পী নন্দলালের সমগ্র সৃষ্টি জীবনের মধ্য দিয়ে এলে বুঝতে কারুর অসুবিধে হবে না, কেমন ভাবে আর কিসের প্রেরণায় এমন সব অমর সৃষ্টির স্রষ্টা হলেন তিনি। আমরা যারা তাঁর চিত্রের রেখায়, বর্ণে, ছন্দে বিষয়ে চমকিত হই, তারা ভুলে যেন না যাই যে, এর পেছনে আছে তাঁর অধ্যাত্ম অনুভূতির এক নির্মল স্রোত। এমন অধ্যাত্ম অনুসারী চেতনার মধ্য দিয়ে সমস্ত চিত্র-সমগ্রের জন্ম। নিজের সাধনার মাঝে মাঝে একথা কখনই বলতে ভুলে যাননি যে, প্রকৃতি পাঠই একমাত্র সাধনা যা থেকে ধীরে ধীরে স্রষ্টাকে জানতে পারা যায়।

সেই অনুভূতিতেই বলেছেন, "দেবদেবীর চিত্রচিত্রণে আর প্রকৃতির মাঝে ঘাসের ওপর পড়ে থাকা একবিন্দু শিশিরের কোন রসের প্রভেদ নেই।" কোন সাধনায় ব্রতী হয়ে একজন শিল্পী এমন কথা বলতে পারছেন। এই সাধনার পথ জানতে জানতে তাঁর ব্যক্তি-জীবনে এলে আরও স্পষ্ট হব।

স্রষ্টা সকল সময় রসের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সাধনাতেই মগ্ন এবং একথা আমরা সবাই জানি যে, একহতে না পারলে কোন সৃষ্টিই জীবন পায় না। এবং জীবন না পেলে সে কোন কারণেই আর একটি জীবনকে অনুরণিত করতে পারে না। সত্য শিল্প সৃষ্টি সেই যা আর একটি হৃদয়কে অনুরণিত করতে সক্ষম। নন্দলালের জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তিভূমির স্থাপনা সেই সত্যের ওপরই প্রতিষ্ঠিত।

এই সত্য-সন্ধানের উপলব্ধিতেই বলতে সক্ষম হয়েছেন—"তুমি যে আজ বৃক্ষের আরাধনা করছ, ছবি আঁকছ, যদি সত্যি একে ভালো লেগে যায়, এ তোমার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে যাচ্ছে। জীবনে কোন দিন হয়ত অশেষ দুঃখ পাবে, প্রিয়জনকে হারাতে হবে, সংসার শূন্য মনে হবে, তখন পথের ধারে এই গাছ বলবে, এই যে আমি আছি। তুমি সান্ত্বনা পাবে। এ তোমার অক্ষয় সঞ্চয়, এ জীবনের নয়, জীবনান্তরেরও।"

কত গভীর ভাবে প্রকৃতিকে দেখলে, ভালবাসলে, আপন করতে পারলে, এমন অনুভূতিতে চলা যায়, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারছি। শুধু তাই নয়, এই বলার মধ্যেই

আমরা সাধক নন্দলালকে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি একজন সাধককে, যার মধ্যে সংসারের নিত্য শোক দুঃখের মধ্যে সহজ সান্ত্বনা পাওয়ার একটি অসাধারণ অনুভূতিকে খুঁজে পেতে। এইখানেই শিল্পীর দেখার সার্থকতা ও সৃষ্টির অমরতা।

এর মধ্যেই একবার প্রশ্ন করেছিলুম—আচ্ছা আপনি যখন মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ এসবের ছবি এঁকেছেন—তখন তাদের কেমন ভাবে দেখার চেষ্টা করেছেন বা কেমনভাবে ভেবেছেন তাদের চিত্রপটে-প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য ? বল্লেন, ছবি আঁকার মূল কথাই হ'ল—যা তুমি আঁকতে যাচ্ছ তাকে ভালো করে জানো, রাতদিন দেখো, তারপর তার সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা কর। আমি মহাভারতের ছবি আঁকতে গিয়ে, ভালোভাবে পড়েছি, বোঝার চেষ্টা করেছি। তবু কোথায় একটা অভাব অনুভব করেছি। বর্ণনা মত কেবল মিলিয়ে ভাবলেই তো ছবি রূপ পাচ্ছে না। বর্ণিত চরিত্রভাবের সঙ্গে এক হচ্ছে না। এই অভাববোধ কেটে গেলো—ঠাকুরের পার্ষদ সন্তান স্বামী সারদানন্দ মহারাজের পায়ের কাছে বসে। তিনি আমায় গীতা পড়ে, মহাভারত পড়ে বুঝিয়ে দিলেন প্রতিটি চরিত্রের ভাব অতিব্যক্তির বিষয়। উনিই বল্লেন যুদ্ধের রথে শ্রীকৃষ্ণের আর অর্জুনের পরস্পর সম্বন্ধের কথা। এখানে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এক বিশেষ চরিত্র যাকে কেন্দ্র করেই সব। আমার এখানে বলার আসল কথা কি জানো ? তাহ'ল, একমাত্র আত্মদর্শী পুরুষের পক্ষেই গীতার যথাযথ ব্যাখ্যা সম্ভব। এ কেবলমাত্র পড়ে জ্ঞান নয়। এ হ'ল সাধনার মধ্য দিয়ে অনুভূত জ্ঞান। যদি আমার আঁকায় এসব বিশেষ চরিত্রসবের যথাযথভাব পরিবেশিত হয়ে থাকে তাহ'ল ঐ ঈশ্বরসন্ধী পুরুষের সান্নিধ্যে ও সাক্ষাত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে।

এই একই অন্তর নিয়ে নন্দলালের সমস্ত চিত্ররাজির সৃষ্টি। ধরা যাক, শবরীর প্রতীক্ষার কাহিনী চিত্রগুলির কথা। যুবতী থেকে বৃদ্ধা এই তিন অধ্যায়ে হয়েছে ছবিগুলি। শবরীর অপেক্ষার কি অসাধারণ ব্যাকুলতা মনে। কোন স্থিরতা নেই। তবু স্থির থাকার এই অস্থিরতাকে প্রকাশ না করার নারী চরিত্রের বিশেষ ভাবপ্রকাশটি লক্ষণীয়। কিন্তু পরবয়সে আকুল আকাঙ্খা আর ধাবমান গাছের ডালে উঠে আরও খানিক পথ দেখার বাসনাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। পরে বৃদ্ধ বয়সে পাতা সাজিয়ে ফল নিয়ে সযত্নে বসে থাকা, সেই ফল আর পত্রে সাজানর তন্ময়তার সঙ্গে বৃদ্ধার লাঠি হাতে সচকিত ঘোরাফেরা এক অভিনব সৃষ্টি। কিন্তু সমস্ত ছবিগুলির মধ্য দিয়ে শবরকন্যার সরল নিরাভরণ প্রকৃতি জীবনটি কত সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে এই অধ্যায়ের সমস্ত ছবিগুলি রামময় হয়ে উঠেছে। শবরীর আকাঙ্খা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে পরিবেশ প্রকৃতিও সঙ্গী হয়েছেন। শেষ ছবিতে যেখানে সব আকাঙ্খা সব প্রতীক্ষার পরিসমাপ্তি অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রকে পাশে বসিয়ে খাওয়ান। এতদিনের ব্যাকুলতা, শূন্যতা নিমেষে মুছে গেছে। যেন এত বছরের অবাক্ত বেদনার ক্ষণগুলির প্রয়োজন ছিল এই মুহূর্তের জন্য আর আজ তার সার্থক। শিল্পীর মন ভাব আর জীবনকেও এই ছবিগুলির মধ্য দিয়েই দেখতে পাই। এমনভাবেই বহু ছবি তিনি এঁকেছেন যা আলোচনায় বিশেষ অধ্যায় সৃষ্টি করবে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে শিবসাধক বলতেন। বলতেন—ওরা সব নন্দলালের

কাছে ধরা দেয়। শিবের ছবি এমন কেউ আঁকতে পারলে না। আমরা সবাই 'উমার তপস্যা' চিত্রসৃষ্টির অসাধারণ ঘটনার কথা জানি।

আমরা অনেকেই জানি আবার জানিনা যে শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসান্নিধ্য ছাড়াও নন্দলালের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণযুগের একটি বিশেষ আত্মিক যোগ ছিল। ভারতের এমন মহান যুগ আন্দোলনে ও জাগরণের প্রথম শিল্পীই হলেন নন্দলাল। ভবিষ্যতে চর্চা আর গবেষণার মধ্য দিয়েই আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হব। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এই পরম যোগাই তাঁর চিত্র জীবনের ধারার স্রোতকে অনেক, অনেক ছন্দোময় করে প্রাণ দিয়েছে। কোথাও নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি। এমন বিনয়ী, নিরাহঙ্কার ও বলিষ্ঠ চরিত্র গঠনের পেছনে এর প্রভাব কিছুতে মুছে ফেলা যাবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণযুগের শ্রীঠাকুর ও স্বামীজী ছাড়া সবার দর্শনলাভে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। মঠ, মিশনের সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রথম দর্শন হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে একটি ছবির মধ্য দিয়ে—শ্রীরাধা বিষয়ক ছবি দেখে বলেছিলেন—রাধার পাগলীনির ভাব হবে। তোমাদের 'ভাবের কাজ মাথা আর শরীর ঠিক রেখে সব সময় কাজ করবে। পরে গিরীশ ঘোষের বাড়ীতে দর্শনে গিয়ে শুনলেন—ছবি আঁকা বা নাটক করা কেমন যেন ?—বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া। নিজেকে ট্র্যান্সফার করা। যে খাটের ওপর বসেছিলেন তার নীচটা দেখিয়ে বল্লেন, আমার যখন বেড়াল হতে ইচ্ছে হয় তখন খাটের তলায় ঢুকে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয়। আসলে যা করতে যাচ্ছ তাই হয়ে যাওয়া। এমন ভাবেই স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ এদের সাক্ষাৎদর্শনে, কথনে ধন্য হয়েছেন শিল্পী।

এমন ভাবেই তিনি মনে, শরীরে জড়িয়ে ছিলেন এই যুগের সঙ্গে। একদিন চিঠিতে লিখলেন :—"আমরা হচ্ছি এক পরিবারভুক্ত—রামকৃষ্ণ পরিবার"। এমন সব নানান ছোট ছোট মহৎ ঘটনা আর আলোচনার ভেতরেই সাধক নন্দলালকে আর তার চিত্রসৃষ্টির মূল উৎসটিকে বুঝে নিতে অসুবিধে হবে না। কথায় কথায় বলছেন, আমাদের এই ছবি আঁকার প্রথম পুরুষ হলেন শ্রীঠাকুর কেন জানো—আমরা এটা পেয়েছি পরম্পরা হিসেবে। ভগিনী নিবেদিতা আমাকে ধীরে ধীরে বুঝিয়েছেন ভারত দিব্য-শিল্প চেতনার কথা। তিনিই চিনিয়ে দিলেন সুমহান ঐতিহ্যের অধ্যায় এবং কার ওপর অবলম্বন করে এমন সব বিরাট শিল্পকর্ম রূপ পেয়েছে। তিনি পেয়েছেন তাঁর গুরু বিবেকানন্দের কাছ থেকে আর বিবেকানন্দ যা কিছু পেয়েছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীঠাকুরের কল্যাণ স্নেহের মধ্য দিয়ে।

নন্দলাল কোনদিন পরম্পরার প্রতি বিশ্বাস হারান নি। কেননা পরম্পরার ভেতর দিয়েই আমাদের আজকের বেঁচে থাকা তবে কখনই সেই অতীতের পুনরাবৃত্তির কথা বলেন নি। নিত্য পরিবেশ সমাজ সময় সবই শিল্পীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবে আর তার ধ্যান ধারণার ওপরই সৃষ্ট হবে ছবি মূর্তি ইত্যাদি। চর্যাবেতির মন্ত্র-সাধনার সার্থকতাই এখানে।

নন্দলালের জীবনে এই একটি বিশেষ এবং অবিচ্ছেদ্য চিন্তা সবসময় প্রবহমান ছিল বলেই সাধারণ মানুষ জীবজন্তু প্রকৃতি তাঁর দৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি। এ বিষয়ে নিজেই এক জায়গায়

বলছেন—"শিল্প বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা শিল্পীর সাধনার প্রথম স্তর। যদি সে রূপবস্তুর অন্তরঙ্গ হয়ে যেতে পারে তবেই তার শিল্প বিষয়ের সঙ্গে একাত্মবোধ আসতে পারে। এরজন্যে অন্য উপায় হচ্ছে অনুধ্যান। একই বস্তুতে বিভিন্ন রসের সমাবেশ খুঁজে বের করতে হলে, যে দৃষ্টির দরকার তাতেই আনন্দের উৎপত্তি, আর এই আনন্দ থেকেই আসে একাত্মবোধ।"

শিল্পীর জীবনে আর একটি বড় দিক হ'ল প্রেম। প্রেমিক না হতে পারলে কোন বিষয়ই সহজে ধরা দেয় না স্রষ্টার হৃদয়ে। ভালবাসা আর প্রেম, এ বড় সম্বন্ধ যে কোন স্রষ্টার। স্রষ্টার হৃদয়ে প্রেম আর আনন্দের মধ্যে যে সৃষ্টি রূপ পায় তা অনায়াসে স্রষ্টার হৃদয়কে স্পর্শ করে।

"একটি প্রদীপ শিখা হতে যেমন অন্য একটি প্রদীপ শিখা প্রজ্বলিত হয়, স্রষ্টার আনন্দ ঠিক তেমন করেই স্রষ্টার হৃদয়ে সংক্রমিত হয়। এই প্রকার শিল্প-সৃষ্টি, স্রষ্টার হৃদয়ে একপ্রকার আনন্দের প্রেরণা নিয়ে আসে। সেই আনন্দ স্রষ্টার হৃদয়ে অঙ্কুরিত ও ধ্যানে বর্ধিত হয়ে শিল্প রচনায় প্রকাশ হতে চায়। এই রকম এক হৃদয় হতে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়ে সে নিজের অমরত্ব অর্জন করে। শ্রেষ্ঠ শিল্প নিদর্শনে চিরন্তন আনন্দের সন্ধান থাকে বলেই সে অমর।" "শিল্পীর সাধনমার্গ আর প্রেমিকের সাধনমার্গ একই", সত্যই প্রেমভাবে অনুভাবিত হবার জন্য শিল্পীকেও নিশ্চিন্তে ঐ মার্গে বিচরণ করতে হয়।

বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতার প্রেমে একীভূত হয়ে শিল্পী চিত্রসৃষ্টি করেছিলেন বলেই তা আজও এত জীবন্ত ও হৃদয়স্পর্শী। আমরা সব সময় ভুল করব একথা ভেবে যে, কেবলমাত্র কাব্য রচয়িতাই রসে আপ্লুত হয়ে রচনা করেছিলেন আর শিল্পী তা কেবলমাত্র চিত্ররূপ দিয়ে নিবৃত্ত ছিলেন। আসলে উভয় স্রষ্টাই একে অপরের ভাবে ভাবান্বিত হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন।

বর্তমান শিল্পচিন্তা কেমনভাবে কাজ করছে তার বক্তব্য ও আলোচনা ভিন্ন সময়ের প্রয়োজন রাখে। তবু একথা বলতে কোথাও বাধা নেই যে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষভাবে সচেতন হতে হবে। যা দেখছি আর যাতে অভিভূত হচ্ছি, তার থেকে আরও কিছু পাওয়ায় অনুপ্রাণিত হচ্ছি কিনা? শিল্পের চরম-কথাই হল জগতের বস্তুকে অবলম্বন করেই আর একটি জগতের দরজার চাবি সংগ্রহ।

আমাদের শিল্প সৃষ্টি-জীবনে যে দিব্যচিন্তার কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু কেবলমাত্র আজকের চিন্তা নয়। এ চিন্তা, এ' আত্ম-উপলব্ধির সাধনা দীর্ঘকালের। সেইদিন থেকে, যেদিন হে অমৃতের পুত্র সম্বোধনে ঋষি সেই সত্যকে জানবার গভীর আহ্বান জানিয়ে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। সময়ের ব্যবধানে কখনও উজ্জ্বল আলো মেঘের আঁচলে ঢাকা পড়লেও তা সবসময়ই প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ।

নন্দলালের জীবনে এই দিব্য চেতনার চিন্তা সব সময় স্পষ্ট ছিল বলেই তাঁর সৃষ্টির জীবন কোনদিন আটকে পড়েনি। তিনি কোন একটি বিশেষ বিষয় আর প্রকরণে সন্তুষ্ট-চিত্তে বসে থাকতে পারেননি। এই বিরাট সৃষ্টিবৈচিত্র্যে সারাক্ষণ ঘুরে ফিরেছেন এবং একই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সারাজীবন নব নব সৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন এ'প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন—

"যে নদীতে স্রোত অল্প—সে জড়ো করে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচলসীমা রচনা করে তোলে। তাদের কর্মের প্রশংসা যোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে।

আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্বদ্বারা এই সীমা-বন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না আপনার মধ্যে তাঁর এই বিদ্রোহ কতদিন দেখে আসছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টিশক্তির অন্তর্গত। সৃষ্টিকর্মে জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃত সিদ্ধ।"

আমরা দেখেছি শিল্পী—"শবরীর চিত্রসম্ভারে তার প্রতীক্ষার সঙ্গে নিজেকে এক করে দিয়েছেন তেমন ভাবেই কখনও শিব উপাসক হয়েছেন, কখন রাম বা চৈতন্যের পূজারী হয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা বেশী ভাবছি বলে মনে হলেও একজন ভারতীয় সাধকের সত্য পরিচয় এইটাই। নন্দলাল সারাজীবন নিজেকে নিষ্ঠা আর বিনয়ের বাঁধনে বেঁধে রেখেছিলেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে মিশেছেন তাঁরাই তাঁর এভাব লক্ষ্য করে থাকবেন।"

সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা-ভালবাসা ছিল অসীম। এদের মধ্যেই খুঁজে ফিরেছেন তাঁর পাওয়ার বস্তুটিকে। বলেছেন, শবরীর এই আকুল প্রতীক্ষার চঞ্চলতা, জীবন আকার, ভাব, সবই পেয়েছেন আশে-পাশে চলাফেরা মানুষের মধ্যেই। এই নিঃসঙ্কোচ মেশবার ক্ষমতা কথা আমরা যারা ভাবছি তা কিন্তু শিল্পীর জীবনে ছিল খুব স্বাভাবিক। নিজেকে কোনদিন ভারতের সামান্য কারীগর ছাড়া ভাবতেন না আর দেশের যে কোন কারিগরকে যোগ্য সম্মান দিতে কখনও ভুলে যেতেন না—। কলাভবনে এক বিশেষ প্রকরণ শিক্ষার আরম্ভে জয়পুর থেকে এক কারিগর এনে সবাইকে বলেদিলেন শিল্পী যেন কোন কারণেই বুঝতে না পারেন নন্দলালের পরিচয়। চিত্রকর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর মতই নন্দলালকে বকাবকি করতেন। শিক্ষা-শেষে সব ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে চিত্রকরকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানালেন। সেই অনুষ্ঠানেই চিত্রকর নন্দলালের পরিচয় জানতে পেরে অঝোরে কেঁদে বলেছিলেন—আমায় কেন জানতে দাওনি—আমি না জেনে এমন মহান্ হৃদয় শিল্পীকে বকেছি। এই ঘটনা উল্লেখের কারণ নন্দলালের দেশের শিল্পীদের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা হৃদয়টি পরিচয়ের জন্য।

নন্দলালের এই অসাধারণ জীবনের মূল-লক্ষ্যই ছিল সেই সত্যকে অনুভব করা। তাঁর নানান কথা ঘটনাই এই চিন্তার সত্যতার পরিচয় বহন করে। অধ্যাত্ম অনুভূতির তীব্রতার প্রকাশে নিজেই বলেছেন—"নিত্য নিয়মিত সাধনার ফলে—অবশেষে মনটি হবে পূর্ণ কলসের মত। কোন কারণে এই পূর্ণ মন কলসটির একটু নাড়াতেই অক্ষয় রসানুভূতি, রূপানুভূতিতে ছলকে পড়ে—হবে—ছবি—মূর্তি গান, কবিতা আর নৃত্য। আত্মাকে মানতে পারলেই এর পরিপূর্ণতা"।

●

॥ চারণকবি মুকুন্দদাস ॥

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

ভারতের মুক্তিসংগ্রামে একদা যেসব স্বদেশপ্রাণ কৃতী বাঙালী নিজেদেরকে উৎসর্গ ক'রে জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন, মুকুন্দদাস ছিলেন তাঁদের মধ্যে এক বিশেষ চিহ্নে-চিহ্নিত অনন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চারণকবি। সমগ্র বঙ্গভূমি একদিন সচকিত হয়ে উঠলো; নিদ্রিত বাংলার নবজীবনের সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে তিনি দেশবাসীকে হাঁক দিয়ে গেয়ে উঠলেন—

'বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও,
তোমরা এখনো ঘুমাও ?…'

রাষ্ট্রবিপ্লবের সে এক মহাসঙ্কট-মুহূর্ত। প্রথম বঙ্গভঙ্গের কাল : ১৯০৫। একদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত-প্রমুখ দেশনায়কদের ওজস্বিনী বক্তৃতা, অন্যদিকে চারণকবি মুকুন্দদাসের দীপ্ত কণ্ঠের সঙ্গীত। যাত্রার দল নিয়ে সারা বাংলায় তখন তিনি বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। সঙ্গীতের প্রতিটি শব্দে ছিল সেই বিপ্লবের জ্বলন্ত অঙ্গার। ফুলার সাহেব তখন বাংলার একজন জাঁদরেল শাসক। মুকুন্দদাসের বিরুদ্ধে গুপ্তচর লাগিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য তিনি সমন জারি করেছেন। কিন্তু দেশমাতৃকার চরণে যিনি সর্বস্ব অঞ্জলি দিয়েছেন, ইংরেজের সামান্য সমনে তাঁর ভয় কি ? ফুলার সাহেবকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি সেদিন গান ধরলেন—

'ফুলার, আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে,
মন তো স্বাধীন রয়।
হাত বাঁধিবি পা বাঁধিবি,
না হয় ধ'রে জেলে দিবি,
মনকে বাঁধিতে পারো,
এমন শক্তিময় ?…'

বাংলার বিপ্লবী যৌবন সেদিন এই গানের সুরেই উদ্বেলিত তরঙ্গের মতো সারা ভারতে বিপ্লবের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। একদা কাজি নজরুল ইসলামও এই সুরেই গান রচনা করলেন—

'এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।…'

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন ধর্মীয় ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে একদিকে সমগ্র ভারতবাসীকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন এবং অন্যদিকে সেই ভারতীয় ঐক্যসূত্রে এক মহান ঐশীশক্তির উদ্বোধন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, মুকুন্দদাসও তেমনি যাত্রার দল খুলে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে এদেশের ঘুমন্ত প্রাণকে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধু ওই মাতৃমন্ত্রই নয়, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা অনাচার ও ব্যাধির মূলেও তীব্র কুঠারাঘাত ক'রে সমাজের বুক থেকে দুর্নীতি ও অসাম্যের জঞ্জাল অপসারিত করতে ব্রতী হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যেমন গুরু, তেমনি

শিষ্য। অশ্বিনীকুমার দত্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে আজীবন তিনি গুরুর মর্যাদা রক্ষা ক'রে গিয়েছেন।

তাঁর আসল নাম ছিল যজ্ঞেশ্বর। মুকুন্দদাস তাঁর গুরুপ্রদত্ত নাম। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর থেকে মুকুন্দদাসে উত্তীর্ণ হতে যে দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনা তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছিল, তা একদিকে যেমন বিস্ময়ের, অন্যদিকে তেমনি বেদনার। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর-পরগণায় তাঁর জন্ম। কিন্তু বিক্রমপুরের মাটি তাঁকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে পারেনি। শিশুকাল থেকেই পিতার সঙ্গে তিনি বরিশাল শহরে কাটান এবং বরিশালকেই তাঁর প্রিয় সাধনভূমি রূপে গ্রহণ করেন। বরিশালের রত্নসন্তান ছিলেন তিনি। ছাত্রজীবনে মুকুন্দদাস ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু অধ্যয়ন অপেক্ষা অশ্বিনীকুমার-প্রবর্তিত নানা অনুষ্ঠানাদির দিকেই তাঁর আকর্ষণ প্রবল হ'য়ে ওঠে। ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হ'য়ে একদিন তিনি মুদীর দোকান খুলে বসলেন। স্বাধীন ব্যবসায়ী হবার মতো সুখ আর নেই। কিন্তু সেই সুখেও বিমুখ হ'য়ে মহাসুখের প্রত্যাশায় একদিন তিনি প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া বীরেশ্বর গুপ্তের সঙ্গে নৃত্য-সহযোগে মৃদঙ্গ বাজিয়ে কীর্তন ধরলেন। ইতিমধ্যে অবধূত রামানন্দ হরিবোলানন্দের সঙ্গে একদা সাক্ষাতের সুযোগ হ'লে মুকুন্দদাস তাঁর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। খালি পা, ফোঁটা-তিলক-সজ্জিত মুখে বৈষ্ণব তত্ত্বালোচনা শুরু ক'রে ঠাকুরের নামে বাতাসা ভোগ দিয়ে বন্ধুদের ডেকে ডেকে প্রসাদ খাওয়ালেন এবং তাদের কাছে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা পেশ করলেন। দেখতে দেখতে বন্ধুমহল থেকেই কয়েকজন ভক্ত জুটে গেল। কেউবা 'জগার মাথা খারাপ হয়েছে' ব'লে উপহাস ক'রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলো।

অল্পদিনের মধ্যেই মুকুন্দদাস কীর্তনীয়া-রূপে বরিশালের সর্বত্র জনপ্রিয় হ'য়ে উঠলেন। নানা দিক থেকে তাঁর ডাক আসতে লাগলো। অনেক সময় শ্মশানঘাটে গিয়ে কীর্তন গেয়ে তিনি রাত্রি কাটাতে লাগলেন। এ' সময় তাঁর 'সাধন সঙ্গীত' মুদ্রিত হ'য়ে সর্বত্র প্রচারিত হ'তে লাগলো। তাঁর বন্ধুদের মধ্যে তখন 'রামানন্দ-মুকুন্দ'-সংবাদের ছড়াছড়ি। কিন্তু কে জানতো —পরম বৈষ্ণব মুকুন্দদাস কখনো মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে মনে মনে শাক্তধর্মের সাধনায় রত হবেন। বাংলায় ১৩১২ সালে স্বদেশীর বিজয়দুন্দুভি বেজে উঠলো। দেশপ্রাণ মুকুন্দদাসের হৃদয়তন্ত্রীতে মাতৃমন্ত্র ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠলো। দেশ তো শুধু একটা জড়দেহ মাত্র নয়, সে যে পূর্ণ চৈতন্যময়ী। আদ্যাশক্তিরূপিণী মহাশক্তির মূর্তি এঁকে তাঁকে তিনি ফুল-বেলপাতায় অর্চনা করতে শুরু করলেন। মানুষের মধ্যেও যে মহাশক্তিরই পূর্ণ বিকাশ, নিজেকে তিনি তাই মাতৃসেবার পরম সেবক জ্ঞান ক'রে গান ধরলেন—

'জাগো গো জাগো গো জননী।
তুই না জাগিলে শ্যামা,
কেউ তো জাগিবে না মা,
তুই না নাচালে কারো
নাচিবে না ধমনী।...'

মায়ের নামে জীবনতরী ভাসানো ভিন্ন গতি নেই। সেই মা যে এই দেশমাতৃকা। দেশমাতা আর আদ্যাশক্তি-মহাকালীতে কোনো ভেদ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র এই মায়ের নামেই মন্ত্রোচ্চারণ ক'রে গেয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম্'।

জীবনসাধনার সঙ্গে ক্রমে পেশাদারী যাত্রাওয়ালায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেলেন মুকুন্দদাস। গানকে বৃত্তি-হিসাবে গ্রহণ না ক'রে উপায় নেই, দলকে বাঁচাতে হ'লে জীবিকার সংস্থান চাই। কিন্তু জীবিকার কাছে জীবনকে কখনো তিনি বলি দেননি। বাংলা ১৩১৩ সালের প্রথমভাগে তাঁর বিভিন্ন সঙ্গীত ও 'মাতৃপূজা' নাটক লেখা সমাপ্ত হয়। প্রধানতঃ 'ব্রজমোহন বিদ্যালয় সঙ্গীত' ও অশ্বিনীকুমারের আদর্শকেই এই নাটকে রূপায়িত করা হয়। এর অল্পদিনের মধ্যেই শারদীয়া পূজার অবকাশে কয়েকজন সঙ্গীসহ তাঁর স্বদেশী যাত্রার দল বের হ'লো। নিজের হাতে নৌকো বেয়ে, ভিক্ষা ক'রে যৎসামান্য মুদ্রায় এক এক আসরে রাত্রির পর রাত্রি পালা গেয়ে শহর থেকে শহরান্তরে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কণ্ঠে তখন তাঁর মেদিনীপ্রকম্পিত সঙ্গীত—

'সাবধান-সাবধান সাবধান।
আসিছে নামিয়া স্বর্গেরই দণ্ড,
বজ্রদীপ্ত মূর্তিমান।'

দেখতে দেখতে সারা দেশের পত্র-পত্রিকায় মুকুন্দদাসের নাম ছড়িয়ে পড়লো। কাগজের পৃষ্ঠা খুলে অশ্বিনীকুমার দত্ত সবিস্ময়ে মুকুন্দকে খবর দিয়ে বরিশালে আনলেন। ১৩১৩ সালের ২রা বৈশাখ। বরিশাল রাজবাহাদুরের হাবেলীতে তাঁর 'মাতৃপূজা' অভিনীত হ'লো। দর্শকের মঞ্চ থেকে দৌড়ে এসে মুগ্ধ ভাবাবেশে অশ্বিনীকুমার মুকুন্দকে সারা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। গুরু-শিষ্যের সে এক অভিনব মিলন। যাত্রার পালায় অশ্বিনীকুমার রচিত বহু গানও মুকুন্দদাস গাইতেন। গাইতে গাইতে ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়তেন।

ক্রমে তাঁর প্রতি বাংলা সরকারের নজর পড়লো। ইন্‌জাংশনের পর ইন্‌জাংশন জারি ক'রে পুলিশ কর্তৃপক্ষ মুকুন্দদাসকে অনবরত তাড়না করতে লাগলেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের জীবনীকার সুরেশ গুপ্ত উল্লেখ করেছেন: '...এ সময় ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ১২৫৲ পাথেয় দিয়ে মুকুন্দকে বরিশালে পাঠালেন, মুকুন্দ তবু নিরস্ত না হ'য়ে পুনরায় গান ধরলেন—

...'মুকুন্দদাস কয়, আর কারে করি ভয়,
অভয়দায়িনী দিয়েছে অভয়;
চল্লিশকোটি কণ্ঠে বলো মাই কি জয়,
বাজাও বিজয়ডঙ্কা, কাঁপুক রে মেদিনী।'

গাইতে গাইতে সাহাবাজপুরের দাদপুর-ষ্টেশনে পুলিশের হাতে ১০৮ ধারা বলে তিনি গ্রেপ্তার হন। তাঁর 'মাতৃপূজা' গ্রন্থের প্রকাশক হিসেবে তাঁর সহোদর রমেশচন্দ্রকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। দলের সকলকে নিয়েই হাজতে আটক করা হলো। মুকুন্দদাসের তিন বছরের কারাদণ্ড ও তিনশো টাকা জরিমানা হ'লো। দেশমাতার সেবার জন্যে কারাজীবনের এই

দুঃখকে তিনি হাসিমুখেই সেদিন বরণ ক'রে নিয়েছিলেন। অশ্বিনীকুমারও তখন কারারুদ্ধ। সরকারী ব্যবস্থায় সাব্যস্ত হ'লো—মুকুন্দদাসকে বাংলায় রাখা হবে না, সরাসরি তাঁকে একেবারে দিল্লী জেলে প্রেরণ করা হ'লো। কিন্তু দেহ তাঁর কারাগারে আবদ্ধ থাকলেও মন কারাগারে বন্দী রইল না। সুদীর্ঘ তিন বছর কারাবাসের পর ঘরে ফিরে এলেন মুকুন্দদাস। কিন্তু গৃহও তখন শূন্য। দেখলেন—স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ ক'রেছেন। মরু শ্মশানের মতো সারা সংসার খাঁ-খাঁ করছে। তবু তিনি দুঃখের অভিঘাতে ডুবে থাকলেন না, নতুন উদ্যমে আবার গান ও পালা রচনা ক'রে দল নিয়ে দেশের বুকে ভেসে পড়লেন। বাংলা, বিহার ও আসামের এমন অঞ্চল নেই—যেখানে না তিনি গান গেয়ে বেরিয়েছেন।

তাঁর রচিত যাত্রার পালাগুলির মধ্যে 'সংসার', 'সমাজ', 'কর্মক্ষেত্র', 'বন্ধনমোচন' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক একটি নাটক সমাজের এক একটি বিশেষ সমস্যাকে অবলম্বন ক'রে রচিত। নাটকান্তর্গত গানগুলির মধ্যেও এই সমস্যারই স্বাক্ষর পরিস্ফুট। যেমন—

'সকল কাজের মিলবে সময়,
পেটের জোগাড় কর্‌রে তোরা,
ভাতের জোগাড় কর।
মানের গোড়ায় ছাই ঢেলে দিয়ে
ক'সে লাঙ্গল ধর্‌রে তোরা,
ক'সে লাঙ্গল ধর।'

গানখানিতে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে আত্মস্থ ও ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তেমনি দেশের মনুষ্যত্ববর্জিত মেকী বিলাসী মানুষদের সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি গাইলেন—

'ভাই রে, মানুষ নাই রে দেশে,
আছে যাহা কেবল ফাঁকি কেবল মেকী
যে যার মজে আপন রসে।...'

তেমনি জাতের বড়াই নিয়ে ছুঁৎমার্গের পথে একে অপরের প্রতি যে উদাসিকতা, তার প্রতিও মুকুন্দদাস গভীর শ্লেষবর্ষণ করেছেন। গেয়েছেন—

'জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।'

গানখানি কাজী নজরুল ইসলামের রচনা। মুকুন্দদাস গানখানিকে তাঁর নাটকে সংযোজন করেছিলেন। সমাজের এমন জটিল দিক নেই—যেদিক সম্পর্কে মুকুন্দদাস দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তার আশু সমাধানের ইঙ্গিত না ক'রে গিয়েছেন। এমন কি দেশের সর্বত্যাগী চাষী-সম্প্রদায় সম্পর্কেও তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি গাইলেন—

'ধন্য দেশের চাষা।
চাষার চরণধুলি পড়লে মাথায়
প্রাণ হয়ে যায় খাসা।...'

এই জাতীয় বহু গান মুকুন্দদাসের নাটকগুলিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাঁর যাত্রার দলও ছিল বিচিত্র। পোষাকের কোন তারতম্য নেই, সকলের জন্যই গেরুয়া পরিচ্ছদ। বিরাট দেহ মুকুন্দদাস সেই গেরুয়ায় সারা দেহ সজ্জিত ক'রে মাথায় পাগড়ি বেঁধে যখন মঞ্চে এসে অবতীর্ণ হতেন, শ্রোতৃবৃন্দের মধ্য থেকে তখন যে কী বিপুল সাড়া জাগতো, তা ব'লে বোঝানো যায় না। সারা বুকে স্তরে স্তরে সঞ্চিত নানা পদক, দেশবাসীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন; সেই ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাকে তিনি চিরকাল বুকে ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব ও শাক্তের এমন মধুর মিলন ঘটেছিল—যা অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। দেশহীতব্রতেই চিরকাল তিনি জীবন উৎসর্গ ক'রে গিয়েছেন। নিষ্ক্রিয় ঘুমন্ত এই জাতিকে চারণসঙ্গীত গেয়ে শুভ-কর্মপথে উদ্দীপ্ত ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন মুকুন্দদাস। তাঁর প্রথম প্রেরণা ছিলেন অশ্বিনীকুমার।

দুঃখের বিষয়, আজ পশ্চিমবঙ্গে যাত্রাউৎসবের ব্যাপক প্রচারে সরকারী উদ্যোগ দেখা দিলেও মুকুন্দদাসের স্মৃতিরক্ষাকল্পে এখনও কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজসংস্কার-আন্দোলনে তাঁর স্বদেশীযাত্রার পালাগুলি সেদিন যে ভূমিকা নিয়েছিল, কালের ইতিহাসে তা বিস্মৃত হবার নয়। তাঁর রচিত নাটকগুলি বাংলার জাতীয় নাট্যসাহিত্যের এক একটি উজ্জ্বল মণি। সেগুলিকে অভিনয়ের দ্বারা এবং জাতীয় নাট্যশালায় সুরক্ষিত গ্রন্থমুক্তি-দ্বারা তাঁর অমর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

●

॥ গুচ্ছ ॥

শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী

(১)

নদী তার একুল-ওকুল দুকুল ভাঙে,
　　মন-মাঝি তোর বৈঠা নে-রে ;
আকাশে মেঘ উঠেছে,
　　যা হয় হবে ভাবিস্‌নেরে।
　　জলে আজ এসেছে জোয়ার,
শংকা ভুলে রাখ খুলে ঐ মায়ার শেকল
　　ফেল্‌গে ঝেড়ে।
জলের ঐ বাঁধন ভাঙার ডাক্
তোর জীবন-বীণার সাতটা তারে
　　সমঝে বেঁধে রাখ্।
যদি যায় সে তার ছিঁড়ে,
কেন ভয়, ভাবনা কি-রে ?
যদি সব যায় ভেসে যাক্
　　বাদ-বাকি সব বিলিয়ে দে রে।

(২)

কোথা যাস্ আউলিয়া মেঘ
　　ভাসিয়ে দিয়ে এই আমারে ;
আমি যে তোর লাগিয়া ঘর ছাড়িলাম
　　জনম্-জনমান্তরে।
ও তুই আপনি কেঁদে আমায় কাঁদাস্
কোন খুশী বল্ কুড়িয়ে পাস্
আর ঐ গোপন ডাকে ডাকিস্ কেবল
আমি, বলবো বল কারে ?
　　আমি কত যে ঘর বাঁধিরে মেঘ
　　তুই ভেঙে দিস্ তায়,
　　সবটুকু তার ভাসিয়ে নে-যাস্
　　অকূল দরিয়ায়।
ও তুই আপনি চলিস্ ভেসে ভেসে
জানিনে কোন্ নিরুদ্দেশে
আর, আমি যে সেই পথ দেখি না
　　শুধু খুঁজিই বারে বারে ॥

*॥ দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে ॥

(মহাবলীপুরম্)

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বেজোয়াদা। তেরশো বছর পূর্বে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর সময় যার নাম ছিল বিজয়পড়পুর। তারপরই পৌঁছে গেলুম মাদ্রাজ বেলা ২·৩৫ মিনিটে নির্দিষ্ট সময়ের ২৫মিনিট বিলম্বে। ষ্টেশন হিসাবে মাদ্রাজ কিছু চমকপ্রদ বা দর্শনীয় নয়। বরং সামুদ্রিক মাছের দুর্গন্ধ সারা ষ্টেশনে ছড়িয়ে যাত্রী-সাধারণের মনে বিরূপ-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। ষ্টেশনের বাইরে এসে উঁচু উঁচু সিঁড়ি যুক্ত বাসে উঠে ১৫ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলুম এগমোর "বিবেকাজ ট্যুরিষ্ট হোম"এ (Vivekas Tourist Home)। এখানেই আমাদের বিশ্রাম ৭৯ ঘন্টা।

পঞ্চাশ স্কোয়ার মাইল জুড়ে এই মাদ্রাজ শহর। লোক সংখ্যা ২০ লক্ষের কাছাকাছি। খ্রীষ্ট জন্মের চারশত বছর পূর্বেও এখানে বাস করতো টোডা নামে এক আদিবাসী জাতি। খ্রীষ্ট অব্দ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই চোলরা এখানে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। তখন তার নাম হয় চোলামণ্ডল। তার থেকেই ক্রমে এই উপকূলের নাম দাঁড়াল করমণ্ডল। তবে খ্রীষ্ট পূর্বাব্দেও চোলদের নামের উল্লেখ আছে সম্রাট অশোকের দ্বিতীয় শিলা-লিপিতে। শোনা যায় প্রথম শতাব্দীতে যীশুখ্রীষ্টের এক শিষ্য সেন্ট থোমা (St. Thoma) এসেছিলেন এখানে ধর্ম প্রচার করতে। ময়লাপুরে একটি ছোট গীর্জাও স্থাপন করেছিলেন তিনি। বর্তমান মাদ্রাজ বিমান ঘাটির নীচে সেন্ট থোমাস মাউন্টে (St. Thomas Mount) হত্যা করে ঐ গীর্জাতেই তাঁকে কবরস্থ করা হয়। ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা ভারতে বাণিজ্য করতে এসে ঐ গীর্জাটি দখল করে নিয়ে সংস্কার সাধন করে। তাদেরই দলের ম্যাড্রির নামে এক ব্যক্তির নামেই শহরের নাম হয় ম্যাড্রাস।

'বিবেকাজ হোম'এর নীচের তলার একখানি বড় ঘরে সাহা-দম্পতি ও ডাক্তারবাবুসহ আমাদের চারজনের জন্য সাময়িক অবস্থানের ব্যবস্থা করেছেন "কুহু ট্রাভেল্স" কর্তৃপক্ষ। সংঘ-জননী শ্রীশ্রীসারদা দেবীর আজ পুণ্য জন্মতিথি দিবস। গত আটত্রিশ বছরে একটিবার ছাড়া এই উৎসবটিতে কখনো অনুপস্থিত থাকার দুর্ভাগ্য হয়েছে বলে মনে হয় না। সত্বর হাত-মুখ ধুয়ে, পোষাক বদলে, বৈকালিক জলযোগ সেরে একখানি ট্যাক্সি ধরে অন্তরের আকর্ষণে বেরিয়ে পড়লুম চারজনেই ময়লাপুর শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আশ্রমের দিকে। ট্যাক্সি চলেছে পীচ-ঢালা পথে। নতুন শহরের নতুন পরিবেশ, দুচোখ ভরে দেখে চলেছি—ঘর-বাড়ী, দু-পাশের বড় বড় দোকান-পসার, হোটেল-রেস্তোঁরা, সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে এসে যাচ্ছে প্রেক্ষাগৃহগুলিও। পনের মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বাগান ঘেরা ময়লাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে। চত্বরের সামনেই বসেছে সঙ্গীতের আসর। গীতের সন্ধ্যা। সিঁড়ি বেয়ে উঠেই পুষ্পে পুষ্পে সজ্জিত মন্দির মধ্যে মাল্যভূষিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর প্রতিকৃতি, স্নিগ্ধ নীল বিজলী বাতির

---

*লেখকের প্রকাশিতব্য "দাক্ষিণাত্যের দেব-দেউলে" পুস্তকের অংশ বিশেষ।

আলোকে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম নিবেদন করে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই মধুর ব্যবহারে বিশুদ্ধ বাংলায় জনৈক ব্রহ্মচারী হেসে জিজ্ঞাসা করলেন "কোথা হতে আসছেন আপনারা"। উত্তরে বলতেই হল কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের পরিচয়ের সঙ্গে মহারাজের (স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ) নাম। সত্বর ব্রহ্মচারিজী চারজনকে সঙ্গে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন মাদ্রাজ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী তপস্থানন্দের সঙ্গে। তৎক্ষণাৎ মধুর আপ্যায়নে অধ্যক্ষ স্বামীজী বসতে বললেন সামনের চেয়ারেই—বিশেষ করে স্বামী অভেদানন্দজীর কৃপাপ্রাপ্ত জেনে।

আলাপ শুরু হল ইংরাজীতেই। সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লুম তাঁর আলাপচারিতায় যখন তিনি স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পাণ্ডিত্য ও সেই সঙ্গে উপলব্ধির আলোকে নিগূঢ় তত্ত্বকে প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশভঙ্গির কথা বলতে বলতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। আর বললেন এজন্যই তাঁর পুস্তকগুলির এত সমাদর মাদ্রাজ ও ইংরাজী ভাষা-ভাষী অঞ্চলে। কলকাতার বেদান্ত মঠে তাঁকে দর্শনও করে এসেছি। তারপর ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের মাদ্রাজ আগমন হতে শুরু করে উক্ত মঠের প্রতিষ্ঠা ও বর্তমান মঠের সমৃদ্ধ-রূপকারদের সম্বন্ধেও সংক্ষেপে প্রায় আধঘণ্টা অনর্গলভাবে তিনি বিবৃত করে গেলেন ইংরাজী ভাষায়। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের ইতিহাস সচেতন মানুষের কাছে এসবের অনেক কিছুই হয়তো অজ্ঞাত নয়। তবু শুনতে ভালই লাগছিল উত্তর-সত্তরের একজন প্রবীন সন্ন্যাসীর মুখ হতে অতীত স্মৃতির রোমন্থন কাহিনী। বৈষ্ণব ভক্তদের অষ্টকালীন লীলা স্মরণের মত। কথাগুলি শেষ হতেই জনৈক ব্রহ্মচারীকে নির্দেশ দিলেন উৎসবের প্রসাদ দিতে। প্রত্যাবর্তন পথে সময় মত সংবাদ দিলে মঠে আমাদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করবেন' বলেই চেয়ার ছেড়ে হাতে একটি ফ্রক নিয়ে চলে গেলেন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষটির দিকে। মুগ্ধ হয়েছিলাম সকলেই সেদিন স্বামী তপস্থানন্দের নিরহঙ্কার, অমায়িক ব্যবহারে। সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল প্রতিটি মঠ বা আশ্রমের সাধু, ব্রহ্মচারী ও অধ্যক্ষদের এটিই হল যোগ্য আচরণ। নইলে সংসার-ক্লিষ্ট, ব্যথিত চিত্ত ও দুর্গত মানুষ যাঁরা মঠে আসেন তাঁদের শান্তি ও সান্ত্বনার আশ্রয় কোথায়? ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখ্য বাণীটিও তো তাই।

স্বামী বিবেকানন্দকে তৎসনাচ্ছলে একদিন সে কথাই তো বলেছিলেন যখন তিনি (স্বামী বিবেকানন্দ) নির্বিকল্প সমাধির আনন্দে ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন। "তুই তো ভারী হীন রে! কোথায় বিশাল বটবৃক্ষের মত শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষদের আশ্রয় দান করবি না নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলি"। আর এজন্যই গড়ে উঠেছে দুটি গোলার্ধে তৃষিত, তাপিত মানুষদের জন্য এক বিশাল ছত্র-ছায়া। পাশের ঘরেই মাদ্রাজ মঠের ইংরাজী প্রকাশনা বিভাগ। নিপুণ শিল্পীর হাতে যেন সজ্জিত বিভাগটি। প্রবেশ করলেই দেখতে হবে সারি-সারি পুস্তকের মনোলোভা আলমারীগুলি। বিশেষ করে প্রকাশক রঙ্গনাথাইএর এ বিষয়ে আগ্রহের অন্ত নাই। প্রতিটি আলমারী দেখে চলেছি সকলেই। আগ্রহভরে দেখছি যেখানে স্বামীঅভেদানন্দ মহারাজের প্রায় অধিকাংশ ইংরাজী গ্রন্থগুলি সুদৃশ্যভাবে সজ্জিত। প্রায় ২০ মিনিট যাবৎ

সংক্ষেপে প্রকাশনা বিভাগটি দেখে জনৈক ব্রহ্মচারীর হাত হতে খিচুরী ও মিষ্টি প্রসাদ নিয়ে উপস্থিত হলুম সঙ্গীতের আসরে। সেখানেও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সংস্কৃতে বিরচিত শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তোত্রের ধাউলাগান শুনে বেরিয়ে পড়লুম আশ্রম পরিধি হতে সঙ্গে নিয়ে একটি মধুর স্মৃতি ও আনন্দের রেশ। সম্বল হয়ে রইল দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পাথেয়। রাত্রি ৮টার মধ্যে ফিরে এলুম "বিবেকাজ হোমে"। নৈশ ভোজনের তাগিদ দিয়ে অসিতবাবু প্রস্তুত হতে বলে গেলেন সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন কেরার পথে মাদ্রাজের দর্শনীয় যা কিছু দেখাবার ব্যবস্থা করা হবে। রাত্রি ১০-২২ মিনিটে মীটার গেজের ট্রেন ধরে রওনা হয়ে যেতে হবে চিঙ্গেলপেট। পথ মাত্র দেড় ঘন্টার। কিন্তু ভল্লি-খোলা ও ভল্লি-গোটানোর সময় তো বড় কম লাগে না। খোলা-মেলা জামা-কাপড়, গামছা, সাবান সব গুছিয়ে সুটকেসে ভরে—আর হোল্ডলের গুলি হোল্ডলে বেঁধে নৈশ ভোজন শেষ করে 'অব মেরে পার কর নেইয়া' বলে বাসের অপেক্ষায় বসে রইলুম অনেকেই 'ট্যুরিষ্ট হোম'এর মূল দরজায়।

নির্দিষ্ট সময়েই পৌঁছে গেলাম এগমোর ষ্টেশনে। সেখানে প্রথম শ্রেণীর দোতলা বিশ্রামাগারে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতেই এসে গেলেন একজন বিদেশী পর্যটক। পাশেই বসলেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলাপ হয়ে গেল দুজনেরই। নাম বললেন : এডওয়ার্ড জি. ফেমিয়েট্টি—আমেরিকার নিউরো-বাইওলজির ডক্টরেট্। বেরিয়েছেন দু'মাসের জন্য ভারতভ্রমণে। এখন ভ্রমণ করছেন দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থান। আমরাও যাব ঐ স্থানগুলি—জানালুম পর্যটকটিকে সেইসঙ্গে বললুম "দুমাসে ভারতবর্ষের তুমি কতটুকু দেখবে—অন্ততঃ দু-বছর হলে ভাল হয়"। কথা কয়টি শুনে উচ্চকিত হাস্যে সাহেব বলে উঠলেন "হ্যাঁ, তা বটে।" ইতিমধ্যে ডাক এসে গেল "মীটার গেজের গাড়ী লেগেছে প্লাটফরমে"। নিজ নিজ মালপত্রগুলি দেখে-শুনে আপন কামরায় তুলে নেবার ব্যবস্থা করতে হবে। সাহেবকে নমস্কার জানিয়ে মীটার গেজে আমাদের কামরাটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। গাড়ী ছাড়ল ১০-২২ মিনিটে। সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছে গেলুম চিঙ্গেলপেট। পথে আর নিদ্রাদেবী আকর্ষণ করেন নি। একেবারে গাড়ী থামলে চোখের পাতাদুটি বন্ধ হয়ে এল।

১৪ই ডিসেম্বর। আজ হতেই দক্ষিণ ভারত দেখার প্রথম পর্ব শুরু। তার আগে দক্ষিণ ভারতের শিল্প, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, মন্দির, গোপুর প্রভৃতির শিল্পরীতিকে জানতে হলে জানতে হবে তার পাঁচটি রাজবংশ পল্লব, চোল, পাণ্ড্য, বিজয়নগর ও নায়ক রাজাদের শিল্পপ্রীতির কথা। এঁদের রাজত্বকাল ছিল চতুর্থ শতক হতে ষোড়শ শতক পর্যন্ত। সমগ্র দক্ষিণ ভারতের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মন্দির, গোপুর, প্রাকার সবই এইসব রাজন্যবর্গের অনবদ্য দান।

বেলা ৯ টায় রওনা হয়ে গেলুম চিঙ্গেলপেট হতে ১৮ মাইল পথ মহাবলীপুরমের দিকে। বাসের স্ত্রী-পুরুষ সকল যাত্রীই উৎসুক কিছু জানতে মহাবলীপুরমের সম্বন্ধে। তাই বলতেই হল : সপ্তম শতাব্দীর পল্লব রাজগণের অক্ষয়কীর্তি মহাবলীপুরমের কথা। রাজারা অনেকেই ছিলেন যোদ্ধা। রাজত্ব করেছিলেন নবম শতাব্দীর মাঝা-মাঝি কাল পর্যন্ত। মহাবলীপুরমের প্রাচীন নাম ছিল মামাল্লাপুরম্ (City of great warriors)। অর্থাৎ মহাবলীদের পুর

তার থেকেই মহাবলীপুর। তামিলভাষায় দাঁড়াল মহাবলীপুরম। তেরোশো বৎসর কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে আজও দাঁড়িয়ে আছে এঁদের শিল্প ভাস্কর্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। পল্লবরাজ সিংহ বিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ (৬১০-৬৩০) ছিলেন একজন বড় যোদ্ধা। শুধু যোদ্ধাই নন, ছিলেন কবি, নাট্যকার ও সঙ্গীত-শিল্পী। একজন সুদক্ষ নির্মাতাও। তাঁর সময়েই গুহা-মন্দিরের খনন কাজ শুরু হয়। এই বংশের অনেকেই ছিলেন শিল্প-ভাস্কর্যের অনুরাগী। তাঁর উত্তরাধিকারী উপযুক্ত পুত্র প্রথম নরসিংহ বর্মণ (৬৩০-৬৬৮) পিতার আরব্ধ কাজ শেষ করেন এক নূতন রীতির প্রবর্তন করে যার নাম 'Monolithic Sculpture' বৃহৎ একখণ্ড শিলা হতে নির্মাণ কাজ গড়ে তোলা। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলগণ পল্লবদের শক্তি খর্ব করে সিংহাসন অধিকার করেন। এ'সব বলতে বলতে বাকিংহাম ক্যানেল পেরিয়ে বেলা ১০ টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম মহাবলীপুরমে। সে যুগের প্রধান বন্দর-নগর। এখান হতে ভারতের বাণিজ্যপোত নিয়ে যেত নানা দ্রব্যসম্ভার সিংহলে, জাভাতে, সুমাত্রাতে, নিয়ে যেত ব্রহ্মদেশে, মালয়ে সুদূর বিদেশেও—সেই সঙ্গে যেত ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সমাগত হতো এখানেও ঐসব দেশ-বিদেশের লোক পণ্য আর সংস্কৃতি নিয়েও। মুখর হয়ে উঠত মহাবলীপুরমের বেলাভূমি বিচিত্র কলকণ্ঠে। বিনিময় হতো পণ্যে, পণ্যে। বিনিময় হতো সংস্কৃতি ও সভ্যতার। মহাবলীপুরম হয়ে উঠত এক মহামিলন ক্ষেত্র—

"দিবে আর নিবে
মিলাবে মিলিবে
যাবেনা ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"

এই ভাবটিই রূপ নিয়েছিল সেদিন। আজ আর মহাবলীপুরমের সেদিন নাই—শুধু সেই অতীত গৌরব, এখন কীর্তিহীন, সমৃদ্ধিহীন, দক্ষিণ ভারতের এক সমুদ্র তীর মাত্র। কিন্তু এখানে পল্লব রাজগণ দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন—তা হল স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের এক আদিম ইতিহাস। ছড়িয়ে আছে বিস্তীর্ণ সমুদ্র বেলায়। তাই আজ মহাবলী-পুরমের বিশেষ আকর্ষণ :

(১) Monolithic Sculpture—বৃহৎ এক শিলাখণ্ডে নির্মিত পঞ্চরথ।

(২) Shore Temple—তট-মন্দির বা সৈকত মন্দির।

(৩) Cave Temple—গুহামন্দির ও মণ্ডপ।

(৪) Open Air bas relief—উন্মুক্ত পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ স্থাপত্য-ভাস্কর্য।

বাস থামল সপ্ত প্যাগোডার বা পঞ্চরথের সমতলে। দুটি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। এখন রয়েছে দ্রৌপদী, অর্জুন, ভীম, ধর্মরাজ ও সহদেব রথ। ধর্মরাজ রথই সর্ববৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট। পল্লব স্থাপত্য-ভাস্কর্যধারার এক অপূর্ব সমন্বয় এটি। দ্রৌপদী রথ আকারে ছোট কুটিরের মত। মন্দির সম্মুখে পশুরাজের মূর্তি। দুপাশে রক্ষীদ্বয় দ্বারপাল। অভ্যন্তরে চতুর্ভুজা লক্ষ্মী মূর্তি দেওয়াল গাত্রে ক্ষোদিত। দ্রৌপদী রথের দক্ষিণে অর্জুনরথ। দ্বিতল-রথ মধ্যে কোন

মূর্তি নাই। বহিদেশের দেওয়াল গাত্রে বিষ্ণু, গরুড়, শিব, নন্দী প্রভৃতির ক্ষোদিত মূর্তি। তারপর ভীমরথ দৈর্ঘ্যে ৪৮' ফুট প্রস্থে ও উচ্চতায় ২৮' ফুট। এই রথের চতুর্দিকে সিংহস্তম্ভ। ধর্মরাজ রথ দৈর্ঘ্যে ২৭' ফুট প্রস্থে ২১' ফুট উচ্চতায় ৩৫' ফুট। এই রথটি চারতল বিশিষ্ট। নীচে কোন শিল্প সম্পদ নাই। অপর তিনটি তল অপরূপ শিল্প আর মূর্তিসম্ভার দিয়ে শোভিত করেছেন মহা-অভিজ্ঞ দ্রাবিড়নৃপতি আর ভাস্করগণ। রচনা করেছেন রথের অভ্যন্তরে বহু প্রকোষ্ঠ—অপরূপ স্তম্ভের শ্রেণী দিয়ে সজ্জিত করেছেন তাদের। রূপায়িত করেছেন দ্রাবিড় ভাস্কর অসংখ্য মহামহিমময় সব দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে সেই সব প্রকোষ্ঠ। কোনটি শিবের কোনটি ব্রহ্মার, কোনটি বিষ্ণুর, কোথাও বা অর্ধনারীশ্বর আর নরসিংহের মূর্তি—কোথাও বা বরাহরূপী বিষ্ণু। এইসব মূর্তিগুলি চতুর্ভুজ। অপরূপ তাদের গঠন-সৌষ্ঠব। যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

এই রথ চারটির সামনে সহদেব রথ। কোন ভাস্কর্য নাই। রথটি সিংহাকৃতি—পশ্চাতে ক্ষোদিত গজমূর্তি। বৌদ্ধ চৈত্যের অনুকরণে নির্মিত। চৈত্যের ছাদের অনুরূপ এর ছাদটিও। এ ছাড়া একখণ্ড প্রস্তর হতে (Monolithic Sculpture) গজ, সিংহ, বৃষভ, বানর পরিবার প্রভৃতির ক্ষোদিত মূর্তি চতুষ্পার্শ্বে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত।

এগুলি দর্শন শেষে ৩।৪ মিনিটের পথ অগ্রসর হয়ে উপস্থিত হলুম তেরশো বৎসরের এক অক্ষয় স্মৃতিবাহী সৈকতমন্দির (Shore Temple) অসীম নীলাম্বুরদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তারই পাদদেশে। প্রথম গ্র্যানাইট প্রস্তর নির্মিত এই মন্দিরটির নির্মাতা ছিলেন দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মন (৬৬৮-৭০০)। প্রকৃত মন্দির আকারের কাজ শুরু হয় তার সময়েই। উত্তাল তরঙ্গ রাশি প্রতিমুহূর্তে ধৌত করে দিয়ে যাচ্ছে তার পাদদেশ। বিরামহীন চলে এই খেলা রাত্রিদিন, চলে যুগের পর যুগ, পার হয়ে গেল প্রায় দেড় শতাব্দীকাল। মন্দিরের দিকে পেছন ফিরে দেখছি অমিত বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়া সমুদ্রতাণ্ডব আর ভাবছি তেরশো বছর পূর্বের শিল্প-স্থাপত্যের এক অপূর্ব মহিমার কথা যা বিংশ শতাব্দীর পরমাণুযুগের দেশ-বিদেশের অগণিত মানুষকেও তার পাদপীঠে-আকৃষ্ট করে নিয়ে এসে বলছে :

"যন্ত্রযুগের স্পর্ধিত মানুষ ক্ষান্ত হও। স্থিরচিত্তে অবলোকন কর অতীত ভারতের শিল্প-ভাস্কর্যের এক মহিমময়রূপ।"

সৈকত-মন্দিরের সামনে ক্ষোদিত সারি সারি বৃষভমূর্তি। বারান্দায় তিনটি উচ্চ মঞ্চ। দুটি ব্যবহৃত হত দেবতার অর্ঘ্য নিবেদনের জন্য। অপরটি বাণিজ্যতরীর আগমন-নির্গমনের বার্তানির্দেশক নিশানদণ্ডরূপে (flagstaff) হতো ব্যবহৃত। ভিতর প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে একপাশ ত্রিমুখ বিশিষ্ট ক্ষোদিত দেবমূর্তি। মন্দিরের সংখ্যা দুটি।

(১) জলশায়ন ও (২) ক্ষত্রিয় সিংহেশ্বর

জলশায়ন মন্দিরে বিষ্ণুমূর্তি ও ক্ষত্রিয় সিংহেশ্বর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ষোড়শ-মুখ শিবলিঙ্গ। ওদিকে অনন্ত বারিধির তরঙ্গ-ভঙ্গের অলোকচিত্র গ্রহণ করে চলেছেন রণ্ জিৎভাই।

ফিরে এলুম সকলে পঞ্চরথের সমতলে। সেখান হতে বেশ কিছুটা চড়াই ভেঙে দ্রুত পৌঁছে গেলুম আলোকস্তম্ভের পাদদেশে (Light House) গুহা-মন্দিরের (Cave-Temple)

ভাস্কর্য মহিষমর্দিনী দেখতে। দেশে-বিদেশে যার অনুপম আলোকচিত্রের খ্যাতি। সিংহাসীনা অষ্ট-ভুজা তেজস্বিনী দেবীমূর্তি মহিষাসুরের সঙ্গে যুদ্ধরতা। হস্তে দেবতাদের প্রদত্ত বিভিন্ন অস্ত্র। হস্তধৃত ধনুহস্তে মহিষাসুরের (মহিষের মস্তকযুক্ত) বক্ষে শরনিক্ষেপে উদ্যতা। ভীত-চকিত মহিষাসুর পশ্চাদপসরণ রত—সংবৃত তার হস্তধৃত গদা। জীবন্ত ভাস্কর্য দেখে মনে হয় যেন সদ্যসমাপ্ত এর নির্মাণকার্য। গঠন-শৈলীর অপূর্ব নৈপুণ্যে এটুকু সহজেই অনুমেয় যে একটি অন্তর্নিহিত ভয়ঙ্করী শক্তি আত্মপ্রকাশ করছে অসুর নিধনের জন্য। সামনে সারি সারি স্তম্ভ। পার্শ্বস্থ দেওয়াল গাত্রে উৎকীর্ণ হর-পার্বতী, ক্রোড়ে কার্তিকেয়, পশ্চাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু। বাম প্রাচীরের ভিত্তি গাত্রে পঞ্চমুখ নাগোপরি যোগনিদ্রায় শায়িত বিষ্ণু—করজোড়ে উপস্থিত মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয়। বস্তুতঃ পল্লব যুগের স্থাপত্য-শিল্পের মূল লক্ষ্যই ছিল নির্মাণকার্য, দেব-দেবী, মানব, পশু, পক্ষি প্রভৃতি জীব জন্তুর অবয়বের রূপদান। সূক্ষ্ম চারু-শিল্প নয়। সে সব লক্ষ্য করা যাবে বিজয়নগর ও নায়ক শিল্পরীতির বিকাশে। শিল্পীরাও তাঁদের শেষ প্রতিভা ঢেলে পালন করেছেন রাজাদেশ।

উপস্থিত হলুম ১০০ ফুট দীর্ঘ, ৪৩ ফুট প্রস্থ ও ৩০ ফুট উচ্চ এক বৃহৎ শিলাখণ্ডের সামনে উন্মুক্ত প্রস্তর খণ্ডে উৎকীর্ণ শিল্প ভাস্কর্যের (Open Air Bas relief) অবিস্মরণীয় কালজয়ীরূপ 'অর্জুনের তপস্যা'—যা মূর্ত হয়ে উঠেছে পৌরাণিক কিরাতার্জুনের কাহিনী অবলম্বনে প্রস্তরের ঋজু অঙ্গে চারিপাশের অনুভূমিক ঋজু গভীর রেখায় বেষ্টিত হয়ে, তাই দেখতে। যথার্থই এটি স্থাপত্য শিল্পের অক্ষয় সম্পদ্। পারদর্শী শিল্পীরা উজাড় করে দিয়েছেন হৃদয়ের অন্তহীন ঐশ্বর্য—মিশিয়ে দিয়েছেন মনের অপরিসীম মাধুরী—তাই এত মহিমময় এই দৃশ্যটি—যা দেখে এসেছি একদিন বৌদ্ধযুগের শিল্প ভাস্কর্যে নেপালের কাঠমাণ্ডু হতে ললিতপুর আর ভক্তপুরে। শৈলগাত্রে উৎকীর্ণ দেব-দেবী, দেবদূত, গন্ধর্ব, কিন্নর, মনুষ্য, সর্প, গজযুথ, পশুরাজ, কপি, মার্জার, পক্ষি প্রভৃতির ভাস্কর্য-শিল্প যেন পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই তপস্যার ফলস্বরূপ পশুপতির পাশুপত অস্ত্র নিয়ে আবির্ভাবও তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া এই বৃহৎ শিলাখণ্ডের কেন্দ্রস্থলটি প্রাকৃতিক নিয়মেই একটি ফাঁক সৃষ্টি করে স্থাপত্য-শিল্পগুলিকে দুভাগে ভাগ করেছে। দক্ষিণে ঊর্ধ্বাংশে একজন সন্ন্যাসীসহ তপস্যারত শিবমূর্তি। নিম্নাংশে একটি ছোট শিব-মন্দির। উত্তরার্ধে স-শাবক কতকগুলি গজমূর্তি এবং একটি মৃগ পশ্চাৎপদ দ্বারা মুখকণ্ডূয়নরত। সর্বশেষ তপোমগ্ন কঙ্কালসার এক ঋষি। এইসব সজীব ভাস্কর্যরীতি দৃষ্টে এ'কথা এককালে বিস্মৃত হতে হয় যে এক বিশাল শিলাখণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

প্রকৃতপক্ষে, মহাবলীপুরমের স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও শিল্পরীতি চাক্ষুষ করে এটুকুই মনে হয় যে ভারতের শিল্পকলা যা কিছু সবই ধর্মভিত্তিক, বিশেষকরে পৌরাণিক দেব-দেব্যাশ্রয়ী। এইসব অভিজ্ঞ শিল্পীরা মহাবলীপুরে অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে গেছেন তাঁদের শিল্পকর্ম, তাতে মহান্ ও সূক্ষ্মতম রূপদান করেন নাই—রেখে গেছেন মহান্ আদর্শের এক ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। রেখে গেছেন মহাবলীপুরমের সমুদ্রসৈকতে ভবিষ্যতের এক অতুল ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা। যাকে কেন্দ্র করে পরবর্তী স্থপতিরা রূপদান করে বহু শতাব্দী ধরে গড়ে তুলেছেন মন্দিরের চূড়া দ্রৌপদী, অর্জুন

আর ধর্মরাজ রথের অনুকরণে। নির্মিত হয়েছে গোপুরম গণেশ রথের অনুকরণে চিদাম্বরমে, শ্রীরঙ্গমে, তাঞ্জোর, মাদুরা ও রামেশ্বরে। উৎসারিত হয়েছে সৌন্দর্যের প্রস্রবণ—মহাবলীপুরমের ক্ষুদ্র প্রতীকের মাধ্যমে সম্পূর্ণ রূপ লাভ করেছে দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন মন্দির আর গোপুর। সার্থক হয়েছে, সফল হয়েছে স্থপতিদের স্বপ্ন। তাই আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছে মহাবলীপুরম্ ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

"যে স্থাপত্যের ধারা সৃষ্ট হয়েছিল বৌদ্ধ স্থপতিদের দ্বারা ২৬০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে—মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে ভারহুতে, সাঁচীতে, অমরাবতীতে আর অজন্তায় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ আর সপ্তম শতাব্দীতে—অস্তমিত হয় যা অষ্টম আর নবম শতাব্দীতে—সেই ধারা জাগিয়ে রাখেন পল্লব রাজারা আর পল্লব শিল্পীরা দক্ষিণ-ভারতে"। তাই অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে প্রণাম জানিয়ে এসেছি সেই সব শিল্পী-স্থপতি ও রাজাদের উদ্দেশে।

●

॥ অষ্টভুজা ॥

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী

দেবী নয়। কিংবা মহাদেবী।
আটখানি আলোকিত অন্ধকার রাত—
রবি-শশী-তারা আঁকা সকাল বিকাল—
মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন উষা প্রদোষ প্রভাত,
ঠেলিয়া চলেছে সবারে চিরকাল।
দিনের প্রহরে লেখো দুঃখ সুখ বিষাদ
প্রমাদ—বিষাদ প্রসাদ।
রাতে আঁকো বিরাম বিশ্রাম
অহরহ লিখিতেছ মুছিতেছ
কত কর্ম কত কীর্তি নাম
ঠেলি অবিরাম।

হে অষ্টপ্রহর দেবী অষ্টভুজা মাতা।
কোথা শুরু শেষ তব কেহ জানে না তা'।
পরিচয় খুঁজে খুঁজে অভিভূত
দিশাহারা দিক—
ঝরে পড়ে শতক পথিক।
কাল-খেলাঘরে তুমি যেন কালের বালিকা।
চাহনা কাহারো পানে গেঁথে চল এক প্রাণে
প্রত্যহের কালো সাদা প্রহর-মালিকা,
সাথে রাখি প্রণিপাত,
বুঝি লভিবেন পরিছেন বিশ্বনাথ।

●

॥ শব্দের নিত্যতা-সম্বন্ধে মীমাংসক মত ॥

অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য

মানব-জীবনের সাথে শব্দের একটি সুনিবিড় যোগ বিদ্যমান। আচার-ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুই শব্দের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য এবং অপরের অভিপ্রায় বোঝার জন্য শব্দই একমাত্র অবলম্বনীয় বস্তু। এজন্য শব্দের প্রভাব মানব-জীবনে অপরিসীম।

জ্ঞানের ক্ষেত্রেও শব্দের অবদান যথেষ্ট। শব্দের সংস্পর্শ ভিন্ন সাধারণ কোন জ্ঞানই সৃষ্টি হয় না। জ্ঞান কোন একটি বিষয়কে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করে। বিষয় কখনও নাম বিহীন হয় না। মানুষ, গরু, পশু, নদী, বৃক্ষ ইত্যাদি এক একটি নামাঙ্কিত বস্তু আশ্রয় করেই জ্ঞানের উদয় হয়। বিশেষ নাম জানা না থাকলেও "ইহা একটা কিছু" এধরনের জ্ঞানই জন্মে। সুতরাং নাম বাদ দিয়ে বস্তুকে জানা সম্ভব না। বৈয়াকরণচূড়ামণি আচার্য ভর্তৃহরি বলেন,

ন সোঽস্তি প্রত্যয়ো লোকে যঃ শব্দানুগমাদৃতে।
অনুবিদ্ধমিব জ্ঞানং সর্বং শব্দেন ভাসতে॥ (বাক্যপদীয় ১ কাঃ ১২৩ বাঃ)

এর অর্থ—এমন কোনও জ্ঞান নেই যা শব্দানুগত না হয়ে প্রকাশিত হয়। তাই সমস্ত জ্ঞান শব্দানুবিদ্ধ—অর্থাৎ শব্দের সাথে অপৃথকভাবে অবস্থিত। শারদাতিলক তন্ত্রের মতেও নিত্য আনন্দময় শরীর অকারাদি ক্ষ কারান্ত পঞ্চাশটী বর্ণ সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত ক'রে রয়েছে। সমস্ত জ্ঞান এই নিত্য শব্দব্রহ্মের অভিব্যক্তিমাত্র। (ক)

শব্দের লৌকিক প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হলেও লৌকিক বিষয়গুলি শব্দ না হলেও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে জানা যেতে পারে, কিন্তু লৌকিক প্রমাণের অগোচর অলৌকিক (ধর্মাধর্ম প্রভৃতি) বিষয় কেবল শব্দের দ্বারাই জানা যায়। অতএব অলৌকিক বিষয় জানার একমাত্র উপায় শব্দ। 'শব্দ' বলতে এখানে শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রকেই বুঝতে হবে। এভাবে শব্দ লৌকিক এবং অলৌকিক সমস্ত বিষয়ের প্রধান জ্ঞাপক হ'লেও শব্দের সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে বিচারযোগ্য।

শব্দ দু'রকম—ধ্বন্যাত্মক ও বর্ণাত্মক? বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতিতে আঘাতের ফলে উদ্ভূত শব্দ ধ্বন্যাত্মক এবং কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাতে সমুৎপন্ন শব্দ বর্ণাত্মক, শব্দই মানুষের ব্যবহারযোগ্য অর্থবোধক। অতএব অর্থবোধক বর্ণাত্মক শব্দই এখানে বিচার্য বিষয়।

শব্দ অর্থকে বোঝায় বটে, কিন্তু যে কোনও শব্দই যে কোনও অর্থকে বোঝায় না। সেজন্য সমস্ত শব্দ সকল অর্থের বোধক নয়। একটি নির্দিষ্ট বিশেষ অর্থই এক একটি শব্দের প্রতিপাদ্য। 'অশ্ব' শব্দ গরুকে অথবা 'গরু'-শব্দ অশ্বকে বোঝায় না। সুতরাং মানতেই হবে যে—যে শব্দের

(ক) নিত্যানন্দময়পুর্দিব্যতনুগতৈ পঞ্চাশদর্ণৈঃ ক্রমাৎ
ব্যাপ্তং যেন চরাচরাত্মকমিদং শব্দার্থরূপং জগৎ।
শব্দব্রহ্ম বপুর্দধিরে সুকৃতিন স্তৈতত্তন্ত্রমন্ত্রাত্মকং
তত্ যোঽভ্যাসবিশং শনাতসমবং বাচাময়ীশং মহঃ।

সাথে যে অর্থের সম্বন্ধ আছে, সেই শব্দ সেই অর্থকেই বোঝাতে সক্ষম। শব্দের সাথে অর্থের এই সম্বন্ধের নাম বাচ্য-বাচকভাবে। শব্দটি বাচক এবং অর্থ শব্দের বাচ্য। ফলকথা এই যে, অর্থের সাথে যে শব্দের বাচ্য-বাচকভাব সম্বন্ধ আছে, সে শব্দ সেই অর্থকেই বোঝাতে পারে, সম্বন্ধহীন অর্থ শব্দের বাচ্য হয় না।

শব্দের এখানে প্রশ্ন এই যে, একটি বিশেষ অর্থের সাথে নির্দিষ্ট একটি শব্দের সম্বন্ধ স্থির করার মূলে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে কি-না? যদি কোনো পরিকল্পনা অনুসারে শব্দের ও অর্থের বাচ্য-বাচক ভাব সম্বন্ধ নির্ণীত হয়ে থাকে, তাহলে পরিকল্পনাকারী কে? যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা নিজের পরিজ্ঞাত বস্তু অপরকে বোঝাতে চান, তার পক্ষে শব্দের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সেক্ষেত্রে নিজের বস্তু-বিষয়ক অভিজ্ঞতা অপরকে বোঝানোর জন্য স্বেচ্ছানুসারে অথবা আকস্মিকভাবে তার কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির অভিঘাত হতে যে বর্ণাত্মক শব্দের উদ্ভব হয়, সে শব্দই উচ্চারণকারীর পরিজ্ঞাতবস্তুর বাচক নামে প্রসিদ্ধ হতে পারে। সুতরাং এরূপস্থলে উচ্চারণকারী ব্যক্তির ইচ্ছাকেই বাচ্য-বাচকভাবে সম্বন্ধের ভিত্তি বলতে হয়। কিন্তু যে শব্দ উচ্চারিত হবে, উচ্চারয়িতা সেই শব্দটী জেনে উচ্চারণ করেন, অথবা না জেনে উচ্চারণ করেন—এটা বুঝতে হবে। শব্দ-উচ্চারণের ক্রম বা পদ্ধতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, অজ্ঞাত শব্দের উচ্চারণ সম্ভব নয়। এর কারণ, এই যে—কণ্ঠ তালু প্রভৃতির অভিঘাত ব্যতীত বর্ণাত্মক শব্দের উচ্চারণ হয় না। প্রত্যেকটি বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রমেই হয়ে থাকে। 'ক' উচ্চারণের ক্রম এবং 'ম' উচ্চারণের ক্রম এক নহে, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং বক্তা যে বর্ণের উচ্চারণ করে সেই বর্ণ উচ্চারণের বিশেষ ক্রমই সে গ্রহণ করে। 'ক' উচ্চারণের অভিপ্রায় যে রকম অভিঘাত সৃষ্টি করে, 'ম' উচ্চারণের অভিপ্রায় তা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে অভিঘাত উৎপন্ন করে। অতএব শব্দ উচ্চারণের পূর্বে যদি শব্দটী উচ্চারণ কর্তার জানা না থাকে তাহলে সে বিশেষ শব্দটীর উচ্চারণের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ ক্রম গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং উচ্চারণের একটি নির্দিষ্ট বিশেষক্রম বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণের কারণ হওয়ায় শব্দটী না জানলে উচ্চারণ করাই সম্ভব হয় না। এই নিয়ম প্রত্যেকটি শব্দোচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় শব্দটী জেনেই তার উচ্চারণ সম্ভব বলে মানতে হয়। অতএব যে ব্যক্তি প্রথম একটি শব্দ উচ্চারণ করবে তার পক্ষেও উচ্চারণের পূর্বেই শব্দটি জানা প্রয়োজন। এভাবে চিন্তাকরলে দেখা যায়—কোনো শব্দ কেউ ইচ্ছা করে সৃষ্টি করতে পারে না, বরং পূর্বাবধি অবস্থিত শব্দটী জেনেই তার উচ্চারণ করে, এভাবে শব্দের উচ্চারণ শব্দজ্ঞানপূর্বক বলে সিদ্ধ হলে ফলতঃ শব্দকে অনাদি বলে স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক উচ্চারণকারীই যদি পূর্বাবস্থিত শব্দকে জেনে উচ্চারণ করে তাহলে শব্দ চিরজ্ঞনরূপেই বিদ্যমান বলে না মেনে পারা যায় না। অতএব উচ্চারণের দিক হতে চিন্তা করলে শব্দের নিত্যতা মানতেই হয়।

আশঙ্কা হতে পারে যে, শব্দ নিত্য না হলেও কোন ব্যক্তির উপদেশ অনুসারে শ্রোতা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। সে'স্থলে বক্তা ইচ্ছা ক'রে কতকগুলি বর্ণ উচ্চারণ করে। শ্রোতা তদনুসারে পরে উচ্চারণ করতে পারে। সুতরাং উচ্চারণের দিক হতে শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধ

হয় না। এ' আশঙ্কা ঠিক নয়। কারণ বক্তা অজ্ঞাত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। কোনো উপায়ে শব্দকে জেনেই তো বক্তা উচ্চারণ করে। যে শব্দ নেই, বক্তা তার উচ্চারণ করতেই পারে না। যা নেই, অর্থাৎ যা সম্পূর্ণ অসৎ—তা সৃষ্টি করা যায় না। আকাশকুসুম অত্যন্ত অসৎ, কোন সুদক্ষ শিল্পী সমগ্র নৈপুণ্য প্রয়োগ করেও তা সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং বক্তা উচ্চারণের দ্বারা একেবারেই অসৎ শব্দকে সৃষ্টি করতে পারে না, বরং যে শব্দ সূক্ষ্মরূপে বা অনভিব্যক্তভাবে বিদ্যমান, উচ্চারণের দ্বারা তারা অভিব্যক্তি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বক্তা উচ্চারণ করেই অপরকে উপদেশ দেয়, সুতরাং উপদেশের কালে শব্দটী উচ্চারণের দ্বারা অভিব্যক্ত হয় মাত্র উৎপন্ন হয় না। মীমাংসাদর্শনের শাবরভাষ্যে বলা হয়েছে—"উপদেশো হি বিশিষ্টস্য শব্দস্যোচ্চারণম্" (মীমাংসাদর্শন, শাবরভাষ্য ১ম অঃ ১ম পা ৩ সূঃ), অর্থাৎ একটি বিশিষ্ট শব্দের উচ্চারণকেই উপদেশ বলে।

এখানে জানবার বিষয় এই যে, শব্দের সাথে অর্থের সম্বন্ধ জানা না থাকলে একটি নির্দিষ্ট অর্থ বোঝাবার জন্য বিশেষভাবে একটি শব্দের ব্যবহার হয় না। সুতরাং কোনো অর্থ অপরকে বোঝাবার জন্য শব্দপ্রয়োগ কেবলমাত্র শব্দের অর্থজ্ঞান থাকলে হতে পারে। শব্দ যদি নিত্য হয়, তাহলে প্রতিপাদ্য অর্থকেও নিত্য বলতে হবে, অথচ শব্দের অর্থ যা প্রতিপাদ্য বস্তুটি প্রায়শঃই নিত্য না। অশ্ব, গো মহিষ, বৃক্ষ প্রভৃতি শব্দের অর্থ। সেই সব যে নিত্য না—ইহা তো প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং অর্থের বাচক শব্দ অর্থের সাথে সম্বন্ধরহিত হয়ে থাকতে পারে না বলে অর্থ নিত্য না হলে শব্দও নিত্য হতে পারে না। প্রতিপাদ্য অর্থ নেই, অথচ বাচক শব্দ আছে—ইহা তো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। এর উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, শব্দের বাচ্য অর্থ গবাদি শরীর নহে, কিন্তু জাতি। "আকৃতিস্তু ক্রিয়ার্থত্বাৎ" (মীমাংসা দঃ ১।৩।৩৩ সূঃ)—এই সূত্রে মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন, শব্দের অর্থ জাতি বা আকৃতি, কারণ ক্রিয়াসম্পাদনের জন্য শব্দের উল্লেখ থাকায় শব্দের বাচ্য অর্থ ব্যক্তি হ'তে পারে না। (ক) জাতিকে শব্দের বাচ্যার্থরূপে নির্দেশ করার আর একটি কারণ এই যে, জাতি বা আকৃতির সাথে

(ক) শব্দ স্বাভাবিকভাবে যে অর্থ বোঝায়, তাকেই শব্দের বাচ্য অর্থ বলে। শব্দের বাচ্যার্থ-সম্বন্ধে দার্শনিক মহলে মতভেদ আছে। নৈয়ায়িকের মতে, জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি শব্দের বাচ্যার্থ। অর্থাৎ 'গো'-শব্দের অর্থ গোত্বজাতিবিশিষ্ট গো-ব্যক্তি। মীমাংসক মতে, জাতিকেই শব্দের বাচ্যার্থ বলা হয়। এদের মতে 'গো' শব্দের অর্থ—গোত্ব-জাতি। এই জাতি নিত্য পদার্থ বলেই স্বীকৃত। কিন্তু আকৃতিই মীমাংসক মতে জাতি। নৈয়ায়িক মতে, অবয়ব সংস্থানই আকৃতি। মীমাংসক মতে, জাতিই আকৃতি। যার দ্বারা ব্যক্তি 'আকৃত' অর্থাৎ নির্ধারিত হয় তার নাম আকৃতি—"জাতিমেবাকৃতিং প্রাহু র্ব্যক্তিরাকৃতিতো যয়া" (শ্লোক বা সূত্র পাঃ) ব্যক্তিকে শব্দের বাচ্যার্থ বলা চলে না। পশুসদৃশশ্চক্র বা কমণ্ডলু অঙ্কিত করে অগ্নির পূজা করবে। শাস্ত্রে এই নির্দেশ আছে। এখানে "পশু"-শব্দের অর্থ যদি 'ছাগ' ব্যক্তি হয়, তাহলে পশু শব্দের দ্বারা সমস্ত রকম পশুর সদৃশ অথবা যে কোনোও একটি পশুর সদৃশ—এর কোন অর্থ গ্রহণ করতে হবে। সমস্তরকম পশুর সাদৃশ্য কোন একটি জায়গায় হ'তে পারে না। সুতরাং যে কোনো একটি পশুর সাদৃশ্যই নিতে হবে। যে পশুটীর সাদৃশ্য নিয়ে মণ্ডল করা হ'ল, সে পশুটি বিনষ্ট হ'লে আর কোনোরকমেই কিন্তু পশুসদৃশ মণ্ডল করা যাবে না, কারণ পশু শব্দের বাচ্যার্থ পশু ব্যক্তি হ'লে সেই গৃহীত পশুটিই পশু শব্দের বাচ্যার্থরূপে নির্দিষ্ট হওয়ায় অন্য পশুর সাদৃশ্য আর গ্রহণ করা চলবে না। কিন্তু যদি জাতিকেই শব্দের বাচ্যার্থ বলা হয় তা'হলে আর এই দোষ হবে না।

বস্তুর অত্যন্ত ভেদ নেই। জাতির উল্লেখ করে দ্রব্যের নির্দেশ করলে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। 'জল আনো' বল্‌লে জলত্ব-জাতি জলের নির্দেশক-রূপে উল্লিখিত হওয়ায় 'কোন্ জল আন্‌বো' এ'রকম প্রশ্নের অবকাশই থাকে না—"অর্থত্বাৎ প্রয়োগস্তারিভাগঃ" মীমাংসা দঃ ১।৩।৩৪ পৃঃ)। সুতরাং বিভিন্ন দিক বিভিন্ন দিক বিচার করে মীমাংসাদর্শন জাতিকেই শব্দের বাচ্যার্থ বলে। জাতি নিত্য, অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশরহিত। অতএব শব্দের বাচ্যার্থ জাতি নিত্য হওয়ায় অর্থের সাথে শব্দের সম্বন্ধ ও নিত্য হবে, শব্দের নিত্যতার বিপক্ষে যা' বলা হয়েছিল, তা ঠিক না। এই যুক্তির ভিত্তিতেই মীমাংসাদর্শনের সূত্রকার শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক বা নিত্য বলে মেনেছেন। মহর্ষি জৈমিনির এ'বিষয়ের সূত্রটি হচ্ছে : "উৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ, তস্যজ্ঞানমুপদেশঃ, অব্যতিরেকশ্চ অর্থে অনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" (মীমাং দঃ ১।১।৫ পৃঃ) মহর্ষি প্রধানতঃ বৈদিক পদের সাথে সেই সেই পদবাচ্য অর্থের নিত্যসম্বন্ধ-প্রতিপাদনের জন্যই সূত্রটি বলেছেন। কিন্তু এর ফলে শব্দের সাথে বাচ্য অর্থের নিত্যসম্বন্ধও বলা হয়েছে। শব্দ এবং অর্থ—এই উভয়ই নিত্য না হলে এদের সম্বন্ধ নিত্য হতে পারে না। সুতরাং শব্দ ও অর্থের নিত্যতা স্বীকার করেই শব্দার্থের সম্বন্ধকে নিত্য বলা হয়েছে। সূত্রটির সহজ অর্থ এই যে, শব্দের সাথে বাচ্য-অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক, অর্থাৎ অপৌরুষেয়। সুতরাং বেদোক্ত অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শব্দের ও এ'সমস্ত শব্দের প্রতিপাদ্য অগ্নিহোত্র নামক যাগাদিরূপ অর্থের সাথে অপৌরুষেয় স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। এজন্যই বৈদিক বিধিবাক্য অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ধর্মের জ্ঞাপক প্রমাণরূপে নির্দিষ্ট। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগরূপ ধর্ম অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা জানার সম্ভাবনা না থাকলেও এই শব্দ অগ্নিহোত্র নামক অর্থের সাথে নিত্য সম্বন্ধ বলেই এর সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। মোটকথা শব্দের সাথে বাচ্য অর্থের সম্বন্ধ কোনও ব্যক্তিসাপেক্ষ না হওয়ায় উহা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক বলেই অপৌরুষেয় এবং বেদবাক্য স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। অতএব লৌকিক অনুভবের অতীত স্বর্গ, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বেদবাক্য অভ্রান্ত প্রমাণ; এই প্রমাণ যে পুরুষান্তরসাপেক্ষ নহে—এ'বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ইহা আচার্য রামনারায়ণেরও সম্মত।

মহর্ষি জৈমিনির এই সিদ্ধান্ত বেদভিত্তিক হ'লেও সাধারণভাবে সমস্ত শব্দের বাচ্য অর্থের সাথে নিত্য সম্বন্ধই আচার্য জৈমিনির অভিপ্রেত। 'গো'-শব্দ গোত্ব-জাতির বাচক, কারণ প্রত্যেকটি গরু ভিন্ন হলেও সমস্ত গরুর মধ্যে এমন একটি সামান্যভাব বা সাধারণতা আছে—যার জন্য গরুকে ঘোড়া প্রভৃতি অন্য প্রাণী অপেক্ষা ভিন্ন বলে বোঝা যায়। সমস্ত গরুতে সমানভাবে অবস্থিত এই ধর্মই গোত্ব-জাতি এবং ইহাই গো-শব্দের অর্থ। ইতরব্যাবর্ত্তক এই গোত্ব-জাতি—এমনভাবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে কু-তর্কজালে তাকে অস্বীকার করা অনুভববিরুদ্ধ হবে। সুতরাং সর্বানুভব সিদ্ধ বস্তুর অপলাপ করা সম্ভব না বলেই গো-শব্দের অর্থ যে গোত্ব-জাতি—তা মানতেই হবে।

এখানে আপত্তি হতে পারে যে, শব্দের সাথে বাচ্য-অর্থের সম্বন্ধকে তো বাচ্য-বাচকভাব-সম্বন্ধই বলা হয়। এই বাচ্য-বাচক-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনও শব্দ ব্যবহার করতে পারে না।

কিন্তু এই সম্বন্ধ যদি নিত্যরূপে স্বীকৃত হয়, তা হলে যে-কোনো শব্দ শুনলেই তো শ্রোতা তার অর্থ জানতে পারবে। কারণ অর্থের সাথে নিত্য সম্বন্ধযুক্ত শব্দ ও নিত্য হওয়ায় শব্দ শুনলেই তার অর্থবোধ হতে বাধ্য। অথচ তা হয় না। যে শব্দের অর্থ পূর্বে জানা নেই, এমন কোনো নূতন শব্দ শুনলেই আমাদের অর্থবোধ হয় না। এ'তে প্রমাণিত হয় যে, শব্দের সাথে অর্থের সম্বন্ধ নিত্য নহে, কিন্তু কল্পিত, কেননা নূতন শব্দ শোনার পর কা'রো উপদেশ বা অভিধান থেকেই আমাদের অর্থবোধ হয়। অভিধানপ্রণেতাও অন্যের কাছ থেকে জেনেই তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে। সুতরাং পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায় যে, শব্দার্থের সম্বন্ধ পুরুষকল্পিত। আরও কথা এই যে, শব্দ ও অর্থ—এ'দুটি অত্যন্ত ভিন্ন বস্তু। পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন দু'টি বস্তুর সম্বন্ধ কখনও স্বাভাবিক হতেই পারে না; অর্থাৎ কোনো প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই কেহ দু'টি ভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধ ঘটিয়ে দেয়।

শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধের বিরুদ্ধে আর একটি বক্তব্য এই যে, যে দুটি বস্তুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে, তাদের সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ একদেশবর্তিতাই থাকে। দীপ ও দীপের আলো প্রভৃতি এ'র দৃষ্টান্ত। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সামানাধিকরণ্যই নেই। আমরা যে শব্দ শুনি, তা উচ্চারণকারীর মুখে থাকে, তার অর্থ অন্যস্থানেই থাকে। 'ঘট' এই শব্দ যে উচ্চারণ করে, শব্দটি তার মুখেই থাকে, কিন্তু 'ঘট'-বস্তুটি অন্যত্র থাকে। সুতরাং শব্দের সাথে বাচ্য অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ যুক্তিবিরুদ্ধ।

এ'র উত্তরে মীমাংসক দার্শনিক বলেন, শব্দার্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক না হলে এই সম্বন্ধ কল্পনাকারী যে-কোনো একজন পুরুষ থাকবে। কিন্তু এমন কোনো পুরুষ নেই যা'কে শব্দার্থের সম্বন্ধ-কল্পনাকারী বলা যায়। যে-কোনো শব্দের সাথে একটি অর্থের সম্বন্ধ কল্পনা করা তার পক্ষেই সম্ভব, যে শব্দ ও অর্থকে জানে। যে শব্দ বা অর্থ জানা নেই, সেই শব্দের সম্বন্ধ কল্পনা করার সম্ভাবনাই হয় না। এখন দেখতে হবে এমন কে আছে-বা থাকতে পারে,—যে প্রত্যেকটি শব্দ এবং অর্থকে জেনে তার সম্বন্ধ কল্পনা করতে সক্ষম। প্রত্যক্ষপ্রমাণ বা অন্য কোনো প্রমাণের সাহায্যে এমন পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না। বর্তমানে এমন কেউ না থাকলেও সুদূর অতীতে নিশ্চয়ই ছিল—এমন সিদ্ধান্তের অনুকূলেও যুক্তি নেই, কারণ বর্তমানে যা'রা নেই, তাদের নাম স্মরণ করে বা তাদের কৃতকর্মের দ্বারাই অতীত মানুষকে জানা যায়। কিন্তু বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধ-কল্পনাকারী হিসেবে কারো নাম কেউ কোনোদিন স্মরণ করে না। এখন স্মরণ না করলেও সুদূর অতীতে তাদের নাম প্রসিদ্ধ ছিল, বহুকাল অতীত হওয়ায় এখন আর সে সমস্ত নাম কেউ জানে না—এমন কথাও বলা যায় না। কারণ কালের প্রভাবেই কোনো নামের অবলুপ্তি ঘটে না। সাধারণ নামের বিলুপ্তি কালপ্রভাবে হ'তে পারে বটে, কিন্তু স্বকৃতকর্মের দ্বারা যা'রা বরেণ্য ও স্মরণীয় হ'য়ে থাকেন, কালজয়ী সে সব মহাপুরুষের নাম কাল কখনও চিরতরে মুছে ফেলতে পারে না। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, কপিল প্রভৃতির নাম বহুকালের ব্যবধানেও বিলুপ্ত হয়নি। (ক)

(ক) বিনষ্ট বস্তু যদি হ'লে তার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কেবল 'নাম'-টী থাকে যুক্তিপ্রদর্শক শ্রুতিতে এ'র সমর্থন মেলে—"যত্রান্যৎ পুরুষো নিয়তে কিং মেদং ন জহাত্যেতি, নামেতি, অনন্তং বৈ নাম" (বৃঃ উপঃ ৩.২।১৩)। আর্তভাগ নামক ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করলেন যে, পুরুষ মরে গেলে কে তাকে পরিত্যাগ করে না ? এর উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, নাম তাকে ত্যাগ করে না, কারণ নাম অনন্ত অর্থাৎ অবিনাশী।

যদি কোনো দেশ বা বংশ দৈবদুর্ঘটনাদির ফলে পৃথিবীর বুক হ'তে চিরতরে বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়, তাহলে সেই দেশবাসীর বা সেই বংশীয়দের নাম চিরতরে বিলুপ্ত হ'তে পারে। এজন্যই দৈববিপর্যয়ে অবলুপ্ত, অথচ অধুনা আবিষ্কৃত দেশবিশেষে কূপ-তড়াগাদির কর্তার নাম জানা যায় না। কিন্তু শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধের ব্যাপারে এমন কল্পনারও অবকাশ নেই। কারণ বৈদিক শব্দরাশি অবিচ্ছিন্নভাবেই গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমে প্রচলিত রয়েছে। যতই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংঘটিত হোক্ না কেন, বেদের পারম্পর্য্য অক্ষুন্নভাবেই বিদ্যমান। বহু উত্থান-পতনের মধ্যেও সুপ্রাচীনকাল থেকে অসংখ্য মনীষিবৃন্দ বৈদিকপরম্পরা অনুসরণ ক'রে ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। সুতরাং বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধনির্ধারণকারী কোনো কর্তা থাকলে সঙ্গত কারণেই তার নামও সকলের স্মৃতিপটে জাগ্রত থাকত। কিন্তু তা নেই। অতএব সম্বন্ধনির্ণেতার নাম স্মরণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এ'পর্যন্ত কেউ কোথাও বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধ কর্তার নাম না জানায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধ পুরুষের উদ্ভাবিত নহে, কিন্তু স্বাভাবিক বা চিরন্তন।

এখানে আপত্তি উঠ্‌তে পারে, নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্র, ঘট প্রভৃতি নানা জিনিষ কোনও একজনের দ্বারা অবশ্যই নির্মিত হওয়া-সত্ত্বেও নির্মাণকর্তার নাম না জেনেও স্বচ্ছন্দে তা ব্যবহৃত হয়। এ'ধরনের ব্যবহারিক-পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ থাকা-সত্ত্বেও ঐ সমস্ত নির্মাণকারীর নাম স্মরণ না হওয়ায় ব্যবহৃত বস্তুগুলিকে অপৌরুষের বা চিরন্তন বলা যায় না। ঠিক তেমনি বৈদিক পদ-পদার্থের ব্যবহারধারা অক্ষুণ্ণ থাকলেও পদ-পদার্থের সম্বন্ধ কল্পনাকারীর নামবিস্মৃতি সম্ভব। সুতরাং নামের অস্মরণই নিত্য বা অপৌরুষের হিসেবে পদ-পদার্থের সম্বন্ধ সিদ্ধ করবে না।

বিশেষতঃ 'এই শব্দের এটাই অর্থ'—এরূপ জান্‌লেই শব্দ শুনে অর্থবোধ হ'তে পারে। এই অর্থপরিজ্ঞান কারু পক্ষেই স্বাভাবিক না, অন্যের কাছ থেকে জেনেই সাধারণতঃ এ'রকম অর্থবোধ হয়। সুতরাং শব্দ-জন্য অর্থবোধ পুরুষ-উপদেশ হ'তেই জন্মে বলে বৈদিক পদ-পদার্থের অর্থবোধও পুরুষ-উপদেশ-জন্যই হবে। সেই উপদেষ্টা পুরুষ নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুটি অপরকে বোঝাবার জন্য স্বেচ্ছায় স্বতন্ত্রভাবেই একটি শব্দের উচ্চারণ করেন। অতএব পদ-পদার্থের সম্বন্ধ পুরুষের ইচ্ছাসম্পাদ্য হওয়ায় বৈদিক পদ-পদার্থের সম্বন্ধও পুরুষকৃত হবে।

এ'র উত্তরে মীমাংসকগণ বলেন, পদ-পদার্থের সম্বন্ধ-কল্পনাকারী কেউ না থাকলেও অর্থবোধের বাধা হয় না। কারণ পদ বা পদার্থ যদি সম্বন্ধ-কল্পনাকারীর পরিজ্ঞাত না যায় তা হ'লে সে কেমন ক'রে এ'দুটির সম্বন্ধ কল্পনা করবে? আর পদ ও পদার্থকে জানার অর্থই হচ্ছে —'এ' পদের এ' অর্থ' এরকম জ্ঞান। সুতরাং এরকম জ্ঞান থাকার অর্থই পদ-পদার্থের সম্বন্ধজ্ঞান। গুরু-শিষ্য-পরম্পরাক্রমেই হোক, বা লিপিবদ্ধ গ্রন্থাদি পাঠ করেই হোক—পূর্বাবধি প্রচলিত পদ-পদার্থের সম্বন্ধ জানা যায় মাত্র, কিন্তু কেউ ইচ্ছা করে নূতন একটি শব্দের জন্ম দিয়ে তার একটি নূতন অর্থ কল্পনা করতেই পারে না।

শব্দের অর্থজ্ঞান উপদেশ-ব্যতীতও হ'তে পারে। কোনো একটি শব্দের অর্থ জানা না থাকলে স্থলবিশেষে অর্থবোধ অন্যভাবে হ'তে পারে। যেমন শব্দের উচ্চারণ করে যেখানে

দু'জন লোকের মধ্যে বস্তুর আদান-প্রদান চলে, সেখানে উচ্চারিত শব্দের অর্থবোধশূন্য কোন ব্যক্তি শব্দমূলক ঐরূপ বস্তুর ব্যবহার দেখে অনায়াসেই বস্তুবাচক শব্দকে ঠিক করে নিতে পারে। একজন লোক কাঁঠাল শব্দের অর্থ জানে না। কিন্তু তার সামনে অন্য কেউ যদি অপরকে বলে —'আমাকে কাঁঠাল দেও', তাহ'লে কাঁঠালটি এনে দেওয়ার সময় কাঁঠাল-শব্দের অর্থে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বস্তুটিকে দেখে কাঁঠাল-শব্দের অর্থ বুঝতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শিশুকাল হ'তে নানা শব্দের অর্থবোধ প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা থেকেই জন্মে। যে কোনো দিন 'সিংহ' দেখেনি, তার পক্ষে সিংহ শব্দের অর্থ অপরোক্ষ না হওয়ায় সিংহের আকৃতির বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং ব্যবহারিক প্রত্যক্ষমূলক অর্থবোধই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তু-সম্বন্ধেই এই নিয়ম। যা প্রত্যক্ষের যোগ্যই না, সে রকম অর্থের বোধক শব্দ অনুমানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অর্থের বাচক হতে পারে। অবশ্য বৈদিক শব্দ-সম্বন্ধে এ'কথা খাটে না। যা অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না, বৈদিক শব্দ সে রকম অর্থেরই বাচক। অতএব বৈদিক শব্দ নিত্য বলেই নিত্য অর্থের সাথে তার স্বাভাবিক সম্বন্ধ রয়েছে।

ঘট প্রভৃতি বস্তু সাবয়ব বলেই তাদের একজন কর্তা থাকেই, কারণ যে কোনো সাবয়ব বস্তুই একজন কর্তার দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং সাবয়ব বস্তুর কর্তার নাম স্মরণ না থাকাতেই তাকে অপৌরুষেয় বলা চলে না। অর্থাৎ অন্য প্রমাণের দ্বারা "বস্তুটি কর্তা-কর্তৃক নির্মিত"—এটা নির্ধারিত হ'লে কেবল নির্মাণকারীর নামের অস্মরণ থাকলেই বস্তুটি অপৌরুষেয় হয় না। কিন্তু শব্দের ক্ষেত্রে এমন কোনও প্রমাণ নেই—যা শব্দের কর্তৃ-নিষ্পাদ্যত্ব প্রতিপাদন করতে পারে। শব্দ নিরবয়ব বলেই এর উৎপাদক কর্তা থাকতে পারে না।

বৈদিক শব্দ-সম্বন্ধে একথাও বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, যা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জানার সম্ভাবনা নেই, এমন বিষয়ের প্রতিপাদক বাক্যই বেদ নামে প্রসিদ্ধ। বেদের ভাষ্য ভূমিকায় সায়নাচার্য বলেছেন—

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিদন্তি বেদেন তস্মাৎ বেদস্য বেদতা ॥ (সায়নভাষ্যভূমিকা)

অর্থাৎ যে উপায়ের (স্বর্গ-নরকাদির) সাথে যাগাদির সাধ্য-সাধনভাবসম্বন্ধ প্রত্যক্ষ, অনুমান বা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জানার সম্ভাবনাই নেই, কেবল বেদের দ্বারাই মানবগণ তা জানতে পারে, আর এজন্যই বেদের বেদত্ব বা স্বতসিদ্ধ প্রামাণ্য সিদ্ধ হয়।

শব্দের অনিত্যতাবাদী নৈয়ায়িকগণ মীমাংসক দার্শনিকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ করেন এবং মীমাংসক ও তারা যুক্তি দিয়ে নৈয়ায়িকের মত খণ্ডন করেছেন। অবশ্য অন্য প্রবন্ধে এ'র আলোচনা করা যেতে পারে।

●

॥ কর্মরহস্য ও তার গতি ॥

শ্রীমতী অরুণা দত্ত

সাধারণভাবে আমরা জানি—"ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্", অর্থাৎ ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব যে আত্মা-তা আমাদের হৃদয়-রূপ গহ্বরে নিহিত। কর্মের তত্ত্ব ও রহস্য গহন ও গভীর। তাই আমরা ঠিকমত কর্ম না ক'রে তার ফলে আসক্ত হই ও কর্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করতে পারি না, সেজন্য কর্মজালে আবদ্ধ হই।

যে প্রচেষ্টাই আমরা করি না কেন—তাই আমাদের কর্ম। তবে কর্মের প্রকারভেদ আছে। শরীর-চালনা যেমন কর্ম, মস্তিষ্ক চালনাও তেমনি কর্ম। চলমান জগতে কর্মেরগতি তাই দুর্বার ও রহস্যময় তবে আমরা তার শুধু দর্শকমাত্র নই। আমাদের চারদিকে যা ঘটছে তার প্রভাব প্রবাহাকারে অবিরত আমাদের মনকে আঘাত করছে। এই আঘাত আমাদের মনে যে সংস্কার সৃষ্টি করছে সেই সংস্কারই আবার সৃষ্টি করছে আর এক সংস্কার-রূপ চরিত্রকে ও ব্যক্তিত্বকে। অন্যদিকে ঐ চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই আমাদের কর্মে প্রেরণা সৃষ্টি করছে। ঐ প্রেরণাই আসলে কর্মের উৎস বা কারণ। সেজন্য স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের কর্ম যেন আমাদের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি। চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব এবং কর্মের এই আদান-প্রদান ও ঘাত-প্রতিঘাতকে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন কার্য-কারণের নিয়মশৃঙ্খল, আর কারণ থেকে কার্যের পরিণতিকে বলে কর্মফল।

কর্ম কখনো কারণের বিপরীতধর্মী হতে পারে না, সুতরাং যেমন কর্ম তার তেমনি ফল পেতে হবে। এই সাধারণ কথাটির মধ্যেও রয়েছে একটি গভীর রহস্য। যিনি সদাত্মা তিনিই সদাচারী। অসদাচারীর চরিত্র তার আচরণে ও ফলে প্রতিফলিত হয়। সুখ, শান্তি, দুঃখ, শোক তাই আমাদের কর্মফল, সুতরাং তারজন্য ভাগ্যবিধাতা ঈশ্বর দায়ী—এ' ধারণা ভুল। এতে কার্য ও কারণ-শৃঙ্খলের অমোঘ-নীতিকে প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করা হয়, কেননা কারণই কর্মের নিয়ামক। আসলে মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। সৎচিন্তা-দ্বারা আমাদের চরিত্রের তাই সংস্কারসাধন সম্ভব। কর্মের প্রচণ্ড শক্তির যিনি পরিচয় পেয়েছেন, তিনি অমৃতের সন্ধানও পেয়েছেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ ;
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥' (৩।৫)

ক্ষণকালের জন্যও কেহ কর্মবিরতি পালন করতে পারে না, প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হয়ে সকলকে কর্ম করতে হয়। তাই জীবনে কর্মরহিত অবস্থা অসম্ভব ও অকল্পনীয়। এমনকি ত্রিলোকের প্রভু স্বয়ং ভগবানও সর্বদা কর্মানুষ্ঠানে ব্যস্ত। আমাদের কর্মে প্রবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে ও সৎপথে স্থাপনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। গীতার শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন—'কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করা শ্রেয়'। স্বয়ং ভগবান কর্মে ব্রতী হয়ে অবতার-রূপে এ'রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছেন সাধারণে ভাবতে পারেন যে, যদি সর্বদা কাজের মধ্যে ডুবে থাকি তবে মন কর্মের দাস হয়ে পড়তে পারে। কেননা কর্মব্যস্ত জীবনে গভীর চিন্তার অবকাশ কোথায়? তাছাড়া

একথা যে, মননশীলতা ও কর্মের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। কিন্তু এই ধারণা আমার ঠিক নয়। এ'প্রসঙ্গে ছান্দোগ্য-উপনিষদে শ্বেতকেতু ও রাজা প্রবাহণ-জৈবলির উপাখ্যান স্মরণ করা যেতে পারে। শ্বেতপুত্র বেদান্তদর্শনের যে তত্ত্ব পিতার কাছ থেকে লাভ করেননি, রাজা তাঁকে সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন। অনেক গভীর তত্ত্বও তাই কর্মে ব্যস্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা উপলব্ধি করতে পারেন। অতএব কাজ আমাদের করে যেতেই হবে সর্বশক্তি দিয়ে। তবে সমস্যা দেখা দেয় যখন মনে প্রশ্ন জাগে—"কিং কর্তব্যং" ? এই প্রশ্ন মূলত তিনটি।

প্রথম প্রশ্ন—অপ্রতিকার এবং প্রতিকারের মধ্যে কোন্ আদর্শ গ্রহণীয়? মহাপুরুষরা বলেন, অপ্রতিকার বলতে অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা এবং এটি জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ, কেননা অন্যায়ে অস্থির না হলে অন্যায়ের প্রতিকার করা যায় না। গীতায় এই প্রশ্নের উত্তর মেলে। প্রতিকারের ক্ষমতা অর্জন করার পর যদি অপ্রতিকারের আদর্শে আমরা স্থির থাকি তবেই প্রতিকারের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। কিন্তু দুর্বল যদি অপ্রতিকারের দোহাই দিয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ না করে, তবে সে মিথ্যাচারী নামে অভিহিত হয়। প্রতিকারের আদর্শে যোগ্য হবার পূর্বে তাই আমাদের কর্তব্য সর্বপ্রকারে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—কর্তব্যের ধারণা যদি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে ভিন্ন হয় তবে জীবনে কর্তব্য আমরা কিভাবে স্থির করবো? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ (২।৩১)

গীতার এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর মেলে। শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন—ধর্মযুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়তর সাধনা ক্ষত্রিয়ের নেই। এই উপদেশের অর্থ হোল—যে সমাজে আমরা জন্ম নিয়েছি সেই সমাজের আদর্শ সামনে রেখে আমাদের জীবনের কর্তব্য স্থির করতে হবে, আর প্রত্যেককে নিজ নিজ আদর্শে স্থির থাকতে হবে। এ'সম্বন্ধে একটি কাহিনীর সাহায্যে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তব্যের মাহাত্ম্য বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এক যুবক সন্ন্যাসী কঠোর তপস্যা ক'রে বেশ-কিছু শক্তি সঞ্চয় করেছিল। একদিন সে তপস্যায় বসেছে, এমন সময়ে একটি কাক ও একটি বক তার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটালো। ক্রোধভরে সন্ন্যাসী তাদের দিকে তাকালো, আর পাখী-দুটি তৎক্ষণাৎ ভস্ম হয়ে গেল। নিজের ক্ষমতার প্রকাশ দেখে সন্ন্যাসী খুবই গর্ব অনুভব করলো। কিছুদিন পরে ভিক্ষা করতে গিয়ে সে এক মহিলার দ্বারে উপস্থিত হলে গৃহকর্ত্রী তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন। সন্ন্যাসী ভাবলো—"কি আমাকে এতো অবহেলা? এতো সাহস?" ভিতর থেকে গৃহকর্ত্রী বললেন—'এতো গর্ব কোরনা, এখানে কাক-বক নেই।' সন্ন্যাসী খুবই অবাক হলো তাঁর কথা শুনে এবং ভাবলো মনের কথা কি ক'রে মহিলা জানলো। মহিলার এই শক্তির রহস্য সে জানতে চাইলো। মহিলা বললেন—'আমি সামান্য নারী। সারাজীবন কর্তব্য পালন করেছি। এখন অসুস্থ স্বামীর সেবা করছি। এই আমার যোগাভ্যাস। কর্তব্য করেই আমার জ্ঞানচক্ষু খুলেছে, আর তাইতেই তোমার মনোভাব ও অহংকার তোমার কৃত সমস্ত ব্যাপার জানতে পেরেছি।'

সেজন্য একথাই বলতে হয় যে, নিজের সংস্কার ত্যাগ ক'রে অন্যের আদর্শ বরণ করা আত্মহত্যার সামিল। তাই বলা হয়েছে—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।' তারই জন্য নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বড়। আমার কর্তব্যের প্রকৃতি দিয়ে নয়, কিভাবে কর্তব্য পালন করছি তাই দিয়ে আমার বা আমার প্রকৃতির বিচার হবে। ব্যাধগীতায় ব্যাধের কাহিনী থেকে আমরা এই শিক্ষাই পাই। দর্শনের চরমসীমায় জ্ঞান প্রসারিত। তাই তিনি সামান্য ব্যাধের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন কেন? তার কারণ হোল—ব্যাধের পবিত্র জীবন থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন কর্মই অসৎ বা অপবিত্র নয়। জন্মগত কর্ম সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে সম্পন্ন করেও বেদান্তের চরমসিদ্ধান্ত বা জ্ঞানলাভ করা সম্ভব।

এইবার আলোচ্য বিষয়—কিভাবে কর্ম করতে হয় এবং কর্মতত্ত্বের এটাই প্রকৃত প্রশ্ন। মানুষ অনন্তশক্তির অধিকারী, আর কর্মের উদ্দেশ্য হ'ল ঐ অনন্তশক্তির বিকাশসাধন করা। এই উদ্দেশ্য সার্থক করার কৌশল নিহিত আছে কর্মরহস্যে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাই বলেছেন,—

'সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যসি॥' (২।৩৮)

সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয় সমান জ্ঞান ক'রে যুদ্ধ করো। অর্থাৎ কাজ করো, কিন্তু কর্মের ফলে আসক্ত হয়ো না। তাই নিষ্কামকর্মের কৌশল আয়ত্ত করা প্রয়োজন। এটিই হ'ল কর্মতত্ত্বের মূলকথা। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলেছেন,

'যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥' (২।৪৮)

ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে সমদৃষ্টিতে দেখে নিষ্ঠার সঙ্গে কর্ম করাই কর্মযোগ—'তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগ কর্মসু কৌশলম্'। অর্থাৎ কর্মের কুশলতাই যোগ। কুশলতা বা কৌশল একটি রহস্য—যে রহস্য জানলে সহজে কর্ম নিষ্পন্ন হয়। নিষ্কামকর্ম মুক্তির কারণ এবং ফলাসক্তিযুক্ত কর্ম বন্ধনের কারণ। তাই নিষ্কামকর্মের আদর্শ অনাসক্তি, ত্যাগ, জ্ঞান ও ঈশ্বরের উপলব্ধি।

কথা এই যে, কর্মে আসক্ত হ'য়ে পড়লে কর্মের সঙ্গে আমরা নিজেদের অভিন্ন ক'রে (জড়িয়ে) ফেলি, অর্থাৎ আমি ও আমার এই ভাবের তখন অধীন হ'য়ে পড়ি। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে চাঞ্চল্য, সংঘাত, নীচতা ও বিফলতার অভিশাপ-রূপ দুঃখ। ফলের আশায় কর্ম করা সেজন্যই সকল দুঃখের কারণ। তখন মন হ'য়ে পড়ে নিম্নমুখী এবং কর্মবন্ধন থেকে মুক্তির আশা হয় তখন সুদূরপরাহত। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'তুমি যেন বিদেশী পথিক, যেন দুদিনের জন্য আসিয়াছ এইভাবে কর্ম করিয়া যাও।.....এই জগত আমাদের বাসভূমি নহে।' তাঁর মতে, নিষ্কামকর্মের সারমর্ম জেনে প্রভুর মতো কর্ম করা,—ক্রীতদাসের মত নয়। তাই ফলের জন্য কর্ম দাসসুলভ কর্ম। যে কর্ম 'আমি' ও 'আমার'-ভাবকে জাগিয়ে তোলে তা আমাদের মনকে সংসারে আসক্ত ও আবদ্ধ করে। তাই 'তুমি' ও 'তোমার' ভাবকে অন্তরে জাগ্রত করতে হবে। কর্মযোগীর কর্ম তাই স্বার্থগন্ধশূন্য। কর্মযোগী সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কেবল

কর্মের জন্য কর্ম করেন—'work for work's sake'। নাম, যশ এমনকি স্বর্গলাভের বাসনা-কামনাও তাঁর মনে স্থান পায় না। কর্ম তাঁর কাছে হয় তাই উপাসনার স্বরূপ। কর্মযোগী সেজন্য স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন কর্মই করেন না। কিন্তু অপরপক্ষে ফলাভিসন্ধী হ'য়ে বা স্বার্থ-চরিতার্থের জন্য যিনি কর্ম করেন তিনি দুর্বল ও মনের দাস। পরাজয়ের আকাঙ্খায় অর্জুনের মতো বীরশ্রেষ্ঠও সাময়িকভাবে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছিলেন। তাই ফলের আশায় বা আকাঙ্খায় যদি আমরা কাজ করি তবে মন ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য এবং তখন মনের বহির্মুখী শক্তি বিচ্ছিন্নদিকে ধাবিত হ'য়ে কর্মশক্তিকে বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল ক'রে ফেলে। কিন্তু 'কর্মেই আমার অধিকার, ফলে নয়'—এই মন্ত্র জপ ক'রে সংযত ও স্থির মন নিয়ে যিনি কর্ম করেন তিনি বুদ্ধদেব বা যিশুখৃষ্টের মতো ক্ষমতাশালী হ'তে পারেন। কর্মযোগী তাই মহামানব, আর এই মহামানবদের আদর্শ অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে, কর্মপ্রণালী আমাদের স্বার্থপরতার প্রবণতা বা প্রবাহকে দমন করতে সাহায্য করে ও আত্মাকে উচ্চতর ভূমিতে বিচরণ করতে শিক্ষা দেয়। এরই নাম কর্মযোগ।

কর্মযোগও মুক্তিলাভের একটি উপায়। মনুষ্য-জীবনের চরমলক্ষ্যই মুক্তিলাভ করা। ইন্দ্রিয় ও মনের অধিগত এই জগৎ। তাই জগৎসীমার ঊর্ধে না গেলে মুক্তি ও শান্তি নাই। স্বার্থপরতা, অসংযম ইত্যাদি ভাব-জীবনের বন্ধন। এইসব বন্ধনের বাইরে বা ঊর্ধে যাবার পথ হলো সংসারের মধ্যে থেকেও সত্যকারের মানুষকে খুঁজে বার করা। একথাও সত্য যে, কর্মরহস্য শিক্ষা ক'রে আমরা আধ্যাত্মিকতার উচ্চসীমায় পৌঁছুতে পারি। তাই শাস্ত্র বলে, আসক্তিত্যাগের উপায় দুটি। একটি, নিবৃত্তি-মার্গ। নেতি নেতি বিচার ক'রে সকল বাসনা-কামনার পারে যাবার সাধনাই নিবৃত্তির পথ। অবশ্য এই পথ অত্যন্ত সুকঠিন। দ্বিতীয়—প্রবৃত্তি-মার্গ। সকল পদার্থকে জেনে ও ভোগ ক'রে পরে তার আসক্তিকে পরিত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ'। এই পথের সাধক কর্ম ও যথার্থ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বন্ধন থেকে উত্তীর্ণ হ'য়ে মুক্তি পাবার চেষ্টা করেন। প্রবৃত্তি-মার্গের পথ নিষ্কাম-কর্মযোগীর পথ। সংসারচক্রের ভেতরে থেকে যথাযথভাবে কর্ম ক'রে কর্মচক্রের বাইরে যাওয়া কর্মযোগীর যথার্থ সাধনা ও উদ্দেশ্য। ভগবান বুদ্ধ তাই বলেছিলেন: 'আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাহি না। আত্মা-সম্বন্ধে সূক্ষ্ম-মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? ভাল হও এবং ভাল কাজ করো—ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে এবং সত্য যাহাই হউক না কেন তাহাই তোমাদের সত্যে লইয়া যাইবে।'

তাই একথাই মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকার করতে হয় যে, কর্মযোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরে সন্নিবিষ্ট থাকা উচিত। তাঁর কর্মের সব ফলও হবে ঈশ্বরে অর্পিত। তাই তিনি যা দেখেন, করেন, শোনেন—সকলকেই ঈশ্বরের কাজ বলে ভাবেন। তাই তিনি তাঁর প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। তিনি গীতার কথা স্মরণ করে তাই বলেন,—

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ পস্যাতি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥' (৯।২৭)

'কর্ম, পূজা-উপাসনা, জপতপ: সবই ভগবানে অর্পন ক'রে শান্তি লাভ করো'—এই হয় ব্রত কর্মযোগীর জীবনে। এইভাবের প্রতিধ্বনি কবি T.S. Eliot-এর কাব্যেও দেখি। তিনি বলেছেন,

They know and donot know, what it is to act or suffer,
They know and donot know, that action is suffering
And suffering action. Neither does the agent suffer
Nor the patient act. But both are fixed
In an eternal action, an eternal patience
To which all must consent that it may be willed
And which all must suffer that they may will it,
That the pattern may subsist, for the pattern is the action
And the suffering, that the wheel may turn and still
Be for ever still.'

তাই ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কর্ম করা উচিত নয়। তাই 'তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী' এই ভাবটি মনে সর্বদা জাগিয়ে রাখতে হবে, কারণ সংসারচক্রের প্রাণকেন্দ্র ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণও তাই বলতেন, —'নাহং নাহং, তুঁহ তুঁহ'।

পরিশেষে বলি যে, নিরাসক্ত কর্মের শক্তি এমন একটি অবস্থায় নিয়ে যায় যেখানে কর্মী পরার্থে সকল-কিছু ত্যাগ করতে পারেন। তখন জ্ঞানী জ্ঞান দিয়ে, ভক্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও উপাসনা দিয়ে যে স্তরে উপনীত হন, কর্মীও পরার্থে কর্ম ক'রে ঠিক সেখানে উপস্থিত হন। পথ বা সাধনা তাই ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু লক্ষ্য এক।

সুতরাং দেখা যায়, নিঃস্বার্থ-কর্মের ক্ষেত্রেও জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত একই দিব্যস্তরে মিলিত হন। প্রচেষ্টা ভিন্ন ভিন্ন হলেও লক্ষ্য ও আদর্শ সকলের এক। গীতায় আছে—

'যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥' (৫।৫)

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, সন্ন্যাসযোগ ও কর্মযোগ একই ফল দান করে। জ্ঞানমার্গে বিচরণ ক'রে সন্ন্যাসীরা মোক্ষলাভ করেন, আবার নিষ্কামকর্মের সাধন ক'রে কর্মযোগীরা মোক্ষলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন—'ঈশ্বরের সঙ্গে কোনরকমে যুক্ত হ'য়ে থাকো, আর সেটাই কর্ম-যোগ'। কর্মযোগ কিনা কর্মের সাধনা-দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যুক্ত বা একীভূত হওয়া। কর্ম তাই পরিত্যাগের বস্তু নয়। তাছাড়া কর্ম ত্যাগ ক'রে মানুষ কর্মের সংসারে এক মুহূর্তও থাকতেও পারে না—সেকথা বলেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একথাই শিক্ষা দিয়েছেন গীতায় বারবার। তিনি বলেছেন—কর্মের সংসারে কর্ম ত্যাগ করে মিথ্যাচারীরা। মিথ্যাচারীর অর্থ হিপোক্রিট, অর্থাৎ যারা মনে মনে কর্ম করে, আর বাইরে বলে আমরাক র্মত্যাগী। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ-তিনটির দ্বারা মানুষকে সর্বদাই সংসারে কর্ম করায়। সুতরাং কর্ম যখন করতেই হবে, তখন কর্মরহস্য অর্থাৎ তার কৌশল আমাদের জানা উচিত। 'ফলে সক্ত নিবধ্যতে'—কর্মের ফলে আসক্ত হলেই মৃত্যু'—বলেছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই সংসারে দেশ ও দশের এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম করা উচিত এবং এ'ধরণের কর্মের দ্বারাই আসক্তি-রূপ বন্ধনের সংসারে মুক্তিলাভ করা যায়। মুক্তি লাভ করাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। মুক্তিলাভ কিনা নির্বাসনা লাভ ক'রে আত্মোপলব্ধি করা। এরই নাম কর্মের পারে যাওয়া।

॥ আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

মনে মনে আজ দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে চলুন, যে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরের পূজারী পরমহংসদেব রয়েছেন, যাঁর ঘরে নানা সময়ে নানা ধরণের ভক্তের আসা-যাওয়া, যিনি বাইরের পূজা আর করতে পারেন না, যাঁর সব কথায় সব চিন্তায় নিয়ত ঈশ্বরের আবির্ভাব। দূর থেকে মাঝে মাঝে সমবেত হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। হঠাৎ মনে হতে পারে সাধু-সন্ন্যাসীর ঘরে এত হাসি-মস্করা চলছে—ব্যাপারটা কি? ব্যাপার আর কিছু নয়, চির-আনন্দের ফোয়ারা যাঁর অন্তরে খুলে গেছে, সারা দুনিয়া তাঁর কাছে আনন্দময়। হাস্তে-পরিহাসে রঙ্গে-ব্যঙ্গে কখনো অঙ্গভঙ্গে তাঁর সেই অমৃত হাসির বিকীর্ণচ্ছটায় মুহুর্মুহু ভক্তদল প্রাণভরে হাসছেন। আবার পর মুহূর্তেই গভীরতম সাধন ও দর্শনের কথায় কোন অতলের সন্ধান পেয়ে চুপ হয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসিক অনেক, কিন্তু কথায় কথায় হাস্যরসকে এমন পরমোপলব্ধিতে পরিণত করার মতো হাসি আর কার নয়, এক শ্রীরামকৃষ্ণের। আবার মানবচরিত্র বিশ্লেষণে, সমাজসত্যের উদ্ঘাটনে উজ্জ্বল অস্ত্রের মতো শাণিত হাস্যচ্ছটায় মুহূর্তে তিনি মানুষের ভিতরের সব গ্লানি, সব দীনতা খোলা চোখের সামনে মেলে ধরেন। অতি বড় পণ্ডিত বা ধনী তাঁর সামনে সব বাচালতা হারিয়ে মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মতো মাথা নিচু করে থাকেন। আবার যাঁকে তিনি আঘাত করেন, তাঁর প্রতিও তাঁর সমান করুণা। তাই তীব্র পরিহাসও কখন করুণার কোমল আভায় দীপ্ত হয়ে ওঠে। যে তাঁর আশ্রয়-ভিখারী, তাঁর প্রতি তো তাঁর স্নেহ আছেই, যে তাঁর শরণাগত হওয়ার মূল্য জানে না, তাঁর প্রতিও তাঁর সমান করুণা।

সেদিন তাঁর জন্ম-মহোৎসব দক্ষিণেশ্বরে। একালে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণতিথিপূজা যেদিন হয় তার পরের রবিবারে সর্বসাধারণের জন্য মহোৎসব হয় বেলুড় মঠে, তিনি সশরীরে থাকতেও দক্ষিণেশ্বরে তেমনটিই ঘটেছিল। 'কথামৃত'কার লিখছেন—"আজ রবিবার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, ১২ই ফাল্গুন ১২৯১, শুক্লাষ্টমী। ভক্তেরা তাঁহার জন্মমহোৎসব করিতেছেন। গত সোমবার ফাল্গুন শুক্লাদ্বিতীয়া তাঁহার জন্মতিথি গিয়াছে।" সেদিনের ভক্তসমাবেশ লক্ষণীয়—"নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ, সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র, বিনোদ, হাজরা, রামলাল, রাম, নিত্যগোপাল, মণি মল্লিক, গিরিশ, সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতি অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে।"[১]

সেদিন খুব সকাল থেকেই নরোত্তম-কীর্তনীয়া গোপীগোষ্ঠ আর সুবলমিলন গাইছেন। বাউলের দলও সেদিন এসেছিল। সকালে প্রসাদ পাওয়ার পর ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের স্বভাবসিদ্ধ হাস্যপরিহাস নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে চলতে লাগলো। এক সময় রামলালকে বললেন, "গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ভাব কর, তা হলে থিয়েটার দেখতে পাবি। (হাস্য)"

বাইরের বারান্দায় নরেন্দ্র এবং হাজরা (ঠাকুরের ভাষায় নরেন্দ্রের 'কেরেও') গল্প করছিলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের ঘরে এসে বসলে পর ঠাকুর তাঁর এই দুই লীলাসঙ্গী-প্রসঙ্গে

১। কথামৃত: ৫ম ভাগ: ষোড়শ খণ্ড: ১ম পরিচ্ছেদ।

সেরা রসিকতার উপমা দিলেন। হাজরার কিছু দেনা আছে, ওদিকের পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রেরও অর্থকষ্ট। দু'জনের অবস্থার এই আপাতসাম্য নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—"তুই কি হাজরার কাছে বসেছিলি? তুই বিদেশিনী, সে বিরহিণী! হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার। (হাস্য)।"

তারপর আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ড নিয়ে হাজরার বিচারের কথা উঠলো। ঠাকুর বললেন, "হাজরা বলে, নরেন্দ্রের ষোলআনা সত্ত্বগুণ হয়েছে—একটু লালচে রজোগুণ আছে। আমার বিশুদ্ধসত্ত্ব সতের আনা।"

হাজরামশায় ভক্ত বটে, কিন্তু কিছু ব্যবসাবুদ্ধিও ঐ সঙ্গে আছে। সেকথা সকলের সামনেই বলছেন ঠাকুর। তিনি যখন শুদ্ধা ভক্তির আদর্শ তুলে ধরেন হাজরার কাছে, 'শুদ্ধ ভক্ত টাকা কড়ি ঐশ্বর্য কিছু চায় না', তখন পাটোয়ারীবুদ্ধি হাজরা বলেন, 'তাঁর কৃপাবন্যা এলে নদী তো উপ্‌চে যাবে, আবার খাল ডোবাও জলে পূর্ণ হবে, শুদ্ধা ভক্তিও হয়, আবার বড়ৈশ্বর্যও হয়। টাকাকড়িও হয়।"

লক্ষণীয়, হাজরার টাকাকড়ির কামনাকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করলেও নরেন্দ্রের আর্থিক দুরবস্থা-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্পূর্ণ অন্ত দৃষ্টি। অনাসক্ত নরেন্দ্রনাথের যে অন্তরে অর্থের কামনা একেবারেই নেই, সেকথা তিনি তাঁর আপাতরঙ্গের ভাষায় অন্যভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সেদিনই গিরিশ ঘোষ কথায় কথায় তাঁকে বলেছিলেন, "ফচ্‌কিমিতেও আপনাকে পারলুম না!" নরেন্দ্রনাথ এবং গিরিশচন্দ্র—এঁরা কেউ রঙ্গরসে কম নন, নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরাও হাসির রাজা; তবে রসসম্রাট শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি যখন মা-ভাই-বোনের জন্য অর্থচিন্তায় বিব্রত নরেন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে বলেন, "তুই তো 'খ'—তবে যদি টেকসো না থাকতো। (সকলের হাস্য)।"

'টেকসো না থাকতো'—কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন ভক্ত কৃষ্ণকিশোরের কথা। একদিন তার বাড়ীতে (এঁড়েদায়) গিয়ে ঠাকুর দেখেন কৃষ্ণকিশোর যেন চিন্তিত, কথাবার্তা খুব কম বলছেন। ব্যাপার কি, জানতে চাইলে কৃষ্ণকিশোর বললেন, খাজনা দিতে না পারায় ট্যাক্স-আদায়কারী শাসিয়ে গেছে যে পটিবাটি বিক্রী করে ট্যাক্স আদায় করবে। তাই তাঁর ভাবনা।

শুনে ঠাকুর হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "সে কি গো, তুমি তো 'খ' আকাশবৎ, যাক শালারা ঘটি বাটি নিয়ে যাক, তোমার কি?"

একাধারে জ্ঞানী ও ভক্ত কৃষ্ণকিশোর নিজেকে আকাশবৎ ব্রহ্মস্বরূপ মনে করতেন, তাই ঠাকুরের সেকথা মনে করিয়ে দেওয়া। আবার এদিকে নরেন্দ্রনাথকেও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আর সব চিন্তা, বিশেষতঃ অর্থচিন্তা, সবই পরমসত্যের জন্য সম্পূর্ণ বর্জনীয়।—"তাই তোকে বলছি তুই ত 'খ'—এত ভাব্‌ছিস কেন?" এ ভাবনা যে নরেন্দ্রনাথের পক্ষে একান্ত সাময়িক, তা তিনি জানতেন, আর সে ভাবনা তিনি কেমন করে গোপন করেছিলেন, তার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষী দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণী স্বয়ং।

একই অর্থচিন্তা নিয়ে হাজরার কপটতা ও নরেন্দ্রনাথের আন্তরিকতার কতোখানি পার্থক্য, সেকথা তাঁর ব্যঙ্গ-পরিহাসেও সমুজ্জ্বল।

কচ্‌কিমিতে তাঁর সঙ্গে এঁটে ওঠা কার সাধ্য ?

আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্তরা এসেছেন। বকুলতলায় বসে আছেন। মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম সেরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসে বসেছেন তাঁদের সঙ্গে : দেখে হাজরামশায় ছোট গোপালকে বললেন, "এঁকে একটু তামাক খাওয়াও।" শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) : "তুমি খাবে তাই বল। (সকলের হাস্য)।" ভক্তদের একজন 'মুখুজ্যে' হাজরামশায়কে বলছেন, "আপনি এঁর কাছে থেকে অনেক শিখেছেন।" মুখুজ্যে ভেবেছেন শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে হাজরা নানাভাবে তাঁর আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানেন, নিজের মহিমা সম্বন্ধে 'হাজরা' বেশ সচেতন। তাই বলছেন, "না, ওঁর বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা। (সকলের হাস্য)"[২] ভাবখানা এই যে কারু কাছ থেকে তাঁকে কিছু শিখ্‌তে হয় নি, বরং তিনিই সবাইকে শেখাচ্ছেন। ব্যঙ্গটুকু উপলব্ধি করেই সমবেত ভক্তদের হাসি।

ওই একই দিন সকালের দিকে জ্ঞানবাবু এসেছেন, (তখনকার দিনে চারটে পাশ এবং সরকারী কর্মচারী,) দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন,—'কি গো হঠাৎ যে জ্ঞানোদয় !' প্রশ্নের ধরণে রসিক বোদ্ধাজনের যোগ্য প্রত্যুত্তরের ইচ্ছা জাগে। জ্ঞানবাবু (সহাস্যে)—"আজ্ঞা, অনেক ভাগ্যে জ্ঞানোদয় হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণও নাছোড়বান্দা। তাঁর প্রতিপ্রশ্ন—'তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন ?'

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সমাধান করেছেন, "ও বুঝেছি, যেখানে জ্ঞান, সেখানেই অজ্ঞান।" সুতরাং জ্ঞানকাঁটা দিয়ে অজ্ঞানকাঁটা তুলে দুইই ফেলে দিতে হবে, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হবে। প্রতিদিনের সহজ আলাপচারীতে এত অনন্ত সত্যের ভাণ্ডার ভরে দেওয়া যায়, অথচ এতো স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসদীপ্তি ও শ্লেষনৈপুণ্য তাতে মেশানো যায়, একথা 'কথামৃত'ই আমাদের কাছে প্রমাণ করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মতিথির দ্বিতীয়ার চাঁদ কখন পূর্ণ হয়ে উঠেছে—সেদিন ১লা মার্চ, ১৮৮৫। পিতৃবিয়োগের পর নরেন্দ্রনাথের দুঃখকষ্ট বেড়েই চলেছে। স্নেহময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পরম স্নেহের নরেন্দ্রনাথের এই অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি নিয়ে উঁচুদরের রসিকতা করলেন, "তুই কি চিকিৎসক হয়েছিস। 'শতমারী ভবেবৈদ্যঃ। সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।'[৩]

জগতের দুঃখের সঙ্গে যত নরেন্দ্রনাথের পরিচয় বাড়ছে ততই তাঁর অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত হয়ে চলেছে। এমনি দিনে মর্মবিদারী দুঃখের আলোকে পরমসত্যের প্রকাশ ঘটলো নরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে। তখন থেকে তিনি আর কলকত্তার বা বাংলার ছেলেটি রইলেন না, ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতবর্ষ, সমগ্র পৃথিবীর হৃদয়-বেদনার সন্তাপহারী ; বৈদ্য ন'ন, তখন চিকিৎসক।

২। কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : ঊনবিংশ খণ্ড : ১ম পরিচ্ছেদ : ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪।

৩। কথামৃত : ৪র্থ ভাগ : অষ্টাবিংশ খণ্ড : দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শশধর তর্কচূড়ামণিকে দেখতে এসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আজ আমার খুব দিন। আমি দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখলাম। তারপরই দ্বিতীয়ার চাঁদ কথাটি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "সীতা রাবণকে বলেছিলেন, রাবণ পূর্ণচন্দ্র, আর রামচন্দ্র আমার দ্বিতীয়ার চাঁদ। রাবণ মানে বুঝতে পারে নাই, তাই ভারী খুশী। সীতার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, রাবণের সম্পদ যতদূর হবার হয়েছে, এইবার দিন দিন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় হ্রাস পাবে। রামচন্দ্র দ্বিতীয়ার চাঁদ, তাঁর দিন দিন বৃদ্ধি হবে।"[৪] (২৫শে জুন, ১৮৮৪)

'দ্বিতীয়ার চাঁদ'—উপমাটি কি শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধেই যথার্থ প্রযোজ্য নয়? তাঁর আবির্ভাবের পর থেকে দিনে দিনে তাঁর স্বরূপ-উপলব্ধিতে আমরা কি সেই পূর্ণতাই অনুভব করছি না, পূর্ণিমার চাঁদ যার আভাসমাত্র?

অনুক্ষণ ঈশ্বর তন্ময়তার অর্থই নিরন্তর আনন্দধারা। তাঁর সঙ্গে যেসব অন্তরঙ্গ ও পার্ষদেরা ছিলেন, তাঁদের সর্বক্ষণ সেই অধ্যাত্ম-অনুভূতির জাগ্রত প্রত্যক্ষ প্রভাব দিয়ে তিনি ঘিরে রাখতেন, সে অনুভূতিরই আর একটি দিক তাঁর হাস্যরসের চির নবীনতার। বিদেশী ভক্ত ঈশারউড (Christoper Isherwood) শ্রীরামকৃষ্ণের এই ঈশ্বরতন্ময়তাকে বলেছেন 'চির—বর্তমান'। আমরা সবাই হয় অতীতের অনুশোচনায় নয় ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে জীবন কাটাই। "শ্রীম—আমাদের কাছে এমন ব্যক্তিত্বকে উপস্থাপিত করেছেন যিনি চিরবর্তমানে বিধৃত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অতীত বা ভবিষ্যতের কিছু নয়, তা এই প্রত্যক্ষ মুহূর্ত—এই বর্তমান।"[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণের চলায় বলায় ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে নৃত্যে সঙ্গীতে মুহূর্তে মুহূর্তে আনন্দের অমৃতকণা ঝরে পড়ছে। 'কথামৃতে' সে সব উদাহরণের কতো সামান্য অংশই বিধৃত। তবু ওই 'কণিকা'-প্রসাদেই অনন্ত ভবিষ্যতের ভাবনা ও সাধনার উপাদান।

ভাগবতের এক পণ্ডিত তাঁকে বলেছিলেন, "আপনি মহাত্মা।"

তিনি বললেন—"সে নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব এদের বলতে পারেন। আমি আপনার সন্তানের ন্যায়।

"তবে এক হিসাবে বলতে পারেন। এমি আছে যে ভগবানের চেয়ে ভক্ত বড়—কেননা ভক্ত ভগবানকে হৃদয়ে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।" (সকলের আনন্দ)

এ আনন্দলীলায় নিজে মেতে আর সকলকে মাতিয়ে রাখাই 'কথামৃতে' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সবচেয়ে বড়ো দান। এমন আনন্দময় কথামালার আর একটি উদাহরণ। সারাদিন ঈশানের বাড়ীতে এবং শশধর তর্কচূড়ামণির বাড়ীতে নানা কথার পর ঈশানের বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে পাশের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—

"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসার নিত্য অনিত্যে মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

৪, ৬, ৭ কথামৃত : ১ম ভাগ : ১১শ খণ্ড : ৩য় পরিচ্ছেদ

৫। Ramakrisha and His Disciples : p 279

"জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

"গোলেমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"—কথাশেষে তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে চললেন। যারা শুনছিল, আজ আমরা তাঁদের নিবিষ্ট শ্রবণানন্দের অংশভাগী। একের পর এক এমন সব উপমার লৌকিক জীবন থেকে আহরিত অলৌকিক রস যাঁরা আস্বাদ করেছিলেন, তাঁরা জানতেন না হয়তো অন্যতম শ্রোতা শ্রীম-র মাধ্যমে আমরাও সেই আনন্দ-স্বরূপকে মুহূর্তের জন্য হলেও একাত্ম হয়ে অনুভব করবো। ঈশ্বর ও জগৎ, আসক্তি ও বৈরাগ্য, এ জীবন ও মহাজীবন—আমাদেরই প্রতিদিনের চোখে-দেখা মনে-ভাবা কথায়-বলা গোটা পৃথিবীর অনুভবকে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করে শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীময় অনন্ত সত্যের অমৃত আনন্দলাভের কৌশলটুকু চিরকালের মতো হাতের মুঠোয় এনে দিলো।

●

॥ আনন্দরূপম্ ॥

(গান)

শ্রীশান্তনীল দাশ

আনন্দ তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ ভুবনে।
আনন্দ ঝরে শিশিরকণায়, আনন্দ নীল-গগনে।
　　পাখীর কণ্ঠে আনন্দ-গান,
　　আনন্দময় নদী কলতান ;
আনন্দগীতি প্রভাতসমীরে, আনন্দ রবি-কিরণে।
যেদিকে তাকাই, হেরি অপরূপ আনন্দময় মূরতি,
আঁধারের বুকে, আলোকশিখায় চলে আনন্দ-আরতি।
　　শিশু-কলভাষে, জননীর বুকে,
　　কুমারী-নয়নে, প্রিয়জন-মুখে
চির আনন্দময় হয়ে তুমি বিরাজো ভুবনে ভবনে।

●

॥ ভারতীয় যোগসাধনা ও জীবনসিদ্ধি ॥

স্বামী পরমাত্মানন্দ

নিরীশ্বর-সাংখ্যবাদী ঋষি কপিলের আবির্ভাবের প্রায় পাঁচ শত বছর আগে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে বিধিবদ্ধ যোগদর্শনের প্রচলন করেন ঋষি পতঞ্জলি। 'রাজযোগ' নামে এই যোগদর্শন আজও বহুল-প্রচলিত। সমসাময়িক সাংখ্যদর্শনকে যুক্তি ও তত্ত্ব-হিসাবে গ্রহণ করেই ঋষি পতঞ্জলি সেশ্বর-সাংখ্য-রূপ 'যোগদর্শন' রচনা করেন। সুতরাং প্রাচীনকালে সাংখ্য ও যোগের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। ব্যাসের সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যে সেকথা পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ আছে তা' স্বামী বিবেকানন্দও বলেছেন অতি-স্পষ্ট ভাষায় : 'Before proceeding further, I will tell you a little of the Sankhya Philosophy, upon which the whole of Raja-Yoga is based...The former is a statement on the physical side, and the latter on the psychological side ; yet both are the same', (cf. S.V., pt.I),—অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনকে ভিত্তি করেই পতঞ্জলির রাজযোগ রচিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, সাংখ্যদর্শন বহির্জগতের দৃষ্টিতে যেকথা বলে যোগদর্শন মানসদৃষ্টিতে সেকথাই বলে, তাই উভয়ের লক্ষ্য একই। যোগশাস্ত্রে সেকথাই বলা হয়েছে। পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেক ও বৈরাগ্যকে অনুসরণ ক'রে যাঁরা মুক্তি বা মোক্ষলাভ করার প্রচেষ্টা করেন তাঁরা সাংখ্যবাদী, আর তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান-যোগে যাঁরা আত্মসাক্ষাৎকার করেন তাঁরা যোগী। তাই লক্ষ্য ও চরম-আদর্শের দিক থেকে উভয়েই সমগোত্রীয় বলা যায়। কিন্তু একথা সত্য যে, অভ্যাস এবং আচরণের দিক থেকে এ'দুটি পথের মধ্যে পার্থক্য আছে। আচার্য মধুসূদন- সরস্বতী 'যোগ' ও 'জ্ঞান' মুক্তিলাভের এই দু'টি ভিন্ন পথ বলেছেন। 'যোগ'-দ্বারা চিত্তবৃত্তির লয় (বিনাশ) হয়, আর জ্ঞানের দ্বারা সত্যকে জানার বাধাস্বরূপ অজ্ঞান দূর হয়ে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি হয়। যোগের অভ্যাসে চিত্তবৃত্তির লয় বলতে রূপান্তর হওয়ায় যে সমাধি হয় তাকে বলে 'লয়-সমাধি', আর জ্ঞানে অজ্ঞানরূপ-বাধা বা অন্তরায় দূর হ'লে যে স্বরূপের উপলব্ধি হয় তাকে বলে 'বাধ-সমাধি'—যদিও 'সমাধি'-শব্দটি যোগেরই নিজস্ব কথা বা পরিভাষা। বেদান্তে 'সমাধি'-শব্দের অর্থ আত্মস্বরূপের প্রত্যক্ষজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তিহেতু চিত্তের সমাহিত অবস্থা—যা বিচার-রূপ জ্ঞানের চরম-সীমায় পৌঁছে লাভ করা যায়। জ্ঞানের এই চরম- অনুভূতিকেই বলা হয় প্রত্যক্ষদর্শন বা অপরোক্ষানুভূতি। এই অবস্থা লাভ হ'লে সাধকের আর জন্ম-মৃত্যুর পথে যাতায়াত হয় না।

যোগাভ্যাসের ক্ষেত্রে যোগের চরমলক্ষ্য নির্বিকল্পসমাধি না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিলাভ হয় না, কারণ তখনও 'অহং'-সঙ্কল্প বর্তমান থাকে। 'অহং'-সংকল্প নিয়ে যে সমাধি হয় তাকে বলে 'সবিকল্প' বা 'সবীজ'-সমাধি। এই সবীজ বা সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিতে সাধকের মুক্তিলাভ হয় না। একমাত্র নির্বিকল্প বা নির্বীজ-সমাধিতেই 'অহং'-বীজের বিনাশ হওয়ায় সাধক মুক্তি লাভ করেন। তখন আর সিদ্ধ-যোগীকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ফিরে আসতে হয় না। শরীরের

বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত এরূপ জীবন্মুক্ত আত্মজ্ঞানী বা সিদ্ধযোগী-পুরুষ সংসারে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন এবং নির্লিপ্তভাবে লোক-কল্যাণের জন্য কর্ম করেন। প্রকৃতপক্ষে চরমলক্ষ্যে পৌঁছে উভয়প্রকার সাধকই অজ্ঞানের পারে অবস্থান করেন। সিদ্ধ-সাধকগণের এই অবস্থা মায়াধীশ-ঈশ্বরের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কারণ এ'অবস্থায় আত্মজ্ঞানী বা পরমহংসযোগীর মনো সৃষ্টি-ইচ্ছা থাকে না, সুতরাং এ'টি বিরাট বা জগৎ, হিরণ্যগর্ভ বা মহাপ্রকৃতি ও মায়াধীশ-ঈশ্বর বা আনন্দময়লোকেরও পরপারে 'তুরীয়' অবস্থা।

ঋষি পতঞ্জলি যোগপথে এই 'তুরীয়'-অবস্থালাভের উপায়-স্বরূপ 'যোগসূত্র' রচনা করেছেন। তিনি তাঁর যোগদর্শনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন : সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রায় ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ব্যাসের 'যোগভাষ্য' পতঞ্জলির যোগসূত্রের আরও উৎকর্ষ সাধন করেছে। ঋষি পতঞ্জলির আগে, এমন কি বৈদিক যুগেও—যখন প্রবৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল তখন আধ্যাত্মিক শক্তিবিকাশের জন্য যোগাভ্যাস প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে, কেননা প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়োতে নাসাগ্রদৃষ্টি যোগীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদে অপ্রাকৃত (supernatural) শক্তি-অর্জনের জন্য ধ্যান ও যোগাভ্যাসের কথা আছে। উপনিষদের যুগে যোগসাধনার উদ্দেশ্য ছিল সত্যকে জানার একান্ত অন্তর্মুখী প্রচেষ্টা—'a conscious inward search or striving after knowledge of reality'—বলেছেন ভক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্। বৃহদারণ্যক-উপনিষদে মনের একাগ্রতা ও ধ্যান-অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। কঠোপনিষৎ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও 'যোগ'-পদ্ধতির উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋষি পতঞ্জলির উপদিষ্ট যোগদর্শন মুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক। যোগশক্তি-অর্জনের লক্ষ্যকে গৌণ ক'রে চিরমুক্তি বা পরমশান্তি লাভকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করেছেন তিনি। তাঁর যোগদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের ১ম ও ২য় সূত্র লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, তিনি মনের সাম্যাবস্থা-রূপ সমাধিকেই পরমশান্তির লক্ষ্য ও আদর্শ বলেছেন।

সুতরাং দেখা যায়, বেদ থেকে শুরু করে উপনিষৎ, মহাভারত, পুরাণ, ভগবদ্গীতা এবং পরবর্তীকালে জৈন ও বৌদ্ধ-ধর্মেও মোক্ষসাধনার উপায়রূপে 'যোগ'-কে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনায় যোগের স্থান তাই সকল-কিছুর শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যোগ বহু সাধকের জীবনসিদ্ধির মধ্য দিয়ে পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট করেছে যুগধর্মকে ও যুগের সভ্যতাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানালোকের প্রদীপ্ত পথে এই যোগসাধনা বিচিত্র শাখায় ও রূপে বিস্তার লাভ করেছে। সুতরাং ঋষি পতঞ্জলি-কৃত যোগদর্শনের বৈশিষ্ট্য হ'ল 'যোগ'-কে শুধুমাত্র বিভূতি বা শক্তিবিকাশের ক্ষেত্রে সীমায়িত না রেখে এটিকে মুক্তিলাভের একটি প্রণালীবদ্ধ সাধনোপায় হিসাবে রূপ দান করা।

ভারতীয় যোগপদ্ধতি ভারতবর্ষ ছাড়াও বিশ্বের সকল শ্রেণীর সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও-না-কোন আকারে বহুদিন থেকে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, পিথাগোরাস, প্লেটো, প্লটিনাস প্রভৃতি ইওরোপের মধ্যযুগীয় জ্ঞানবাদী ও খৃষ্টান-ময়মী-সম্প্রদায়ের ভেতরও যোগশিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, আটলান্টিয়ান,

ইজিপ্সিয়ান, ব্যাবিলোনিয়ন এবং কাবালাদের দ্বারা প্রভাবিত মরমী (mystics) ও জ্ঞান-বাদীদের থেকে শুরু ক'রে রোমান-ক্যাথলিক-সম্প্রদায় সকলেই যোগশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া বুদ্ধ ও যীশুখ্রীষ্ট উভয়েই পরমযোগী ছিলেন। বুদ্ধদেব নিজে যোগাভ্যাস করেছিলেন এবং বুদ্ধের প্রবর্তিত সাধনপথকে অনুসরণ ক'রে বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে যোগের সাধনপদ্ধতি প্রচলন করা হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্ট-সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর 'How to be a Yogi'-গ্রন্থে বলেছেন: "যীশুখ্রীষ্টের সমস্ত অলৌকিক কার্য যোগসিদ্ধিলব্ধ শক্তিপ্রয়োগের ফলে হইয়াছিল এবং ভারতের যোগীরা বহুবার এই সমস্ত অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, যীশুখ্রীষ্ট সেমেটিক-জাতির মধ্যে একজন সিদ্ধ যোগীপুরুষ..... ভারতের রাজযোগীদের ন্যায় যীশুখ্রীষ্টও নিজের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ হইতে নিজেকে যোগবলে পৃথক করিয়া ফেলিতে পারিতেন।.....আত্মজ্ঞান লাভ হওয়ার ফলে যীশুখ্রীষ্ট নিজের দেহ হইতে নিজেকে (আত্মাকে) পৃথক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মা স্থূলদেহ হইতে স্বতন্ত্র ও মুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য দেহের উপর নিষ্পেষন হওয়া-সত্ত্বেও তাঁহার অমর-সত্তাকে তা' আদৌ দুঃখ-ক্লেশ দিতে পারে নাই। সেজন্য ক্রুশবিদ্ধ হইয়া দৈহিক যন্ত্রণাভোগ করা-সত্ত্বেও যীশু অত্যাচারী ইহুদীদের ক্ষমা করিয়াছিলেন ও তাহাদের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃত যোগীর পক্ষে এরূপ কার্য করা সম্ভব। চিত্তের যে-অবস্থালাভের ফলে যীশুখ্রীষ্ট অত্যাচারীদিগকে ক্ষমা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেরূপ দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে বহু যোগীর জীবনে ঘটিয়াছে। দেহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেও যোগীদের চিত্তের প্রশান্তভাব আদৌ নষ্ট হয় না। স্বীয় জীবনের দৃষ্টান্তদ্বারা যীশুখ্রীষ্ট প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আত্মা দেহ, দৈহিক প্রবৃত্তি ও সংস্কাররাশি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এইজন্যই যীশুখ্রীষ্টকে যোগী বলিয়া অভিহিত করা উচিত।"

সেজন্য বলি, যোগে মুক্তি বা মোক্ষ তখনই লাভ হয় যখন সাধক তার প্রকৃত স্বরূপের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বোধ করে, আর সেই অভিন্নবোধকে সার্থক করার জন্য পুরুষ থেকে প্রকৃতিকে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলেছেন সাংখ্যকার ঋষি কপিল। সুতরাং যোগদর্শন ও সাংখ্যদর্শন উভয়েরই এটি মূলকথা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হোল উপায়ের বা সাধনার ক্ষেত্রে। সাংখ্যমতে পুরুষ-প্রকৃতি-বিবেকই মুক্তিলাভের উপায়, আর যোগশাস্ত্রে মানসিক একাগ্রতা-দ্বারা মনের স্বরূপ যে চৈতন্য তাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আচার্য শঙ্কর কিন্তু পুরুষ-প্রকৃতিবিবেকে মুক্তি হয় একথা স্বীকার করেন নি এবং স্বীকার করেন নি পতঞ্জলি-নির্দিষ্ট যোগসাধনায় মনোলয়ে মুক্তির কথা। তাঁর মতে, নির্বিকল্পসমাধিতে পৌঁছুতে হ'লে বিচার ও ত্যাগ প্রয়োজন, নচেৎ মনের নির্বীজতা বা অহংজ্ঞানশূন্যতা লাভ করা যায় না। আচার্য শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, যোগের পরিবর্তে বেদান্তের মহাবাক্যের বিচার দ্বারা যোগী সবীজ-সমাধির অবস্থাকে অতিক্রম করতে পারেন। বেদান্ত বলে, মহাবাক্যের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-দ্বারা সবিকল্পসমাধি অবস্থা থেকে নির্বিকল্প-সমাধিভূমিতে উপনীত হলে, অর্থাৎ সকল সংকল্পের অতীত হ'য়ে, তবেই মুক্তি লাভ করেন সাধক। আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর কথা এ'সম্বন্ধে স্বতন্ত্র। তাঁর মতে, মনের গহন-গভীরে

লুক্কায়িত অহংভাবকে দূর করার জন্ত জ্ঞান ও যোগ দু'টি পন্থারই প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, যোগে মানসিক ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয় এবং জ্ঞানে তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়। সাধন-জগতে দেখা যায়, কাহারও পক্ষে হয়তো যোগ সম্ভব হয় না, আবার কাহারও পক্ষে জ্ঞান সম্ভব হয় না, কেননা ভিন্ন ভিন্ন সাধকের মধ্যে রুচির ও শক্তির পার্থক্য আছে। তবে সাধনপদ্ধতি যাই হোক না কেন, একমাত্র মনের অহংবৃত্তিনাশেই যে আত্মস্বরূপতা বা আত্মজ্ঞান লাভ হয় এ'-সিদ্ধান্ত আমরা জীবনসিদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় পাই—"আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"। প্রকৃতপক্ষে আমি'-র নাশই মুক্তির কারণ। 'আমি' বলতে অজ্ঞান বা অবিদ্যা। বেদান্ত তাই অবিদ্যানাশ-রূপ অবস্থাকেই একমাত্র মুক্তির কারণ বা উপায় বলেছেন।

মোটকথা মনকে চরমলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বিষয় ও বাসনা থেকে তাকে মুক্ত করা চাই। অবশ্য ঋষি পতঞ্জলিই বিষয়-বন্ধন থেকে মনকে নির্মুক্ত করাকে যোগের উদ্দেশ্য বলেছেন। সেজন্ত তিনি অষ্টাঙ্গযোগসাধনের কথাই বলেছেন। পূর্বেই বলেছি যে, যোগসূত্রের প্রথম কথাই তিনি বলেছেন : "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ করাই যোগ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি-ক্রিয়াযোগের অভ্যাস করতে হয় চিত্তবৃত্তিকে স্থির করার জন্ত।

'যম'—বলতে বোঝায় অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ।

'নিয়ম'—বলতে বোঝায় শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান।

'আসন'—বলতে বলা হয়েছে যেভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে অক্লেশে বসা যায়।

'প্রাণায়াম'—অর্থাৎ প্রাণবায়ুর রেচক, পূরক ও কুম্ভকরূপ তিনটি প্রক্রিয়ার অভ্যাস।

'প্রত্যাহার'—শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ভোগের দিকে ধাবিত হতে না দিয়ে ব্রহ্মবস্তুতে স্থির করার প্রচেষ্টা।

'ধারণা'—অর্থাৎ ধ্যেয়-বস্তুকে হৃৎকমলে প্রতিষ্ঠিত করা।

'ধ্যান'—ধ্যেয়বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন একাগ্র চিন্তাই ধ্যান।

'সমাধি'—ধ্যান স্থায়ী হলেই সমাধি বা সমাহিত অবস্থালাভ হয়।

ঋষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে 'সমাধিপাদ'-পর্যায়ে চিত্তবৃত্তির বিভিন্ন বিভাগ ও তার নিরোধের উপায়, অপর ও প্রণবরহস্ত, সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক-সমাধির স্বরূপ প্রভৃতির বিবরণ দিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'সাধনপাদ'-এ বর্ণনা করেছেন তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধানরূপ ক্রিয়াযোগ, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ, অবিদ্যা ও তার নাশ, আসনপ্রকরণ, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের স্বরূপ। তৃতীয় অধ্যায়ে 'বিভূতিপাদ'-এ তিনি দিয়েছেন ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটি সাধনা ও সেই সাধনলব্ধ বিচিত্র ঐশ্বর্য বা বিভূতি-রূপ সিদ্ধির সার্থকতা এবং পরিশেষে নির্বিকল্পসমাধির প্রশস্তি। সর্বশেষ চতুর্থ অধ্যায়ে 'কৈবল্যপাদ'-এ ঋষি পতঞ্জলি প্রকৃতির সহযোগে জাত্যন্তরপরিণাম, যোগীর চিত্ত ও চিত্তকর্ম, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের পৃথক সত্তা, বুত্থান ও ধর্মমেঘসমাধি, গুণত্রয় ও সাধকের মুক্তি প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত যোগচিন্তা ও যোগসাধনার যে ক্রমবিকাশ হয়েছে তার মধ্যে আমরা চারপ্রকার যোগের পরিচয় পাই—লয়যোগ, মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ। চিত্তবৃত্তির নাশ দ্বারা প্রথম প্রকার অর্থাৎ লয়যোগের আলোচনা পূর্বেই করেছি। মন্ত্রযোগে মনের বিভিন্নপ্রকার শক্তির বিকাশ হয়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই যোগ-শক্তির বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। হঠযোগে শরীরের নানাপ্রকার চর্চা হয়। বহুপ্রকারের চমকপ্রদ শক্তিবৃদ্ধি হয় এই হঠযোগের অভ্যাসে। কিন্তু এ'-সকলের সার্থকতা কেবল শক্তি-বিকাশের ক্ষেত্রে, সংসারচক্র থেকে মুক্তিলাভের পথ এগুলি নয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "হটযোগ আর রাজযোগ। রাজযোগ মনের দ্বারা যোগ হয়, ভক্তির দ্বারা (ভক্তিযোগ), বিচারের দ্বারা (জ্ঞানযোগ) যোগ হয়। ঐ যোগই (রাজযোগ) ভাল। হঠযোগ ভাল নয়। কলিতে অন্নগত প্রাণ" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ)। ভক্তিযোগে পরাভক্তি-লাভেই মুক্তি হয়। তাছাড়া আছে 'কর্মযোগ' অর্থাৎ নিষ্কাম-কর্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিপূর্বক জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করা। এই সকল প্রকার যোগেরই আলোচনা করেছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর পাঁচটি গ্রন্থে: (1) True Psychology (2) How To be A Yogi. (3) Yoga Psychology, (4) Yoga. Theory and Practice, (5) Doctrine of Karma.

রাজযোগই মুক্তির রাজপথ। পূর্বেই বলেছি. ঋষি পতঞ্জলি-কৃত অষ্টাঙ্গযোগসাধন রাজযোগের অন্তর্গত। 'মনের দ্বারাই এই যোগ হয়' বলতে মনকে স্থির ও শান্ত করাতেই যোগ-সাধনার আদর্শ সার্থক হয়। আত্মা ও পরমাত্মার মিলন-সাধনকেও যোগ বলে। মন সাধারণতঃ যুক্তই আছে, কিন্তু তা যুক্ত আছে ক্ষণস্থায়ী জাগতিক বিষয়-বস্তুর সাথে—যা আমাদের শাশ্বত শান্তি দিতে পারে না। কামনা-বাসনার ভোগ-রূপ বৃত্তিচাঞ্চল্য থেকে হয় সংসারভোগ, আর অচঞ্চল স্থির মনই আমাদের সংসারচক্রের পারে নিয়ে যায়। মোটকথা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের জন্যই আমরা নিজেদের স্বরূপ আত্মাকে ভুলে গিয়ে সংসারভোগকে বিষয় বলে মনে করি। তাই মনে রাখা উচিত যে, মন আসলে চৈতন্যই। মনের সংকল্প-বিকল্প-রূপ চাঞ্চল্য দূর হলে মন চৈতন্যরূপেই বিরাজ করে। তাই বৃত্তিচাঞ্চল্যহীন মনেই আত্মস্বরূপের উপলব্ধি আসে। মনকে সেজন্য সকল কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত করতে হয় এবং মুক্ত করে আত্মস্বরূপের সাথে যুক্ত ও এক করতে হয়। যোগের দ্বারা হৃদয়গুহায় চিরজাগ্রত পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত বা এক হতে হয়।

মন যুক্ত-অবস্থা ছাড়া থাকতে পারে না, তাই তার যুক্ত হওয়ার বিষয়কে পরিবর্তন করতে হয় জাগতিক অনিত্য বস্তু থেকে পারমার্থিক নিত্য আত্মবস্তুতে মনকে স্থির ক'রে। মন যখন অনাত্ম-বিষয়ে যুক্ত থাকে তখন হয় চঞ্চল-মন, আর যখন নিত্য অচঞ্চল আত্মবস্তুতে যুক্ত থাকে তখন হয় মনের 'যোগ'। ঋষি পতঞ্জলি তাই বলেছেন: 'অভ্যাসবৈরাগাভ্যাং তন্নিরোধঃ'—অভ্যাস এবং বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিরোধ বা স্থির করতে হয়। এই স্থির, অচঞ্চল, বৃত্তিহীন মনই 'শুদ্ধমন' বা চৈতন্যে রূপান্তরিত মন। অশুদ্ধ বা চঞ্চল মনই যোগাভ্যাসের দ্বারা শুদ্ধ বা অচঞ্চল হয়ে স্বরূপ চৈতন্যে পর্যবসিত হয়। যোগের এই মহিমার জন্যই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহু মুক্তিকামী মানুষ জীবনসিদ্ধির পথে যোগসাধনাকে গ্রহণ করেছে। তবে মনে রাখতে হবে যে,

ফলকামনা ত্যাগ করে যোগাভ্যাস না করলে যোগজ বহু প্রকারের 'সিদ্ধাই' বা 'বিভূতি' মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং সাধককে বিপথে পরিচালিত করে। তাই স্মরণ রাখতে বলি ভগবদ্গীতায় মহাযোগী শ্রীকৃষ্ণের কথা—

"এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥" (৬।১৮)

আসক্তি, কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে কেবল ঈশ্বর আরাধনারূপে কর্ম (যোগাভ্যাস) করেই যোগের চরমলক্ষ্য যে মনোলয় ও অহংবোধের নাশ—তা সিদ্ধ হয়। এই সিদ্ধিই সাধকের জীবনে আনে চিরমুক্তির প্রসন্নতা ও আনন্দ। এই মুক্তির আশীর্বাদেই সাধক চিরদিনের জন্য জন্ম-মরণ-রূপ সংসারচক্র অতিক্রম করেন।

পরিশেষে বলি, সাংখ্য ও যোগের ক্ষেত্রে প্রতিটি যুগে ও প্রতিটি সমাজে জ্ঞানকামী বা মুক্তিকামী মানুষের মধ্যে পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক কিংবা সাংসারিক বিষয়বস্তু থেকে মনের বিবেক-সাধনরূপ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিবেক কিনা বিবিক্ত বা পৃথক করা। সেজন্য ভোগের পাশাপাশি ত্যাগের সামগ্রী ও নিদর্শনের অভাব দেখি না কোনটি যুগে। আজও সেই সামগ্রী ও নিদর্শনের অভাব নাই। কিন্তু কথা এই যে, আমরা কর্তব্যাকর্তব্য বুঝি না, তাই কেবলই পুরুষ থেকে প্রকৃতিকে পৃথক করার প্রচেষ্টা, বা সাধনা থেকে আমরা সংসারচক্রের ও বন্ধনের পারে যেতে পারি না, সেজন্য মনের বিবেক বলতে মনকে সমস্ত অনাত্মবস্তু থেকে পৃথক ক'রে আত্মবস্তুর সঙ্গে যুক্ত করার প্রণালী বা সাধনা আমাদের শিক্ষা করতে হয়। তারই জন্য প্রয়োজন যোগসাধনা। তারই জন্য প্রয়োজন যোগে মনের সকল সংকল্প ও বিকল্প-রূপ বৃত্তিকে দূর ক'রে আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হ'তে শিক্ষা করা। মন সমস্ত বৃত্তিশূন্য হয়ে আত্মারূপ কেন্দ্রে সমাহিত ও স্থির হলেই দ্রষ্টা-রূপ আত্মার সঙ্গে আমরা এক বা যুক্ত হতে পারি। যোগসাধনার এটিই মর্মকথা। যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করাই উদ্দেশ্য এবং এই যোগসিদ্ধির নাম জীবনসিদ্ধিলাভ। জীবনসিদ্ধি বলতে আমরা বুঝি মানবপ্রকৃতির ও মানবসত্তার ঊর্ধ্বে পরমাত্মার দিব্যসত্তায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করা, আর তখনই সাধারণ মানব হয় দেবমানব। জীবন হয় তখন পরমসিদ্ধ এবং আত্মস্বরূপের সীমাহীন প্রশান্ত সমুদ্রে চির-অবগাহিত ও চিরপবিত্র।

●

॥ সাইক্লোট্রোন ॥

শ্রীমতী চামেলী বসু

সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন একদিন নিজের সম্বন্ধে এই উক্তি করেছিলেন,

"I do not know what I may appear to the world but to myself I seem to have been like a boy playing on the sea-shore and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me."

অর্থাৎ "পৃথিবীর মানুষ আমায় কি মনে করে আমি জানি না কিন্তু আমার মনে হয় আমি সমুদ্রকূলে ক্রীড়ারত বালকের মতো ইতস্তত: দেখে বেড়াচ্ছি কোথায় একটি মসৃণ নুড়ি অথবা একটি সুন্দর ঝিনুক পড়ে আছে অথচ আমার সামনে রয়েছে সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত সত্যের মহাসমুদ্র"। তারপরে দীর্ঘ তিনটি শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে আজও বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন তাঁরা অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের কূলে নুড়ি কুড়িয়ে চলেছেন। অসীম বিশ্বপ্রকৃতির মাঝে আজও কত রহস্য লুকিয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই, তাই অনুসন্ধানেরও শেষ নেই। অনন্ত বৈচিত্র্যে এবং শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডারে যুগ যুগ ধরে চলেছে নূতন নূতন তত্ত্ব ও তথ্যের সংযোজন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন,

"Nature is whispering to us the beginning of her secrets, the scientific man must ever be on the watch, ready at once to lay hold on nature's hint, however small, to listen to her whisper, however low."

প্রকৃতির অস্ফুট গুঞ্জন স্পর্শ ক'রে বৈজ্ঞানিক সচেতনাকে, জানার রহস্যের গভীরে ডুব দেবার আহ্বান, উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে চলার মন্ত্রে। দুর্বার অনুসন্ধিৎসা নিয়ে কাজ করে যান বিজ্ঞানীরা। ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণায় রত বিজ্ঞানীরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এক নূতন রাজ্যের সন্ধান পেলেন, সেটি হ'ল পারমানবিক রাজ্য বা পারমানবিক জগৎ ; কারণ রাজ্যটি ক্ষুদ্র বা বিচ্ছিন্ন নয়, তার বিস্তৃতি সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে। সংখ্যায় অগণিত হলেও আয়তনে এক একটি একক (unit) এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণ-যন্ত্রের দ্বারাও তাদের দৃষ্টির গোচরীভূত করা যায় না। এই পরমাণুরাজ্যের মধ্যে কত যে রহস্য আছে তা আজও সম্পূর্ণ জানা যায় নি।

বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে তাদের কেন্দ্রকণাকে (nucleus) বলিষ্ঠ আঘাতে বিধ্বস্ত করতে হবে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রাদারফোর্ড সর্বপ্রথম বেগবান আলফা-রশ্মি (α-ray) দ্বারা নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকণাকে ভাঙতে সক্ষম হন। এই আলফা-কণা-প্রবাহ তিনি নিয়েছিলেন তেজস্ক্রিয় থোরিয়াম থেকে এর শক্তি ছিল ৫০ থেকে ৮০ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট। কিন্তু এই শক্তিও পারমাণবিক কেন্দ্রকণা ভাঙবার পক্ষে যথেষ্ট হ'ল না তাই কৃত্রিম উপায়ে অধিকতর শক্তিসম্পন্ন কণা উৎপাদনের চেষ্টা চলতে লাগল।

বর্তমান শতকে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পারমানবিক গবেষণার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর আবিষ্কৃত হয়েছিল পজিট্রন (positron) কণা যাকে ইলেকট্রনের যমজ-ভাই বললে চলে কারণ একটি পজিট্রন নির্গমনের সঙ্গে সব সময়ে একটি ইলেকট্রন উৎপন্ন হয়, ভর ও তড়িৎ আধান উভয়েরই এক কেবল আধানটি বিপরীত অর্থাৎ পজিটিভ (+e)। এই কণাটি অত্যন্ত স্বল্পায়ু অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। ঐ বৎসরেই আবিষ্কৃত হ'য়েছিল পারমাণবিক বোমা-উৎপাদনের প্রধান হাতিয়ার নিউট্রন (neutron), এ'ছাড়া আবিষ্কৃত হ'ল বৈদ্যুতিক কণাত্বরায়ক যন্ত্র (Electrostatic Linear Accelerator) এবং সাইক্লোট্রোন (cyclotron), যে যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র ও তড়িৎ ক্ষেত্র উভয়ে ক্রিয়া করে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরনেষ্ট লরেন্স ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সাইক্লোট্রোন যন্ত্রটির পরিকল্পনা করেন ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সেটি চালু করেন। এই অবদানের জন্য অধ্যাপক লরেন্স ১৯৩৯ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। সাইক্লোট্রোন যন্ত্র পারমানবিক গবেষণার আধুনিকতম শক্তিশালী হাতিয়ার, বহুমুখী এর প্রয়োগ। বর্তমানে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্য এই যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে।

সাইক্লোট্রোন দ্বারা তড়িতাহিত কণাকে ত্বরান্বিত করা যায় যথা প্রোটন, ডয়টেরন, আলফারশ্মি ইত্যাদি। যন্ত্রটির নক্সা ও কার্যপ্রণালীর মধ্যে অধ্যাপক লরেন্সের মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়। তড়িৎ-ত্বরায়ক বা Electrostatic Linear accelerator, যা ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এখনও ব্যবহৃত হয় তার দৈর্ঘ্য অত্যধিক (এক মাইলেরও বেশী)। সেই কারণে তাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করা কঠিন। সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে কেন্দ্রস্থিত S হইতে নির্গত তড়িতাহিত কণাপ্রবাহ শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বার বার বৃত্তাকার পথে পরিচালিত হয় ও যথাসময়ে ত্বরান্বিত হয়, এইজন্য যন্ত্রটির নাম সাইক্লোট্রোন। যন্ত্রের মধ্যে থাকে দুটি মুখোমুখি D আকৃতির বায়ুশূন্য ধাতব প্রকোষ্ঠ। দুটি D-র সংযোগে যন্ত্রটির মূল অংশটি একটি

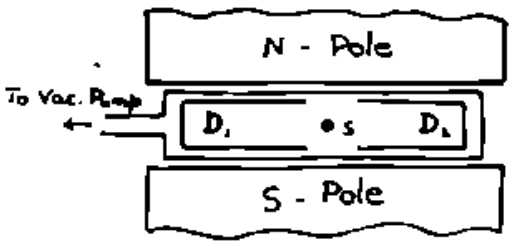

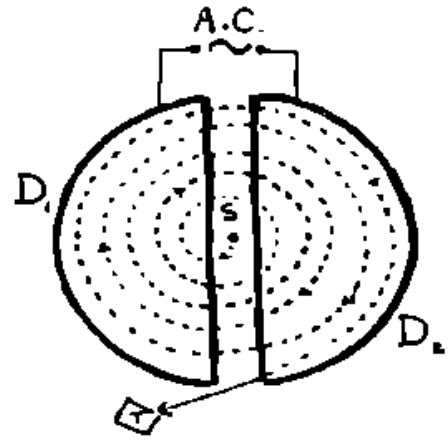

বৃত্তের আকার ধারণ করে। আকৃতির বৈশিষ্ট্যের জন্য এই দুটি প্রকোষ্ঠকে D_1, D_2 নামে অভিহিত করা হয়। D_1 ও D_2র মাঝখানে একটু ব্যবধান থাকে যার মধ্যে একটি অত্যন্ত

শক্তিশালী পরিবর্তী বিভব (A. C. Voltage) এমনভাবে ক্রিয়া করে যে কণাগুলি ঐ ফাঁকে আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্বরান্বিত হয়। গতিবেগ যখন কম থাকে কণাগুলি ক্ষুদ্রাকারে বৃত্তপথে আবর্তিত হয়, ত্বরান্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ যেমন বাড়তে থাকে কণাগুলিও সেই অনুপাতে বৃহত্তর বৃত্তপথে চালিত হয় যার ফলে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোন বৃত্তের উপর একবার ঘুরতে এদের একই সময় লাগে আর সেই কারণে সকল কণাস্রোত একই সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ত্বরান্বিত হয়। প্রয়োজনীয় গতিবেগ সঞ্চয় করার পর কণাপ্রবাহ এই যন্ত্র থেকে নির্গত হয়। এই যন্ত্রদ্বারা এই সকল কণাকে সেকেণ্ডে সাড়ে তিন হাজার মাইলেরও বেশী গতিবেগ দেওয়া সম্ভব হয়, এই গতিবেগে চললে সারা পৃথিবীকে সাত আট সেকেণ্ডে একবার পরিক্রমণ করা যায়। প্রচণ্ড বেগবান কণার থাকে প্রচণ্ড গতিশক্তি যার ফলে তারা বুলেটের মতো ধাবিত হয়ে লক্ষ্যবস্তুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে তাদের ভেঙ্গে ফেলে।

সাইক্লোট্রোন-নির্গত কণা-প্রবাহের দ্বারা আঘাত করে পরমাণুলোকের বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক অনুমান করেছিলেন যে যত মৌলিক পদার্থ এতাবৎকালে আবিষ্কৃত হয়েছে তাদের অপেক্ষা ভারী পরমাণু আছে যেমন ১১৬, ১২৪, ১২৬ পারমাণবিক সংখ্যার মৌল আছে, সাইক্লোট্রোনের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে এই পরমাণুগুলি তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

পারমাণবিক গবেষণায় এই যন্ত্রটি নানা কাজে ব্যবহার করা যায়। আমরা তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের (Radio active isotope) কথা জানি, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং কৃষি ও শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এদের বহুল ব্যবহারের কথাও আমরা শুনেছি। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক ক্যানসার জাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় কার্যকরী; এ ছাড়া ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজে এর ব্যবহার আছে। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকের সাহায্যে অধিক ফলনশীল বীজ তৈরী করা যায়, ট্রেসার-যন্ত্র (tracer) এর দ্বারা কাজ করে। এই সকল সমস্থানিক সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে উৎপাদন করা যায়। Deep X-ray therapy বা অধিকতর ভেদ্যতা সম্পন্ন রঞ্জন রশ্মির প্রয়োগে টিউমার প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়, এই সকল ক্ষেত্রে সাইক্লোট্রোন নির্গত কণার আঘাতে উৎপন্ন পাই-মেসন (π-meson) বা পায়ন (pion) রশ্মি রঞ্জন রশ্মি অপেক্ষা ভাল কাজ করে। শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাইক্লোট্রোনের ভূমিকা X-rayর মত। যন্ত্রপাতির আভ্যন্তরীন গঠনের ত্রুটি অনুসন্ধানের কাযে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য সাইক্লোট্রোন একটি অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র। বিগত ১৬ই জুন ১৯৭৭ সাল, কলকাতায় বহু আকাঙ্খিত এই যন্ত্র, বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন কণা উৎপাদনকারী সাইক্লোট্রোন (Variable Energy Cyclosron বা V E C) চালু হয়েছে। ভারতবর্ষে প্রথম সাইক্লোট্রোন যন্ত্র বসানো হয়েছিল কলকাতা সায়েন্স কলেজে স্বর্গত বিজ্ঞানী প্রফেসর মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায়। দ্বিতীয়টি আছে চণ্ডীগড়ে, সেটি আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের দান হিসাবে পাওয়া গিয়েছিল। এই বৎসর ভাবা পারমাণবিক গবেষণা সংস্থায় (Bhabha Atomic Research Institute) উদ্যোগে ভারতের তৃতীয় ও বৃহত্তম সাইক্লোট্রোনটি প্রতিষ্ঠিত

হ'ল প্রায় নয় কোটি টাকা ব্যয়ে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ন্যূনাধিক কুড়িটি সাইক্লোট্রোন যন্ত্র আছে। যাতে স্বল্প ব্যয়ে ছোট ছোট সাইক্লোট্রোন দেশের বিভিন্ন স্থানে বসানো যায়, বর্তমানে এই চিন্তা অনেকেই করেছেন। সাইক্লোট্রোন চালু হবার পর অধ্যাপক লরেন্স এবং অন্য করেকজন বিজ্ঞানী এই যন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করেছেন যার ফলে syncho-cyclotron Cosmotron, Bevatron ইত্যাদি যন্ত্র তৈরী হয়েছে, এই সব যন্ত্র দ্বারা কয়েক বিলিয়ন (শতলক্ষ) ইলেকট্রন ভোল্ট-শক্তিসম্পন্ন কণা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে।

এই সকল যন্ত্রের সাহায্যে ভাঙ্গাগড়ার কাজে নূতন নূতন পারমাণবিক কণার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। দুজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রিচার ও টিং স্বতন্ত্রভাবে নূতন মৌলিক কণা আবিষ্কার করে ১৯৭৬ সালে নোবেল-পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে রিচার সাই কণা (psi-particle) আবিষ্কার করেন, বিজ্ঞানী টিং এই সময়েই তাঁর গবেষণার ফলে এই কণার অস্তিত্ব দেখেন এবং একই কণার নাম দেন জে-কণা (J-particle) একদিন এক বিজ্ঞানী-সম্মেলনে উভয়ের সাক্ষাৎকার ঘটে। সেখানে টিং রিচারকে বলেন "Ritcher, I have some interesting Physics to tell you", শুনেই রিচার বললেন "Sam, I have some interesting Physics to tell you." উভয়ের একই বক্তব্য তাঁরা নূতন মৌলকণা আবিষ্কার করেছেন। Psi_3 J কণার অস্তিত্ব ঘোষিত হ'ল। এর পরে ১৯৭৭ সালে আরও একটি নূতন কণা, আপসিলন (upsilon) আবিষ্কৃত হয়েছে। জে-সাই কণা প্রোটনের প্রায় তিনগুণ ভারী, আপসিলন প্রোটন অপেক্ষা ১০ গুণ ভারী। বর্তমানে পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এই সব নব আবিষ্কৃত কণা আর একটি নূতন sub-nuclear গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত যা আজও অনাবিষ্কৃত ; অতএব এগিয়ে যেতে হবে। "চরৈবেতি।"

॥ প্রজ্ঞার পক্ষে ॥

ডক্টর হরপ্রসাদ মিত্র

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী'—এই প্রথম তিনখানি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন, সেই সময়ে ইংরেজীতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ তাঁর 'কালচার অ্যাণ্ড অ্যানার্কি'-বইয়ের ভূমিকাতে লেখেন যে, পুরোনো খ্রীষ্টধর্মের নীতিবচন যা এককালে বেশ জনপ্রিয় ছিল—সেই বিশপ উইলসনের আবেদন তখন ক্ষীণ হয়ে গেছে। ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ সেই ভূমিকাতে অতঃপর জানান যে, তাঁর ঐ নিবন্ধমালাতে তখনকার চিন্তা ও আচরণের দুর্যোগ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্যেই 'কাল্‌চার' বা সংস্কৃতির পক্ষে তিনি আলোচনা করবেন —কারণ, 'কাল্‌চার' মানেই সার্বিক সংশুদ্ধির পরাকাষ্ঠা। তাঁর নিজের কথায়—"A pursuit of our total perfection by means of getting to know, on all the matters which most concern us."। তাঁর চোখে এই প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয়ের জ্ঞানার্জনই 'ধর্ম' বলে মনে হয়। এই জ্ঞানযোগের ফলেই মনের স্বাধীন সংস্কারমুক্ত বিকাশ সম্ভব। যান্ত্রিক-ভাবে গতানুগতিক 'virtue' বা পুণ্যনীতি অনুসরণের চেষ্টা ক'রে লাভ নেই। এবং যে সংস্কৃতিচর্চার প্রস্তাব তিনি তুলেছিলেন, সে কোনো বাইরের ব্যাপার নয়—"And the culture we recommend is, above all, an inward operation."। তাঁর এই আলোচনায় বারবার ধর্ম বা 'রিলিজনে'র প্রসঙ্গ দেখা দেয়। যুক্তিবিচার বা 'রীজন্'-এর প্রসঙ্গও ওঠে। আমেরিকা রিলিজন সম্পর্কে বিশেষ মাথা ঘামায়নি সেকালে—এই প্রচলিত ধারণা সম্বন্ধেও তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য ছিল। রেনানের (Mr. Renan) এবং ব্রাইটের (Mr. Bright) যথাক্রমে পক্ষপাত ছিল ধর্মের দিকে এবং রাজনীতির দিকে। আমেরিকা সম্বন্ধে আর্ণল্ড্ এই দুজনেরই ধারণা উল্লেখ করেন। আধ্যাত্মিকতা যে কাল্‌চার-এর বিশেষ লক্ষণ এবং সে-আধ্যাত্মিকতা যে ঐহিক মানব-জীবনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের প্রতি উদাসীন নয়, একথাও তিনি জানান। শুধু গ্রীক-ল্যাটিনের জ্ঞানার্জনের নাম 'কাল্‌চার' নয়। শুধু বিভিন্ন বিদ্যার কৌতূহল নয়। ম্যাথ্যু আর্ণল্ড্ বল্‌তে চেয়েছিলেন যে, কাল্‌চার হোলো সর্বাঙ্গীণ শ্রেয়ত্বের প্রতি মমতা—love of perfection.

বার্ট্রান্ড্ রাসেলের 'নিউ হোপস্ ফর এ চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড্' বেরোয় ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের ঐ আলোচনার প্রায় আশি বছর পরে—১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে দুনিয়া অনেক তাড়াতাড়ি বদ্‌লে গেছে। কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব কমেনি। রাসেলের ঐ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের নাম—'মডার্ণ পারপ্লেক্সিটিজ্'—অর্থাৎ আধুনিক যুগের চিন্তাসংকট। একালের মানুষের মানসিক অস্বস্তির এই বিশ্লেষণ পাওয়া যায় সেখানে—তিন দিক থেকে তিনি বিষয়টি অনুধাবন করেছেন—১) মানুষ এবং প্রকৃতি, ২) মানুষে-মানুষে সংঘর্ষ, ৩) ব্যক্তিমনের অন্তর-বিরোধ।

এই দুরবস্থার কুয়াশা কাটাতেই হবে—এই ছিল রাসেলের সংকল্প। এই তিন দিকের চিন্তা থেকেই ভাবনা এগিয়েছে তিন দিকে—১) জড়বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতাই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ ঘটাচ্ছে ; ২) রাজনীতি আর অজীভাব মানুষে-মানুষে বিরোধের কারণ ;

৩) ব্যক্তিমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ইতিপূর্বে এবং এ-পর্যন্ত ধর্মনীতির দ্বারা নিরাময়ের চেষ্টা ঘটেছে, কিন্তু একালে এমন অনেকেই আছেন, যারা বলেছেন মনোবিশ্লেষণের সাহায্যে এই সংকট দূর করা যায়,—যদিও রাসেলের নিজের তাতে সন্দেহ ছিল—"but I doubt whether these methods unsupplemented can supply all that is needed"।

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই তিন-ধারার ইঙ্গিত পরিস্ফুট ক'রে তিনি লিখে গেছেন যে, মানুষের নিজের-নিজের ভেতরকার বিরোধই প্রত্যেককে চেষ্টা ক'রে কাটাতে হবে। সবরকম সংগ্রামের অবসান হোক্ সর্বব্যাপী সৌষম্যচেতনায়—অর্থাৎ 'হার্মনি'-তে। প্রকৃতির প্রতিকূলতাই মানুষকে প্রকৃতির গোপন ও নিহিত সত্যের অধিকারী ক'রেছে। ফলে, যুদ্ধ নয়, সহযোগিতা চর্চা করতে হয়েছে মানুষকে। সেই সহযোগিতার গুণেই মানুষ সেই সৌষম্যচেতনায় পৌঁছেচে। অন্নবস্ত্রের ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন প্রকৃতি। যতক্ষণ সকলের প্রয়োজনীয় অন্নবস্ত্র সকলের না জোটে, ততক্ষণই এই অশান্তি চলবে। বৈষম্য, শ্রেণীগত সুবিধাভোগ—এসব ব্যাপারই সুখ-শান্তির কাঁটা। তাই ব্যাপক সহযোগিতা, সমবায়নীতি ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ শ্রেণীসুখ বিদায় নিলেই শোষক-শোষিতের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

তবু: কিন্তু, তারপরে কি? তারপরে, রাসেলের কথায়—আমাদের পাপবোধটাও তাড়াতে হবে। প্রথম অধ্যায়েই তিনি এই পাপের কথা তুলেছিলেন। সেইসূত্রে 'ধর্মের' প্রসঙ্গ ওঠা স্বাভাবিক। তিনি ধার্মিকের সংজ্ঞা বা বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—নিয়ত প্রলোভন ও প্রবৃত্তি-তাড়নার দ্বারা বেষ্টিত থেকেও—এবং পাপের টানে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েও প্রায় অতিমানবিক ইচ্ছাশক্তির গুণে সরল সংকীর্ণ ক্ষুরধার পথে হেঁটে যেতে-যেতে যিনি পথের দুপাশে অন্যান্য যারা কামনার ফুল ছিঁড়তে ব্যস্ত, তাদের নিকৃষ্ট জীব মনে ক'রতে পারেন, তিনিই যথার্থ ধার্মিক। প্রচলিত কথায় আমরা জানি, যা আমাদের ধারণ করে, তাকেই বলা হয় 'ধর্ম'। রাসেল বিষয়টি আরও সংহত ক'রে দেখিয়েছেন যে, নিম্নপ্রবৃত্তিও তো অনেককে ধারণ ক'রে থাকে। চোরের ধর্ম চুরি করা, লম্পটের ধর্ম লাম্পট্য, নেশাখোরের ধর্ম নেশা করা—এভাবে 'ধর্ম' বোঝা চলবে না। তাহলে রাসেলের পূর্বোক্ত চিন্তায় ধর্মের পথ সত্যিই প্রবৃত্তির হাতে গা ঢেলে দেওয়া নয়। ধর্মের পথ সত্যিই ক্ষুরধার। কিন্তু 'পাপ'বোধ ব্যাপারটা আর-এক কাঁটা।

রাসেলের এই ইঙ্গিতটি আগে বুঝে নেওয়া দরকার যে, 'ধর্ম'-কে ঐভাবে দেখলে—'In this conception, virtue is difficult, negative and arid.'। এখানে বাংলায় যাকে 'ধর্ম' বলা হোলো, সে ঐ 'virtue'-রই অনুবাদ—এবং আমাদের 'ধর্ম' কথাটায় religion, virtue—এ দুটোই ধ'রে যায়। রাসেল বলেন—যদি পুণ্য বা ধর্ম অর্থাৎ virtue-র মানে এই ধরা যায় যে, আমাদের মরদেহের সত্তাবোধের স্বাভাবিক ঘাত বা আবেগ বা impulse-গুলোকে পরিহার করবার জন্যে সব সময়েই কোমর বেঁধে থাকতে হবে, তাহলে জীবন বড়োই নীরস শুকনো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় না কি? আমাদের 'পাপ'-বোধ হয়তো এই ধরণের অতি-নৈতিক নিত্যপীড়িত মানসিকতার—অর্থাৎ tension-এর উপহার।

রাসেল লিখেছেন—'The good life, as I conceive it, is a happy life. I do not mean that if you are good, you will be happy ; I mean that if you are happy, you will be good. Unhappiness is deeply implemented in the souls of most of us."। একথার প্রতিবাদ কি সম্ভব ?

কিন্তু সুখের জন্যেই সংযম দরকার। সেকথা কেবল ভারতবাসীরই কথা নয়, চিন্তাশীল বিশ্ববাসীমাত্রেই তা মানবেন। নেশার সুখ সুখ নয় ; প্রবৃত্তির তাড়নায় যে-সুখের সন্ধানে ছট্‌ফট্ ক'রে কেউ কেউ ক্ষণস্থায়ী তৃপ্তি পেয়ে থাকেন, তাও স্থায়ী সুখ নয়। 'সুখ' বল্‌তে সাধারণতঃ আমরা যা বুঝি, তা খুবই ক্ষণিক—এবং নেশামাত্রেরই অবসাদ অনিবার্য। রাসেল লিখেছেন—"How many people we all know who go through life apparently gay, and who yet are perpetually in search of intoxication whether of the Bacchic kind or some other. The happy man does not desire intoxication".

অর্থাৎ, মানুষ যা চায় সেটা সত্যিই তুচ্ছ 'সুখ' নয়। যে দেশ যথার্থ আত্মবোধের শিক্ষায় বঞ্চিত, সে-দেশ বা সে-জাতি সুখের তত্ত্ব জানবে কি ক'রে ? গ্রন্থিবন্ধনে সুখ নেই। যা আমরা চাই, সে তো বন্ধনও নয়, উচ্ছৃঙ্খলতাও নয়। ধম্মপদে বলা হয়েছে—'পরিলাহো ন বিজ্জতি'—তার কোনো প্রদাহ নেই ; বলা হয়েছে হাঁসেরা যেমন যাযাবর,—আহার শেষ হলেই তুষ্ট তৃপ্ত মনে জলাশয় ত্যাগ ক'রে উড়ে যায়,—'হায়, হায় আমার জল, আমার জলাশয়, আমার উৎপল এখানে পড়ে রইলো'—এরকম কোনো খেদোক্তি থাকে না তাদের,—প্রজ্ঞাবান মানুষও সেই রকম অনাসক্ত। সুখের নেশা নেই তাঁর। বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে—প্রজ্ঞাহীনের ধ্যান কোথায় ?—অ-ধ্যানীরই বা প্রজ্ঞা কোথায় ? যাঁর ধ্যান ও প্রজ্ঞা দুই-ই আছে, তিনিই নির্বাণের সমীপস্থ—

নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স পঞ্ঞা নত্থি অঝায়তো,
যস্মি ঝানং চ পঞ্ঞা চ স বে নিব্বাণসন্তিকে।

না, প্রজ্ঞা ও ধ্যান কোনো শুষ্কতার পথ নয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মিনিয়াপলিস্ শহরে ২৬শে নভেম্বর তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ পোরিপ্যাটেটিক ক্লাবে তাঁর বক্তৃতায় বলেন, ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মেই আরাধ্য ; হিন্দু তাঁকে পেতে চেষ্টা করে ভালবাসার পথে। ১৯০০ সালের ২০শে জানুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসাডেনা-শেক্‌স্‌পীয়র-ক্লাবে তিনি বলেন—ভারতবর্ষ এক তাজমহলে পরিণত বিশাল অট্টালিকার মতো। রোমের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্যবিস্তার,—গ্রীসের ছিল বুদ্ধিবৃত্তির ঐশ্বর্য,—ভারতের ধর্মাচরণ। অন্যান্য দেশে সংকট এসেছে,—তাদের মূল আদর্শ ভেঙেছে, কিন্তু ভারতে ঠিক সেরকম দুর্যোগ ঘটতে পারেনি,—তার কারণ ভারত ধর্মপ্রাণতা বিসর্জন দেয়নি। বেদের আগেও ভারতে সন্ন্যাস ছিল ; বেদেও সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। সন্ন্যাস মানে পৌরোহিত্য নয়। পুরোহিতের বৃত্তি আর পাঁচটা সমাজবৃত্তিরই অন্যতম। এই সভাতেই বিবেকানন্দ ভারতের এই দাবি পেশ করেন যে, বিশ্বকল্যাণের জন্যে সহযোগিতা চাই-ই—ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, সর্বত্র সমাজের সর্বস্তরে সহযোগিতাচর্চা ব্যতিরেকে সন্তোষ সম্ভব নয়। সেই বক্তৃতার বছর-ছয়েক আগে ১৮৯৪-এর কয়েকটি বক্তৃতায় নারীর প্রতি ভারতের শ্রদ্ধার

কথা তিনি আলোচনা করেন। ডেট্রয়েটে ছিলেন যখন, সে-সময়ে আমাদের জননীবোধের মহিমার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরাগের দিকটি তিনি ব্যাখ্যা করেন। ১৮৯৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সভায় তিনি জানান যে, খ্রীষ্টের উপদেশগুলির মূল পাওয়া যায় গৌতম বুদ্ধের বাণীতে।

স্বামীজী সেই সময়েই জানান যে, এ-দেশে যাঁরা গৃহী আর যাঁরা সন্ন্যাসী—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা চাই। তিনি এইসূত্রে এবং অন্যত্রও বলেছেন, পর্বত যদি মহম্মদের কাছে না আসে, তাহলে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন—'শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাইবে না?'—বলেছিলেন—'চাষীর ছেলে যদি বিদ্যালয়ে আসিতে না পারে, তাহা হইলে, কৃষিক্ষেত্রে অথবা কারখানায়—যেখানে সে আছে, সেখানেই তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।'

মহাবীরের মতন নিষ্ঠাবান কর্মী চেয়েছিলেন তিনি। শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর 'স্বামী-শিষ্য সংবাদে' ১৯০১ সালের দরোয়া আলাপের মধ্যে স্বামীজীর এই ভাবটির ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, নচিকেতার মতন দেশে দশ-বারোটি ছেলে পাওয়া যেতো যদি, তাহলে দেশের যথার্থ অভ্যুদয় ঘটতে পারে। সন্ন্যাসেই এই অসামান্য শক্তির সম্ভাবনা। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' অবশ্য তাঁর আগেই সন্ন্যাসীর বিশেষ এক ভূমিকা দেখিয়ে গেছে। এবং আরও আগে ছিল শিবাজীর ভবানী-পূজা।

স্বামী বিবেকানন্দের এই নচিকেতা-র আদর্শ বৌদ্ধ ভিক্ষুকের কথা মনে করিয়ে দেয়। ধম্মপদের প্রসঙ্গ সেই সূত্রেই মনে আসে—

সব্বসো নামরূপস্মিং যস্স নত্থি মমায়িতং,
অসতা চ ন সোচতি স বে ভিক্খূতি বুচ্চতি॥

—অর্থাৎ নামে বা রূপে যিনি অনাসক্ত,—যা অসৎ, তার জন্যে যার মন খেদহীন, ও অনুশোচনাহীন তিনিই হলেন ভিক্ষু।

গৌতমবুদ্ধের বাণী ও সাধনা,—বেদ-উপনিষদ রামায়ণের ও মহাভারতের শিক্ষা, খ্রীষ্টধর্মের মূল বিশ্ব-প্রেমের আদর্শ, ইস্‌লামের বিশেষ বিশেষ নীতি, শ্রীচৈতন্যের সাধনা,—তন্ত্রের পথ ইত্যাদি বিচিত্র ধর্মভাবনার সমন্বয় ও তুলনা বাংলায়—তথা সমগ্র ভারতে উনিশ শতকের প্রথম পাদেই সূচিত হয়। প্রজ্ঞা যে ব্যবহারিক জগৎ-নিরপেক্ষ কোনো আকাশকুসুম নয়,—ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেপরোয়া নয়,—শতকের প্রথমেই রামমোহন রায়ের বিচিত্র কর্মে ও চিন্তায় তা প্রতিভাত হয়। রামমোহন খুবই বিতর্কপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটেছিল নাকি ১৭৭৪-এ, সে গবেষণা তুচ্ছ নয়; কিন্তু ততোধিক যা লক্ষণীয়, সে হোলো তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যে অর্থাৎ ১৭৭২ বা '৭৪ থেকে তাঁর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধানের মধ্যে সভ্যজগতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে। পণ্ডিত ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতনা' নামে চটি বইটির প্রথম নিবন্ধে 'রাজা রামমোহন রায় ও যুগ-চেতনা'-তে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক তথ্য পরিবেশন করে

সহজ বাংলায় পূর্বস্বীকৃত এই মন্তব্যটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, আচার্য শঙ্করের বিচার-পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বে রামমোহন বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন ; জীবনকে মায়া বা মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেবার তথাকথিত বিলাসের তিনি মোটেই প্রশ্রয় দেননি। বিশ্বকল্যাণ এবং জাতীয়তাবোধ—এই দুয়ের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর আদর্শে। রামমোহনই প্রথম তুলনাভিত্তিক ধর্মালোচনার প্রবর্তক ছিলেন এবং য়ুরোপে যেমন ফ্রান্সিস বেকন, এদেশে তেমনি উনিশ শতকের প্রথমেই রামমোহন সংস্কারমুক্ত ধর্মসাধনার রাজসিক ধারাটি প্রবাহিত ক'রে গেছেন। এই ধর্মবোধ সমাজ, ভাষা, বিজ্ঞানচর্চা, রাজনীতি ইত্যাদি অর্জনীয় যাবতীয় জ্ঞান-কর্মের প্রেরণা দিয়েছে। বিদ্যাসাগর, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ সকলেই সেই প্রেরণার কুসুম। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের 'যত মত তত পথ', এই বাণীও মুক্ত দৃষ্টির পরাকাষ্ঠা। বুদ্ধিমার্গে রামমোহন যা পেয়েছিলেন, সারা উনিশ শতকের জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির পথে সেই বীজ থেকেই অভাবিতপূর্ব নতুন ভারতবোধ ও বিশ্বযোগের বিকাশ ঘটে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রেরণা থেকেই শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবন-কথার প্রবাহ ছড়িয়েছে—এ মন্তব্যও অলীক নয়। ভগিনী নিবেদিতা,—পণ্ডিচেরীর শ্রীমা—এঁরা এবং আরো অনেকেই ভারতের বেদান্ত আর তন্ত্র এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শন-বিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডের আশ্চর্য এক শক্তিরই তরঙ্গচ্ছটা।

প্রজ্ঞার পক্ষে এবং সরস সাধনার পথেই চলেছি আমরা। এই যাত্রাই তো প্রজ্ঞার পক্ষে —প্রজ্ঞার অভিমুখে যাত্রা। বেদান্ত-সম্পর্কিত আলোচনায় নানা কথার মধ্যে স্বামীজী যা বলেছিলেন, তার একটি কথা এই যে, ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রলয়বর্ণনার মন্ত্রে, বেদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আমরা বহিঃপ্রকৃতির মহান্ ভাবের বর্ণনা পাই বটে,—সে কিন্তু স্থূলেরই মহিমাবোধ। উত্তরকালে ঋগ্বেদের মহিমা থেকে আমরা হিংলোকে এলুম। কঠোপনিষদে এলো মৃত্যুজিজ্ঞাসা—বাহ্যজগৎ এই নিজের অন্তর্লোকে প্রবেশই প্রজ্ঞার অভিমুখে পদক্ষেপ। উদ্বোধন-কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ভারতে বিবেকানন্দ' [১৩শ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৫] থেকে বলা যাক্—'বেদান্ত' মানে কেবল অদ্বৈতবাদ নয়। বেদান্তী যাঁরা, তাঁরা 'প্রস্থানত্রয়' পড়ে, তবেই বেদান্তী হন।

●

॥ মুঘল-দরবারের চিত্রপরিচয় : প্রাক্‌কথন ॥

শ্রীদিবাকর সেনরায়

অজন্তার দেয়ালচিত্রাবলীর অঙ্কনকাল থেকে মুঘল-সাম্রাজ্য-পত্তনের অব্যবহিত পূর্বকাল-পর্যন্ত অঙ্কিত ভারতীয় চিত্রকলার বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গীর যে পটভূমি—সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে যা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তা হলো এই যে, ওই সময়কার চিত্রসৃষ্টিতে শিল্পীদের ব্যক্তিগত মানসিকতার তুলনায় সমষ্টিগত মানসিকতার প্রতিফলনই যেন বেশি মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। তৎকালীন চিত্রকরদের ধর্মীয় কিংবা গোষ্ঠিগত মনোভাবই সম্ভবতঃ এর প্রধানতম কারণ। সেকালের সামাজিক মানদণ্ডে চিত্রকরের মর্যাদা যে খুব উঁচুতে ছিলো—তা বলা যায় না; কারণ ইতিহাসের তথ্য অনুযায়ী চিত্রকর এবং অন্যান্য কারুশিল্পীরা সাধারণভাবে নিম্নবর্ণেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চিত্রকলার বিষয়বস্তুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচলিত লৌকিক অথবা পৌরাণিক কাহিনী থেকে আহরিত হতো; তাছাড়া চিত্রের তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে করণকৌশল এবং বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গীতে সারল্য ও স্পষ্টতা যতোটা প্রাধান্য পেতো, শিল্পীর মৌলিকতা কিংবা ব্যক্তিত্ব ততোটা প্রাধান্য পেতো বলে মনে হয়না। মুঘল রাজত্বকালের পূর্ববর্তী ভারতে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে রাজানুকূল্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে মহাবলীপুরম, কোনারক-এর সূর্যমন্দির কিংবা মৌর্যযুগের নিদর্শনগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাক্‌-মুসলিম-যুগের ভারতশিল্পকে মোটামুটিভাবে দুটি ধারায় ভাগ করা চলে। একটি ধারাতে পুরাণ ও প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর বিষয়বস্তু কিংবা ঘটনা বর্ণিত হতে দেখা যায়; অপর ধারাটিতে রয়েছে সম্প্রদায় (ধর্মীয়)-গত কাল্পনিক রূপকল্প, ভাবমূর্তি অথবা প্রতীকের চিত্রণ। প্রথম ধারার দৃষ্টান্তরূপে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য দেবদেবী এবং ওই দেবদেবীদের পরিবারবর্গ, অনুচর ইত্যাদি অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্মীয় কাহিনী-গুলোকে সাধারণের সামনে তুলে ধরে বিভিন্ন দেবদেবীদের মহিমা এবং শক্তির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা এই ধারাটিতে পরিস্ফুট; তাছাড়া এই ধারাটি পৌরাণিক কাহিনী-ভিত্তিক এবং বর্ণনামূলক হওয়াতে সাধারণের কৌতূহল সহজেই জাগ্রত করতে পারতো বলে মনে হয়।

দ্বিতীয় ধারাটি ছিলো প্রধানতঃ প্রতিমা ও প্রতীকাশ্রয়ী। ধর্মীয় কিংবা আধ্যাত্মিক বিষয় এই ধারার চিত্রকলায় অঙ্কিত হবার ফলে বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছেই এ-ধরণের চিত্রাবলী সমাদৃত হতো। ওই যুগের ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেছে সারনাথের বুদ্ধমূর্তি, এলিফ্যান্টার মহেশমূর্তি এবং চিদাম্বরম্‌-এর নটরাজ মূর্তিতে। এ-জাতীয় চিত্রকলার নিদর্শন বিধৃত হয়ে আছে অজন্তাগুহার দেয়াল-চিত্রাবলীতে।

অজন্তা-পরবর্তী যুগ থেকে মুঘল দরবারী যুগের সূত্র পর্যন্ত ভারতীয় চিত্রকলার ক্রমানুসারী ধারার সূত্র হিসেবে যে-নিদর্শন এ-যাবৎ পাওয়া গেছে—সংখ্যার দিক থেকে তা সুপ্রচুর বলা চলেনা। কিন্তু এদেশে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের বেশ কিছুকাল আগে থেকেই ভারতের সঙ্গে ইরাণ ও মধ্যএশিয়ার কয়েকটি দেশের বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যে অব্যাহত ছিলো—তার প্রমাণ রয়েছে। মুঘল-পূর্ববর্তী ভারতে সুলতানী-শাসনের আমলে অঙ্কিত যে-সব

চিত্রাবলীর সন্ধান এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে—তার মধ্যে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তালপাতায় চিত্রিত 'কালিকাযকথা' এবং 'কল্পসূত্র' নামে পরিচিত জৈন পুঁথিদুটোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে অঙ্কিত যে-সব পুঁথিচিত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে—তা থেকে একটা কথা স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, ওই দুই শতাব্দীকালের মধ্যে ভারতের উত্তরাঞ্চলে—বিশেষ করে গুজরাট, মালব, রাজস্থান, দিল্লী, আগ্রা এবং বিহারে পুঁথিচিত্রণ ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছিলো। এ-সব পুঁথিচিত্রের অধিকাংশই অঙ্কিত হয়েছে জৈন ধর্মের আখ্যানকে ভিত্তি করে। অবিশ্যি খৃষ্টীয় পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে দেখা যায়, বৈষ্ণব ধর্মের কাহিনী ও উত্তরভারতের পুঁথিচিত্রণে স্থান পেতে সুরু করেছে। এই সময় থেকেই 'রাগ-রাগিণী' চিত্রমালার অঙ্কনকার্যের সূত্রপাত ঘটে এবং বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যের বিষয়বস্তু চিত্রকলার অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে।

তৎকালে সুপ্রচলিত প্রণয়কাহিনী 'লাউরচান্দা' এবং 'চৌরপঞ্চাশিকা'র কাহিনী অবলম্বনেও বেশ কিছু চিত্র অঙ্কিত হয়েছিলো। এর পরবর্তী সময়ে ইরাণের ঐতিহাসিক প্রণয়কাহিনী এবং অন্যান্য কাহিনীর অনুসরণে এদেশের চিত্রকরেরা চিত্রাঙ্কন সুরু করেন। এ-ভাবে মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলায় পৌরাণিক ও ধর্মীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তে মানবিক বিষয়বস্তুর ক্রমশঃ প্রাধান্য পেতে লাগলো এবং ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রকলার একটি রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো।

খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে (জৈন শিল্পের নিদর্শনযুক্ত ইলোরা গুহার নির্মাণকাল) ভারতীয় দেয়ালচিত্র ও পুঁথিচিত্রণের ক্রমবিকাশের ধারাটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—ভারতের কয়েকটি কেন্দ্রে বিচ্ছিন্নভাবে দেয়ালচিত্র ও পুঁথিচিত্রণের ধারাটি বিকাশলাভ করছিলো। এ-সব কেন্দ্রগুলি ছিলো প্রধানতঃ গুজরাট, রাজস্থান, মালব, জৌনপুর, দিল্লী এবং পশ্চিম-দাক্ষিণাত্যে। একাদশ খৃষ্টাব্দে পালরাজাদের শাসনকালে অঙ্কিত পুঁথিচিত্রের যে-নিদর্শন পাওয়া গেছে—তা দেখে মনে হয়, ওই সময়ে বঙ্গদেশে ও পুঁথিচিত্রণের একটি স্বতন্ত্র কেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিলো। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় চিত্রকলায় ইরাণ ও মধ্যএশিয়ার প্রচলিত কাহিনী এবং লৌকিক জীবনের ছাপ পড়তে সুরু করে; খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের কাছাকাছি সময়ে ওই ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-সময়ে অঙ্কিত পশ্চিম ভারতের জৈন পুঁথিচিত্রের নিদর্শনে ইরাণের চিত্রকলা এবং সামাজিক জীবনের প্রভাবের যে-বৈশিষ্ট্যগুলো চোখে পড়ে, তা হলো: পুঁথি-চিত্রণে তালপাতার বদলে কাগজের ব্যবহার; রঙ-এর ব্যবহারে উজ্জ্বল লাল (vermillion red), আকাশী নীল (ultramarine blue) এবং সোনালীর (gold) প্রাধান্য, চিত্রের চারদিকে অলংকৃত 'বর্ডার' (border) অথবা 'পট্টির' প্রয়োগ, অঙ্কিত চরিত্রের মুখভঙ্গী, দেহভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ—এমনকি উষ্ণীষ এবং পাদুকার অঙ্কনে ক্রমবর্ধমান ইরাণী-প্রভাব। এথেকে এটাই বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সুলতানী শাসনের আমলে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে—মালব, জৌনপুর, দিল্লী, বিজাপুর ইত্যাদি প্রদেশে তৎকালীন সুলতানদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা অথবা নিকের্শ-এর অপেক্ষা ছাড়াও ভারতীয় চিত্রকলায় ইরাণী-প্রভাবের ছাপ ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো।

ভারতীয় চিত্রের বিষয়সংস্থাপনের (composition) ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিলো। চিত্রের বিষয়বস্তুতে একদিকে যেমন একক অথবা দুটি—কি তিনটি চরিত্রের বদলে অধিক সংখ্যক চরিত্রের সমাবেশ ঘটছিলো, তেমনই অপরদিকে ঘটছিলো পশুপক্ষী, গাছপালা—এমনকি পাহাড় ও নদীর অন্তর্ভুক্তি। ভারতীয় চিত্ররীতিতে ইরাণী ধারার প্রয়োগের স্পষ্ট নিদর্শন দেখা যাবে পূর্বে উল্লিখিত জৈন পুঁথিচিত্রণ 'কল্পসূত্রের' চিত্রাবলীতে। 'কল্পসূত্রের' একটি চিত্রে ইরাণের শাহী রাজার যে-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে—সেটি দেখে মনে হয় যেন তৈমুরিদ চিত্ররীতির একটি নিদর্শন থেকে ওইটি যথাযথভাবে তুলে নেওয়া হয়েছে। শাহী রাজার মোঙ্গল চরিত্র পরিস্ফুটনে মুখাবয়বের আদল, শরীরের গঠন, পোষাক, উষ্ণীষ—এমনকি পায়ের উঁচু ধরণের বুটজুতার চিত্রণে 'কল্পসূত্রের' চিত্রকর অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়েছেন। ভারতীয় চিত্রকলায় পশুপক্ষী, গাছপালা ইত্যাদির চিত্র পূর্বে যে অঙ্কিত হয়নি, তা নয়; কিন্তু ওগুলো আঁকা হতো ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যমূলক (stylised) কিংবা সাংকেতিক ধরণে। পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী সময়ে অঙ্কিত উত্তর ভারতের পুঁথিচিত্রণেও পশুপক্ষী কিংবা গাছপালার চিত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রে stylised, অথবা সাংকেতিক ধরণেই আঁকা হয়েছে। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে আমেদাবাদ, মাণ্ডু এবং জৌনপুরে অঙ্কিত কিছু কিছু-কিছু চিত্রে পশুপক্ষী ও গাছপালার চিত্রণে স্বাভাবিকত্ব অথবা বাস্তবরীতি-প্রয়োগের বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। মধ্যযুগের চিত্রকলায় বাস্তবরীতি-প্রয়োগের এই সুস্পষ্ট প্রমাণ ভারতীয় চিত্রকলার আলোচনায় এযাবৎ প্রচলিত একটি বিশ্বাসের মূলে অবশ্যই নাড়া দেবে—এই তথাকথিত প্রচলিত বিশ্বাসটি হলো—মুঘল-দরবারে আগত ইরাণী চিত্রকরেরাই ভারতীয় চিত্রকলায় সর্বপ্রথম বাস্তবরীতির প্রয়োগ ও প্রচলন করেন। অবিশ্যি এ'কথা স্বীকার্য যে, মুঘল-সম্রাটদের চিত্রকলার প্রতি সাগ্রহ-পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁদের দরবারে ইরাণী ও ভারতীয় চিত্রকরদের মিলিত প্রচেষ্টায় ভারতীয় চিত্রকলায় বাস্তবরীতি প্রয়োগের ধারাটি বিশেষভাবে উৎকর্ষলাভ করেছিলো। ইরাণীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদের এদেশে আগমণ এবং মুঘল সম্রাটদের দরবারে থেকে চিত্রচর্চার ফলে ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্রকলার স্তিমিত রূপ যে, নব-উদ্দীপনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিলো, তার প্রমাণ অবিশ্যি মুঘল-দরবারে অঙ্কিত কালজয়ী চিত্রাবলীর মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে। কিন্তু ভারতের মধ্যযুগীয় চিত্রকলার ওই উল্লিখিত স্তিমিত রূপের কারণ কি ?

মধ্যযুগে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় যে অস্থিরতার সঞ্চার হয়েছিলো—তার জন্যে দায়ী যে ক্রমাগত বিদেশী আক্রমণ, একথা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। এই বিদেশী আক্রমণের ফলে উত্তর-ভারতের প্রায় সর্বত্র যে-সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিলো—তার দ্বারা অনিবার্যভাবে এদেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পড়েছিলো। তৎকালীন উত্তরাখণ্ডের শিল্পকলার সামগ্রিক পটভূমিকায় যে-কৌতূহলজনক দিকটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে—তা হলো, চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের লক্ষণটি সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলেও অন্যান্য কারুশিল্পের অগ্রগতির ধারাটি কিন্তু মোটামুটিভাবে অব্যাহত ছিলো। মুসলিম আক্রমণের কিছু আগে থেকেই বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব যেমন ভারতে ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসছিলো—তেমনই হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের

পুনরুজ্জীবন ঘটছিলো। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এই পুনরুজ্জীবন প্রতিফলিত হলো শিল্পকলার ক্ষেত্রেও। ওই প্রতিফলনের সাক্ষ্য আজও বহন করছে এলিফ্যান্টা ও ইলোরার স্থাপত্য-ভাস্কর্য। মধ্যযুগের ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বহির্ভারতে সুদূর জাভার বরোবুদুর-এর মন্দির-স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে কালজয়ী নিদর্শন মুদ্রিত করে দিলো। কিন্তু চিত্রকলার ক্ষেত্রে তদানীন্তন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব চোখে পড়েনা। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শিল্প-ঐতিহাসিক পার্শি ব্রাউন যা বলেছেন, তা মূলতঃ এই : ১। গরম ও স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার জন্যে তালপাতায় কিংবা কাগজে আঁকা চিত্রাবলীর অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। ২। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী উগ্র ও অসহিষ্ণুদের হাতে পড়ে বেশ কিছু সংখ্যক চিত্র ধ্বংস হয়েছে। ৩। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই শিল্পকলার প্রতিটি বিভাগের অগ্রগতি যেমন পৃথিবীর কোনো দেশেই সময়ের গতির সঙ্গে অব্যাহত থাকতে দেখা যায়নি, ভারতের বেলায়ও তার অন্যথা ঘটেনি।

তাঁর উক্তির সমর্থনে পার্শি ব্রাউন খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অজন্তার দেয়ালচিত্র এবং উত্তর-ভারতের তৎকালীন ভাস্কর্যের তুলনা ক'রে বলেছেন : ওই সময়ে অঙ্কিত অজন্তার দেয়ালচিত্র যেমন দৃশ্যসংস্থাপনা, রঙ-এর নির্বাচন এবং রেখাঙ্কণে উৎকর্ষের চরমসীমায় পৌঁছে-ছিলো, সে-উৎকর্ষে পৌঁছুতে ভাস্কর্যের আরও এক শতাব্দী বেশি সময় লেগেছিলো।

মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলার আরও একটি বিশেষ দিকের প্রতি পার্শি ব্রাউন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে ভারতের সীমান্ত অঞ্চলের কোনো কোনো কেন্দ্রে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে শিল্পকলার বিকাশ ঘটতে দেখা গেছে। এর অন্যতম কারণ, ওই কেন্দ্রগুলো ছিলো নানান্ দেশের সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্র। এ'প্রসঙ্গে পূর্ব তুর্কিস্তান এবং তিব্বতের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পূর্ব-তুর্কিস্তানের খোটান অবিভক্ত মধ্যযুগে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক-সূত্রে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে খোটানে গ্রীক, ভারতীয়, ইরাণী এবং চীনা সংস্কৃতির মিশনের ফলশ্রুতি ওই সময়ের স্থানীয় দেয়ালচিত্র এবং রেশমীবস্ত্রে অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে। দেয়ালচিত্রের বৌদ্ধ-বিষয়বস্তুর অঙ্কনরীতি বিশেষভাবে অজন্তার দেয়ালচিত্রের সাদৃশ্যযুক্ত। তিব্বতের বিভিন্ন স্থানের দেয়ালচিত্রও অজন্তার কথাই মনে করিয়ে দেয়। খোটান-এর উল্লিখিত দেয়ালচিত্রের অঙ্কনকাল পার্শি ব্রাউনের মতে— আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। অজন্তার দেয়ালচিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত খোটান ও তিব্বতের দেয়ালচিত্রের নিদর্শন দেখে এ'কথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ওই দুই জায়গার (খোটান ও তিব্বত) দেয়ালচিত্র অঙ্কনে সম্ভবতঃ ভারতীয় চিত্রকরেরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত ভারতীয় চিত্রাবলীর নিদর্শন বিশেষ কিছু না পাওয়া গেলেও ওই সময়ে ভারতে চিত্রচর্চার ধারাটি যে অব্যাহত ছিলো—তা সহজেই অনুমান করা যায়।

মুঘলদের এদেশে আগমনের পূর্বে বিন্ধ্যপর্বতমালার উত্তর-ভূখণ্ডে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রাচীন আধ্যাত্মিকতার যোগসূত্রটি ক্রমশঃই ক্ষীণ হয়ে আসছিলো। এই সময়ে একদিকে যেমন ভক্তিবাদ এবং সুফিবাদের আবির্ভাব ঘটলো, তেমনই নির্গুণ সম্প্রদায়ের সন্তরা প্রচার করতে সুরু করলেন নতুন ধরণের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা। তৎকালীন সামাজিক এবং

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আধ্যাত্মিক নবজাগরণ অবশ্য বিশেষ কোনো স্বীকৃতি পায়নি। কারণ প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য এবং ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদে ওই ভক্তিবাদ, সুফিবাদ কিংবা নির্গুণ সম্প্রদায়ের সন্তদের বাণী বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে প্রাচীনের প্রতি মোহ তৎকালীন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে-স্থাণুত্বের সৃষ্টি করলো—তার ছাপ সে-কালের পুঁথিচিত্রণেও পড়লো। তাই এযুগের পুঁথিচিত্রণের সংখ্যার প্রাচুর্য যদিও বা দেখা যায়, চিত্রের বিষয়বস্তুর সংস্থাপন, রঙ-এর নির্বাচন কিংবা কলাকৌশলের প্রয়োগে কিন্তু নতুনত্ব বিশেষ কিছু চোখে পড়েনা। বরং কালক্রমে এ'যুগের চিত্রকলা পুনরাবৃত্তির দোষে দুষ্ট হয়ে উঠলো—বিষয়বস্তুর পরিবর্তে চিত্রে অলংকরণই হয়ে উঠলো মুখ্য। রাজানুকূল্য কিংবা তৎকালীন হিন্দু ও মুসলিম উচ্চারিত সমাজের কাছে যথাযোগ্য সমাদর অথবা স্বীকৃতি না পাবার জন্যে মধ্যযুগের ভারতীয় পুঁথিচিত্রণে নতুন সৃষ্টির প্রবাহ যখন প্রায় বন্ধ্যা, সেসময়েই মুঘল দরবারী চিত্রকলার আবির্ভাব ঘটেছিলো।

প্রাক্ মুঘল যুগে দিল্লী, গুজরাট কিংবা মালবে সুলতানদের দরবারে কোনো চিত্রকরগোষ্ঠী নিযুক্ত ছিলো কিনা—তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অঙ্কিত অধিকাংশ চিত্র তৎকালীন ধনী ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের ব্যক্তিগত অথবা সম্মিলিত পৃষ্ঠপোষকতায় অঙ্কিত হয়েছিলো। ওই চিত্রগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে এবং চিত্রগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অতি উজ্জ্বল রঙ—এমনকি সোনার গুড়ো (golden dust) প্রয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করে ঐতিহাসিকেরা উল্লিখিত মত পোষণ করে থাকেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত দুশো বছর ধরে ভারতীয় চিত্রকলায় দেশজ রীতির সঙ্গে ইরাণী চিত্ররীতির মিশ্রণের কাজটি ধীরে ধীরে চলছিলো। কিন্তু এই মিশ্রণের কাজ যে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় চিত্রকরদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিলো—একথা নিশ্চিত করে বলবার মতো ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়না। প্রাক্ মুঘল যুগে কোনো কোনো সুলতানের দরবারে চিত্ররচনার 'কারখানার' কথা জানা গেলেও, ওই সব 'কারখানায়' যে ভারতীয় চিত্রকরেরা স্বতন্ত্রভাবে অথবা ইরাণী চিত্রকরদের সহযোগিতায় চিত্ররচনায় নিযুক্ত ছিলেন—এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। অপরপক্ষে মুঘল সম্রাটেরা এদেশে রাজত্ব স্থাপন করে এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্বন্ধে মনোযোগী এবং বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। এর ফলেই সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো চিত্রকলার প্রতিও তাঁদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছিলো। তাছাড়া হুমায়ুন, আকবর এবং জাহাঙ্গীর—এঁরা তিনজনেই কেবলমাত্র যে চিত্রকলার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন, তাই নয়, চিত্ররচনায় শিক্ষালাভও করেছিলেন। চিত্রকলার প্রতি মুঘল-সম্রাটদের এই বিশেষ অনুরাগের জন্যেই তাঁদের দরবারে আহূত হয়েছিলেন ইরাণের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা। সম্রাটদের আহ্বানে কালক্রমে ভারতীয় চিত্রকরেরাও মুঘল দরবারে যোগ দিয়ে ইরাণী শিল্পীদের সঙ্গে একযোগে চিত্ররচনায় নিরত হলেন। মুঘল দরবারে এভাবেই দু'দেশের মিশ্রণের কাজটি সুরু হয়ে গেলো। সামগ্রিকভাবে ভিন্নিত ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় চিত্রকলার

ধারাটি নবাগত ইরাণী চিত্ররীতির সংস্পর্শে এবং প্রত্যক্ষ রাজানুকূল্যে পুনরায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। ভারতীয় চিত্রকলার মূল প্রবাহটি এবারে যে—নতুন নাম ধারণ করে সৃষ্টির বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে স্রোতস্বিনী হয়ে উঠলো—চিত্রকলার ইতিহাসে তা-ই 'মুঘল-দরবারী চিত্রকলা' নামে পরিচিত।

●

॥ সংঘ-বার্তা ॥

॥ শ্রীশ্রীশারদীয়াপূজা, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা ॥

বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পত্রিকামতে আগামী ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৭ বুধবার হইতে ২১শে অক্টোবর শুক্রবার পর্যন্ত শ্রীশ্রীশারদীয়াপূজা, ২৬শে অক্টোবর বুধবার শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও ১০ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাত্রিতে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে সর্বসাধারণকে উৎসবগুলিতে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হইতেছে।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে নবনির্মাণকার্য ॥

বিজ্ঞপ্তি

'গ্যালারি-সংলগ্ন লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য গ্যালারিযুক্ত লেকচার-হল্-এর উপরে (দ্বিতলে) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষরেও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারেও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারব্রতাকে জয়যুক্ত করবে। ইতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

●

গ্রন্থপঞ্জী :

১। Indian Painting (1960) by Percy Brown.
২। Mughal Court Painting (1975) by Dr. Niharranjan Ray.
৩। Promotion of Learning in India during Muhammadan rule (1916) by Dr. Narendra Nath Law.

মা দুর্গা কে ! তাঁর স্বরূপ কি !! তাঁর পূজার বিধান কি !!!

সকল প্রশ্নের সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উত্তর পেতে হলে আজই কিনে পড়ুন
বৈষ্ণবাচার্য ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম, এ, পি. এইচ. ডি, ডি. লিট মহোদয়ের

১। চণ্ডীচিন্তা—৪·০০ টাকা

২। মা দুর্গার কাঠামো—১·২৫ টাকা

ব্রহ্মচারী মহারাজের উপনিষদ ভাবনা (২য় খণ্ড) বের হয়েছে।

যোগাযোগের ঠিকানা :—

মহা উদ্ধারণ গ্রন্থালয়

৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪

নূতন গ্রন্থ ! প্রকাশোন্মুখ !

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

প্রায় ছয় মাসাধিক সাপ্তাহিক ক্লাশে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ 'কঠোপনিষৎ'-সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছিলেন শ্রীমতী চামেলী বসু, এম. এস. সি. ঐ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেন। বক্তৃতার ঐ আলোচনাগুলি এক্ষণে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে। সহজ-সরল ও সাবলীল ভাষায় কঠোপনিষদের শ্লোকগুলির যথার্থ তত্ত্বমুখী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ। দুই শতাধিক পৃষ্ঠাসম্বলিত ডবল-ক্রাউন সাইজের এই গ্রন্থ। গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে প্রখ্যাত শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্কিত নচিকেতা ও যমরাজের একটি চিত্র সংযুক্ত থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশিত হ'ল।

॥ বাণী ও বিচার ॥

(দ্বিতীয় ভাগ)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-রচিত 'বাণী ও বিচার'-গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীম-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-গ্রন্থের প্রথমভাগের অর্ধাংশ ও দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশের আলোচনা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এই দ্বিতীয়ভাগে স্থান পেয়েছে। অধ্যাত্ম-সাধনরহস্য, ধ্যান, ধারণা ও সমাধির রূপভেদ ও অন্যান্য বিষয়ের তত্ত্ব এবং বিশেষভাবে ওঁ-সম্বন্ধে বহু আলোচনাই এই দ্বিতীয় ভাগে দেওয়া হয়েছে।

তাছাড়া দ্বিতীয় ভাগে তিনটি পরিশিষ্ট স্থান পেয়েছে। (১) **প্রথম পরিশিষ্টে :** ব্রহ্ম, মায়া, জীব-জগৎ, বন্ধন, মুক্তি, সমাধির প্রকারভেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে শাঙ্করভাষ্য, ভামতী, বিবরণ, প্রকটার্থবিবরণ ও অন্যান্য বেদান্তগ্রন্থে যেভাবে আলোচনা আছে এবং ঐ সকল বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন তাদের তুলনামূলক একটি আলোচনা দেওয়া হয়েছে। (২) **দ্বিতীয় পরিশিষ্টে :** শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে যে সকল ভক্ত, শিষ্য ও সাধকগণ এসেছিলেন তাঁদের এবং সমসাময়িককালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে সকল সমালোচনা হয়েছিল তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উপদেশ ও বাণীর প্রকাশভঙ্গী, ভাষা ও উপমার পার্থক্য-প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

এই দ্বিতীয় ভাগে অন্তরঙ্গশিষ্যদের চিত্রছাড়া প্রাগের প্রখ্যাত শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক্-অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি অপ্রকাশিত তৈলচিত্রের প্রতিকৃতিও সংযোজিত হ'ল।

ম্যাপলিথো কাগজে সুন্দর ছাপা, ডিমাই সাইজ ও সুন্দর প্রচ্ছদপসহ—

মূল্য : ষোল টাকা

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী — মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী — মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী — মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী — মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা — মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ১৮·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহিত ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ১৫·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

ভারত আত্মার বাণী ৭·৫০
(ভারতের শাশ্বতবাণী বিশ্বমৈত্রীর কথা)

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ৪·০০
বীরত্বে বাঙালী ৩·৫০
বিজ্ঞানে বাঙালী ৭·৫০
বাংলার ঋষি ৭·০০
বাংলার মনীষী ৩·০০
বাংলার বিদুষী ৪·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৫·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য এম. এ. (ভবল্), পি. এইচ. ডি. (কলিকাতা বিশ্ব) কাব্য-পুরাণতীর্থ, পুরাণরত্ন, সাহিত্যবিনোদ এখন দৈনিক যুগান্তর, সত্যযুগ, শিলাদিত্য রবীন্দ্রভারতী, বিশ্ববাণী, বাসুদেব, প্রণব, আর্যদর্পণ, মন্দির, মহাদেব প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় রুচি-পরিশীলিত বিদগ্ধরচনায় এক প্রিয়-পরিচিত নাম। তাঁর মননরুদ্ধ দুই বিখ্যাত গবেষণাত্মক গ্রন্থ—১। **সংস্কৃত সাহিত্যের রূপলোক** (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—বাংলা ও সংস্কৃত অনার্স ও এম. এ. বিটি/বি. এড্-এর প্রয়োজনীয় পাঠ্য)

২। **মঞ্জরুল** এক বিস্ময় (নজরুল সাহিত্য সমীক্ষা)

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমতী অম্বু আচার্য, কালিন্দী, মেদিনীপুর
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন : ৩৫-২১৪৫

ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় আভিজাত্যমণ্ডিত পোষাকে আর
বইয়ের সৌন্দর্য বাড়ে—রুচিসম্মত বাঁধাইয়ের কাজে—যোগাযোগ করুন—

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন, ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভালবাসা	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	১০·০০
মরণের পারে	১২·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	০·৫০
যোগশিক্ষা	৭·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৬·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	৪·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	৪.০০	আত্মজ্ঞান (৩য় সংস্করণ)	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ (৫ম নূতন সংস্করণ)	৬·০০

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ		তীর্থরেণু (বর্ধিত ২য় সং)	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ যন্ত্রস্থ	
বিবেকানন্দের সাধনার মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ	১৬·০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	১২·০০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা	১০·০০	পত্রে উপদেশ	২·০০
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	১৫·০০
লোকগুরু অভেদানন্দ	২·৫০	স্বামী অভেদানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	১০·০০
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	১০·০০
গীতা		স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৮-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬।

নির্ম্মল লেখার জন্য

বিশিষ্ট সাংবাদিক
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন—
নির্ম্মল পেন ব্যবহার করে আমি
আনন্দিত হয়েছি। কার্য্যকরী তৈরী খুবই
মূল্যের এই ফাউণ্টেন পেন ছেলেমেয়েরা
স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারবে।

নির্ম্মল পেন

যাদুসম্রাট
পি. সি. সরকার বলেন—
আমি দীর্ঘদিন যাবৎ নির্ম্মল পেন
ব্যবহার করিতেছি এবং ব্যবহারে বিশেষ
সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই পেন ব্যবহারে সকলেই
যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন সে বিষয়ে
আমি নিঃসন্দেহ।

নির্ম্মল ষ্টোর্স
১, রামরতন মল্লিক লেন • মণিহারিপট্টি • বড়বাজার • কলিকাতা-৭

শিক্ষা নৈপুণ্যে ও আধুনিকতায়
আপনার স্থানীয় প্রতিষ্ঠান!
জে. এন. রায় এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জুয়েলার্স
৩৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট • কলিকাতা-৬

৺শ্রী শ্রী শারদীয়া পূজার
অভিনন্দন গ্রহণ করুন—

বি. কে. সাহা এণ্ড ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ

প্রসিদ্ধ চা ব্যবসায়ী

৫নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১

যদি বাসস্থানের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন :

কিভাবে বিদ্যুৎ ঘাটতির মোকাবিলা করবেন

খুবই দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে আগামী বেশ কিছুদিন এ রাজ্যে বিদ্যুৎ সংকট থাকবে। অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্যে সব রকম প্রচেষ্টা চালানোর সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিকে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়—সেদিকে নজর দেওয়াটাই ভালো।

কী ভাবে মোকাবিলা করবেন :

প্রথমত বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন। আলোর বাহার এবং আলোর প্রদর্শনী বন্ধ করুন। যতটা সম্ভব আলো বা পাখা বন্ধ করে দিন। বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ করুন এবং নিজের খরচ কমান। এই মূল নীতির ভিত্তিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করলেই বর্তমান পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দেওয়া যাবে।

অনুগ্রহ করে বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত জলের পাম্প, ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, ওয়াটার হীটার ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, কারণ এই সময়ে শিল্প-কারখানার জন্যে বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি দরকার।

আইন মেনে চলুন :

রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধগুলি দয়া করে মনে রাখবেন। সকাল ১০৩০ থেকে বেলা ১১টা এবং বিকাল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এয়ারকন্ডিশনার চালানো নিষেধ, অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ছাড় দিয়েছেন তাদের কথা স্বতন্ত্র। এছাড়া বিয়ে বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষ্যে নিয়ন, মার্কারী ল্যাম্প বা অন্যান্য উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বাতি জ্বালানোও নিষেধ।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

জাতীয়করণের পর
স্থায়িত্ব, নির্ভরশীলতা এবং দক্ষতায়
বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানী
এগিয়ে চলেছে

●

বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ডের প্রতিষ্ঠি
ওয়াগন এবং পয়েন্টস্ ও ক্রসিংস্ ; কয়লাখনি সংক্রান্ত যন্ত্রাংশ ; মোটর ও
রেলগাড়ির যাবতীয় স্প্রিং ; ক্রেন, স্ট্যাম্পিং ফর্জি ও প্রেসিং ;
বিভিন্ন ধরণের স্ট্রাকচারাল সরঞ্জাম ; ম্যুইস ভালভ ; ম্যাগনেসাইট
ফায়ার ক্লে সিলিকা এবং রিফ্রাকটরি ও অনুরূপ দ্রব্যাদি নির্মাণে

বার্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানী লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস
১০-সি হাজারহোর্ড স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৭
(ভারত সরকারের সংস্থা)

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধানসরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহের

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতত্ত্ব, শ্রীরামকৃষ্ণ (দুই খণ্ডে) ১৬·০০
ভগবৎ প্রসঙ্গ : ১ম পর্যায় (২য় সং) ৪·৫০
ভগবৎ প্রসঙ্গ : ২য় পর্যায় ২·০০
সত্য তেরেসা ও পূর্ণতার সাধন ১·৫০
ঈশ্বর-সান্নিধ্য যোগের সাধনা (৩য় সং) ২·০০

শ্রীশ্রীহেমেন্দ্র রায় জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ ··· ৩·৫০
স্তোত্র-মালিকা ··· ১·০০

ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের
সন্ধ্যামালতী (ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ২·০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির—৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা ২৫ এবং মহেশ লাইব্রেরী—২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ [• পুস্তকটি উদ্বোধন কার্যালয়—১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০০০০৩ এবং বেলুড় মঠ হাওড়াতেও পাওয়া যায়]

বাহির হইল

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও তৎপুত্র শ্রীশ্রীজীবন্তারতীর্থ কর্তৃক পরিদৃষ্ট ও ভূমিকাসহ

দেবী পুরাণ ॥ ২৮·০০
কালিকাপুরাণ ॥ ৩০·০০

প্রকাশের অপেক্ষায়
মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত
দেবীভাগবত ॥

॥ ইতিহাসের আকরগ্রন্থ ॥

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ॥

বাঙ্গলার ইতিহাস—১ম খণ্ড ॥ ১৬·০০
বাঙ্গলার ইতিহাস—২য় খণ্ড ॥ ১৬·০০
গৌড়রাজমালা—রামপ্রসাদ চন্দ ১০·০০
বাঙ্গলার ইতিহাস—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৫·০০
তাজের নিয়ের ভারত ভ্রমণ—
সুধা বসু অনূদিত ১৬·০০
Tribal History of Ancient India Rs. 100/-
Dr. Kalyan Kumar Das Gupta

তন্ত্র গ্রন্থাবলী
(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ)

কুলার্ণব তন্ত্র – ডঃ উপেন্দ্রকুমার দাস সম্পাদিত। ৩০·০০
ভূতডামরতন্ত্র—শ্রীরসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥ ৬·০০
তোড়লতন্ত্র—শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত ॥ ৬·০০
সরস্বতীতন্ত্র—শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ ॥ ৩·০০
ষট্‌চক্রনিরূপণ— ঐ ॥ ৪·০০
গুপ্তসাধনতন্ত্র — ॥ ৫·০০
অন্নদাকল্পতন্ত্র — ॥ ৬·০০
জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র—শ্রীসুকুমার চট্টরাজ ॥ ৪·৫০
তন্ত্রতত্ত্ব—শ্রীশিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রণীত ॥ ২৫·০০

॥ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য ॥

স্বামী বিবেকানন্দ—ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ২০·০০
সহাস্য বিবেকানন্দ—শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু ॥ ১৫·০০
ব্রহ্মানন্দ লীলাকথা—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য ॥ ৬·০০
প্রেমানন্দ প্রেম কথা ॥ ৬·০০

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত দুটি বই—

অপরাধ জগতের ভাষা—ডঃ ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ১৬·০০
অপরাধ জগতের শব্দকোষ ॥ ৬·০০

নবভারত পাব্‌লিশার্স ॥ ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯ ফোন-৩৪-১৪৪৬

সারদা-রামকৃষ্ণ

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও : যুগাবতার রামকৃষ্ণ-সারদাদেবীর জীবন আলেখ্যের একখানি প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ একটি মূল্য আছে।

বহুচিত্রশোভিত, বোর্ড বাঁধাই,

অষ্টম মুদ্রণ—১৪·০০

গৌরীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্যার অপূর্ব জীবনচরিত,

সন্ন্যাসিনী শ্রীদুর্গামাতা রচিত।

আনন্দবাজার পত্রিকা : ইঁহারা জাতির ভাগ্যে শতাব্দীর ইতিহাসে আবির্ভূতা হন। বহুচিত্রশোভিত, বোর্ড বাঁধাই, ষষ্ঠ মুদ্রণ—৮·০০

দুর্গামা

সন্ন্যাসিনী শ্রীসুব্রতাপুরী দেবী রচিত।

শ্রীসারদামাতার মানসকন্যার জীবনী

বেতার জগৎ : অপরূপ তাঁর জীবনলেখা, অসাধারণ তাঁর তপশ্চর্যা।···একবার অন্ততঃ পড়ে দেখা শুধুমাত্র বাঞ্ছনীয় নয়—এককথায় অপরিহার্য। বহুচিত্রে শোভিত, সুদৃশ্য বোর্ড বাঁধাই—১৪·০০

সাধনা

দেশ : সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ। বেদ, উপনিষদ, ভাগবত···প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি, বহু সুললিত স্তোত্র এবং তিন শতাধিক মনোহর···সঙ্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

প্লাষ্টিক কভারে, ষষ্ঠ মুদ্রণ—৬·০০

সাধু-চতুষ্টয়

স্বামিজী-সহোদর মনীষী শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের মনোজ্ঞ রচনা। তৃতীয় মুদ্রণ—৪·০০

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

২৬, গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

শ্রীসন্তোষের—ভগবদ্‌গীতা

প্রত্যেক শ্লোক ও সহজ বাংলা অনুবাদ। সহজ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। পুস্তকটির বিশেষত্ব অতি কঠিন শ্লোকের মর্ম সাধারণ গল্প-উপমা দ্বারা বুঝিয়েছেন। সুন্দর বাঁধাই; উপহারের বই। মূল্য ১২৲ টাকা (ডাক ব্যয় ২·৮০)।

সৃষ্টি ভগবান ও সাধনা

সৃষ্টি ভগবান ও সাধনা এই তিনটি বস্তুকেই লেখক বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সুন্দর বাঁধাই; উপহারের বই। ৮৲ টাকা (ডাক ১·৮০)।

শ্রীসন্তোষের—অমর স্মৃতি

মহাপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাতের অমূল্য বিবরণ ও তাঁদের বাণী। বিখ্যাত লেখকদের অপ্রকাশিত অমর স্মৃতি। গল্পের মতো রোমাঞ্চকর। পড়বার, পড়াবার, উপহার দেবার ও লাইব্রেরীতে রাখার মতো বই। ৪৫টি দুষ্প্রাপ্য ফটো। সুন্দর বাঁধাই। উপহারের বই। ১০৲ টাকা (ডাক ১·৮০)

এস. মুখার্জী এণ্ড কোং

৪৪, বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন : ২২-৪৯১১

অন্যান্য শাখা :—

বারাণসী (ফোন : ২৮৭৩)

কটক (ফোন : ৭১০)

With the best Compliments of

TEA BOARD

14, Biplabi Trailaky Maharaj Sarani
Calcutta-700 001

সকলের জন্যে আর একটি সঞ্চয়ের পরিকল্পনা

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা'র
জনতা
ক্যাশ সার্টিফিকেট

৫০ টাকার সার্টিফিকেট কিনুন
মাত্র ৩০ টাকা ১৫ পয়সায়

আপনার অর্থ সঞ্চয়ের বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা।
সঞ্চয়ের এক আদর্শ উপায়—তাড়াতাড়ি সুদের
ওপর সুদ। আপনি ৫০ টাকা, ৭৫ টাকা, ১০০ টাকা,
২৫০ টাকা আর ৫০০ টাকার সার্টিফিকেট পাবেন।
৩৬ মাস বা ৩১ মাসের পরে ভাঙাতে পারবেন। আপনি যা
দেবেন তার চেয়ে অনেক বেশি আপনাকে ফিরে দেবে।
* বিশদ বিবরণের জন্যে আপনার নিকটের কোনো
ব্যাঙ্ক অফ বরোদার শাখায় চলে আসুন।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা
(ভারত সরকারের ব্যাঙ্ক)

Shilpi-BOB 10A/78 Beng

শুভবিবাহে ও পূজার উৎসবে কালের
উপযোগী আধুনিক রুচিসম্মত
প্রাচ্যে অপূর্ব সুসম্পন্ন নবকল্পিত
সৌন্দর্যমণ্ডিত

বেনারসী

তসর, গরদ, মটকা, সিল্ক,
টিস্যু শাড়ী

জহরলাল পান্নালাল
অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-৭০০০১২
ব্রাঞ্চ : বেনারস, অমৃতসহর

Phone : 33-1609

With Compliments of :—

Chandra Kanta Manna & Co. (Private) Ltd.

IRON & HARDWARE MERCHANTS

Govt. Controlled Stockists for Iron and Steel

20, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,
CALCUTTA-7

With the best Compliments of :

ZENITH CERAMICS COMPANY (P) LTD.

Head Office :
7, CHITTARANJAN AVENUE,
4th Floor,
CALCUTTA-700 072
Phone : 23-5416
Gram : CHOTIKAR

Factory :
G. T. ROAD, BARWA.
DIST. DHANBAD

Phone { Office : 55-6621
Factory : 55-1861

With the best Compliments of :

LEONARD CARD-BOARD BOX FACTORY (P) LTD.

Art Printing, Card-Board Makers Corrugated Board & Box Manufacturers

Office :
29A, Aurobinda Sarani,
Calcutta-5

Factory
1-1, Galiff Street,
Calcutta-3

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

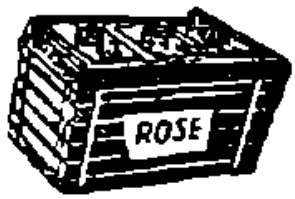

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

Telephone { 33-6030 / 33-6485

With Best Compliments :

JOSODALAL GHOSAL (P.) LTD.

CONTROLLED STOCKISTS OF IRON & STEEL

20, Maharshi Debendra Road,

CALCUITA-7

Phone : 34-7399

S. SARKAR & BROTHERS

72, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

ORTHOPÆDIC & DEFORMATIC APPLIANCES

Manufacturers of :

Artificial Limbs, Deformatic Shoes, Walking Calipers, Spinal Braces,
Lumber Corsets, Hernia Trusses, Abdominal Belts,
Cervical Collars Etc. Etc.

Specialist in ARTIFICIAL LIMBS

Phone No. 33-1626

BIDHU BHUSAN DUTT & CO. (P) LTD.

Regd. Office :

20, MAHARSHI DEBENDRA ROAD, CALCUTTA-7

Stockists & Agents :

TATA, IISCO, HINDUSTAN STEEL & ASBESTOS-CEMENT LTD.

All kinds of Everest Asbestos Sheets, Galvanised Sheets and Black plain Sheets are always available from ready stock. Prompt and Spacial attentions are given to our customers.

শতাব্দিক বৎসরের অভিজ্ঞতায়…

অক্ষয় কুমার লাহা

রং

১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

PHONE : 23-2765 GRAM : COLOURMAN

ফোন : ২২-৪৪৪৭

পি. রায় এণ্ড ব্রাদার্স

কোণারক ব্র্যাণ্ড সিমেণ্ট এজেণ্ট

সকল প্রকার রং, ইমারতী দ্রব্যের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬/৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

তেল না
ঘি না
পলকেই
রান্না

INSTANT COOKING RECIPE

LICENCE FROM ANOU P. MUKHERJEE

রূপচর্চ্চায়

কে.হোড়ের

প্রসাধনী

কে. হোড় এণ্ড সন্স

শারদীয়া অভিনন্দন :-

গোস্বামী এণ্ড কোং

১৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

গ্রাম
DYNOLIGHT

ফোন : { ২৩-৪৩৩৭
২৩-৭৭৪৭

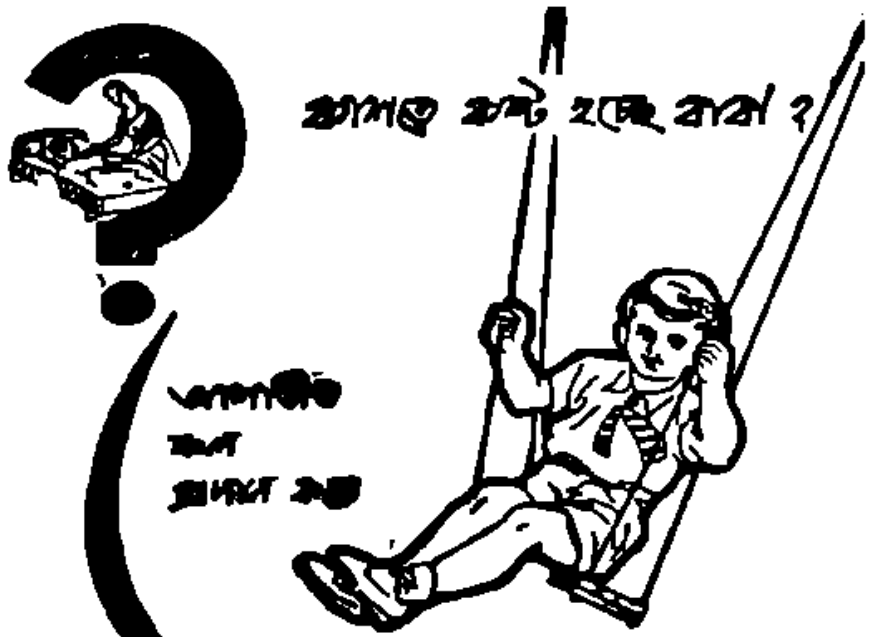

দুলালের
তালমিছরী

প্রস্তুতকারক
শ্রীদুলাল চন্দ্র দত্ত
১, বেনাড়া রোড, ভবিষ্যৎ-৩
ফোন : ০০-০০০০

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

GRAM : PURNIBRASH ESTD. 1930 PHONE : 33-4833

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECT' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES.
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি: ৬

ফোন: ৩৪- ৩৪১৯

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিবাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড

মিলে মিশে করি কাজ

বর্তমানে দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ-এর পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখার আওতায় সিন্দ্রী এবং নামরূপ কারখানা দুটি যৌথভাবে স্থানে সার উৎপাদন করে চলেছে। এছাড়া আমদানীকৃত সার সহ উপরে কারখানার কিছু সার আপাততঃ মধ্যপ্রদেশের জন্য এবং গোরক্ষপুরের কারখানার কিছু সার বিহারের জন্য পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া এদিকে আসছে দুর্গাপুর সার কারখানা।

কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অত্যাবশ্যক পণ্য নিয়ন্ত্রণ বিধির আওতায় পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন স্বীকৃত সমবায় সংস্থা, অনুমোদিত ডিলার। প্রতিষ্ঠান ও ডিপোগুলির মাধ্যমে ফার্টিলাইজার কর্পোরেশনের পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা সার বণ্টন করেন। এর মধ্যে ৫০% বা তাতোধিক পরিমাণ সার সরকারী সমবায় ও ডিলার প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিপণন বিধিবদ্ধ।

সরকারের এই ব্যবস্থা ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। আরো বড় কথা, এই সমন্বীকৃত কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামে সঠিক সময়মত সার পৌঁছানোর ব্যবস্থা সহজ হয়। তাই এখো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন, কো-অপারেটিভ আর ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিঃ এই তিনের যৌথ প্রচেষ্টায় বিকেন্দ্রীকৃত বিপণন ব্যবস্থা ছোট ছোট চাষি ভাইদের ও সুদূর গ্রামাঞ্চলে কৃষিকর্মে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ সহজ করে। পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আমাদের এই মিলিত কর্মসূচির মূল কথা, আমরা সর্বদা কৃষি মন্ত্রণালয় ও রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, ভাব ও পরিকল্পনা আদান প্রদান করে কাজ করি। অধিক ফলন কার্যক্রমে রাজ্যসরকারগুলির সহযোগিতা আমাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

দি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ
পূর্বাঞ্চল বিপণন শাখা
৪১, চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৬

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ

প্রস্তুতকারক

★

ভারত মেশিনারী

★

১১৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,

কলিকাতা-৭০০০৬৭

ফোন : ৩৪-১৬১৩

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

শান্তিরস সালসা

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে

রাত বেদনায় অব্যর্থ

সর্ব্ব ত্র প্রাপ্তব্য

৭০১/৭ এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চঃ-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

ঋষিতুল্য পেটেন্ট ঔষধ

ডাঃ সেনস্

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৯

'আর মিত্রের'

ময়ূর মার্কা

'তিল তৈল'

বিশুদ্ধ ও সুপরিস্রুত তিল তৈল হইতে প্রস্তুত।
ভারতীয় মিত্রায়ুর্বেদ অধিতীয়

আর্দ্ধ শতাব্দীর সুনামের উপর প্রতিষ্ঠিত

লেখার সাথী সুলেখা

স্পেশাল

আপনার কলমে আনবে
সাবলীল গতি

বিভিন্ন রংএ পাওয়া যায় :-
ব্লু-ব্ল্যাক • রয়েল-ব্লু
ব্ল্যাক • রেড্ • গ্রীণ্

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

ADMAN

লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

এসাড়কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্বচিকিৎসায়, বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩১৯)
শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অনূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ৮ টাকা।

সপ্তশতী রহস্যত্রয় মূল্য ৪ টাকা।

উভয় গ্রন্থ একত্রে ১২ টাকার স্থলে ১০ টাকা।

এস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

Syndicate Bank works to help people grow. Such of those people who need help to grow. Which is one reason why more and more people come to Syndicate Bank.

SYNDICATE BANK

Where Service is a Way of Life

(Wholly owned by the Government of India)

Head Office : **MANIPAL 576 119** (Karnataka)

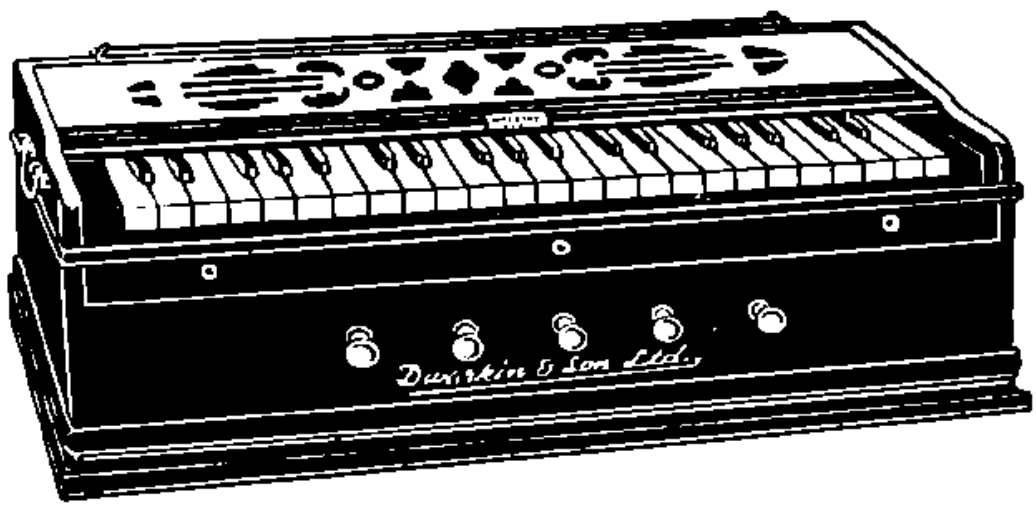

With Compliments of :

MEENU MASTER

LADIES & KIDDIES DRESS MAKER

★

3A/2, BRICK FIELD LANE,
CALCUTTA-700 039

THE ARTISAN

107/A, BEPIN BEHARI GANGULI STREET,
CALCUTTA-700 012
DESIGNERS, BLOCK MAKERS & PRINTERS

With Best Compliments of :

MONA LIZA

Tailors and Clothiers
Yogamaya Market

★

34, BIDHAN SARANI
CALCUTTA-700 006

THE NEW INDIAN PRESS

Quality Printers & Designers
6, Duff Street, Calcutta-700 006.

With the best compliments from :—

Ö SICERIN & BIVA

85B & C, Jatindra Mohan Avenue,
CALCUTTA-5

★

STOCKIST OF GLAXO PRODUCTS

&

MANUFACTURERS OF QUALITY FILTER PAPER

FOR

RESEARCH, INDUSTRY, EDUCATION.

Phone : 55-5893 Gram : FILTERORT

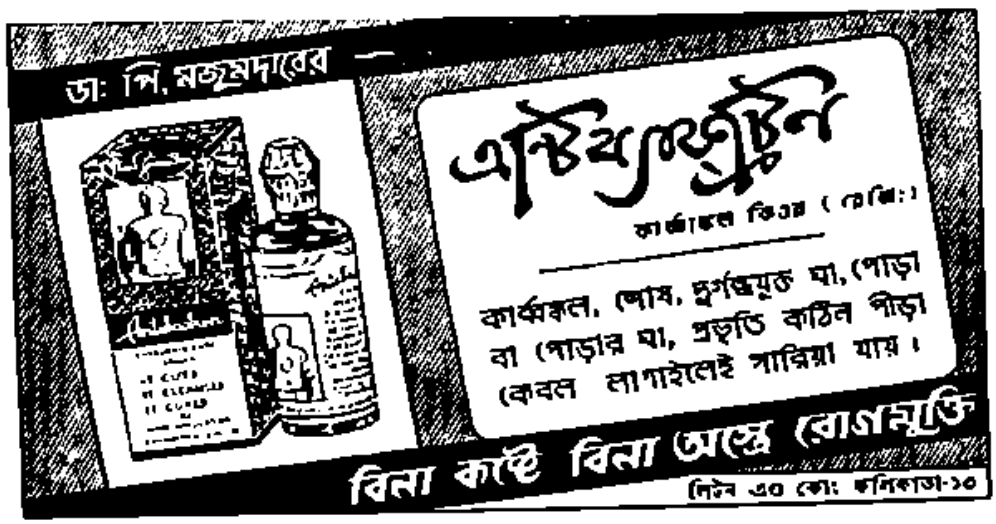

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মাস্থলী ইণ্টারেষ্ট ডিপোজিট স্কীম ও বিভিন্ন ডিপোজিট সার্ভিসেস আপনার সঞ্চিত ধনকে অটুট রাখতে সাহায্য করে

- কারেণ্ট একাউণ্ট
- হোম সেভিংস সেফ একাউণ্ট
- মাইনর্স সেভিংস একাউণ্ট
- ফিক্সড টার্ম ডিপোজিট
- রেকারিং ডিপোজিট
- ১২-মাসের রেকারিং ডিপোজিট
- রিটায়ারমেণ্ট বেনিফিট ডিপোজিট একাউণ্ট
- মাস্থলী ইণ্টারেষ্ট ডিপোজিট
- মনি-মাল্টিপ্লায়ার ডিপোজিট স্কীম

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

এদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন সফল করতে....
আজই আমাদের
ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনুন

হাসি-খুশি এই ছেলেমেয়েদের বড় হওয়ার স্বপ্ন সফল করার দায়িত্ব এদের বাবা-মায়ের। এদের সুশিক্ষা, বিবাহ, সুখ-সুবিধা সব কিছুই নির্ভর করছে এদের বাবা-মায়ের উপর। শুধু স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে নয়, আজকের সঞ্চয়-ব্যবস্থা দিয়ে গড়ে তুলুন আপনার ছেলেমেয়েদের কল্যাণের পথ আর তারই সঙ্গে আপনার পরিবারের সর্বাঙ্গীণ ভবিষ্যৎ-সংস্থান।

৫০০০ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২০ বছর পরে পাবেন	১০,০০০ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২৫ বছর পরে পাবেন
৩৬,৬৪০৲	১,২০,৫৭১৲

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭ বেড ফ্লর প্লেস, কলিকাতা-৭০০০০১। অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিসে

চেয়ারম্যান ও জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB/91/1

This stamp. Who and what for?

East India Pharmaceuticals— researching, formulating and marketing quality medicines for the millions, since 1936.

This stamp stands for East India Pharmaceutical Works' single-minded integrity and dedication in producing the most useful and modern medicines. Medicines that would suit the pocket of millions of our people.

That's EIPW. Started by a small group of committed doctors, scientists, chemists and pharmacists in 1936. Their mission ? To indigenously research on and formulate a wide range of medicines. And market these at moderate prices all over the country.

This mission has already proved a success.

East India Pharmaceutical Works Limited, Calcutta-16

East India Pharmaceutical Works work for you

হোমোটোন স্বাস্থ্য ও শক্তি গঠনে এক অপূর্ব টনিক

ক্যাসিনা সিরাপ প্রধানত অর্শ ও কাশির বিশেষ ঔষধ

আলফালফা টনিক রক্তাধিক পীড়ায়, অনিদ্রা ও প্রসবান্তে নির্ভরযোগ্য টনিক

টুথেক্ কিওর দাঁত ও মাড়ির যাবতীয় বিকার নিরাময় করে

চামিলা শিশুদের পেটের পীড়ায় অব্যর্থ

কিংকোপ আনিকা হেয়ার অয়েল কেশ রঞ্জনায় অদ্বিতীয়

কিং এণ্ড কোম্পানী

(হোমিও কেমিস্ট) (প্রাঃ) লিমিটেড

১৮৯৪ সাল হইতে জাতির সেবায় নিয়োজিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান।

প্রধান কার্যালয়ঃ

৯০/৬এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৭.

ল্যাবরেটরীঃ

৮৬, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২. ফোন ঃ ৩৪-২০০৬

GRACE/KINGS/77

With Compliments from :

HOWRAH MOTOR ACCESSORIES AGENCY (P.) LTD.

3/1, MANGOE LANE, CALCUTTA-700 001

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

		Rs.
1.	A study of Heliocentric Science	12·00
2.	An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00
3.	Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50
4.	Bhagavnd Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set	60·00
5.	Christian Science and Vedanta	
6.	Doctrine of Karma	9·00
7.	Divine Heritage of Man	
8.	Great Saviours of the World	
9.	How To Be A Yogi	10·00
10.	Human Affection and Divine Love	
11.	Ideal of Education	3·00
12.	India and Her People	12·00
13.	Life Beyond Death	15·00
14.	Memoirs of Ramakrishna	12·00
15.	Mystery of Death	
16.	Path of Realization	
17.	Philosophy and Religion	8·00
18.	Reincarnation	8·00
19.	Religion of the Twentieth Century	2·00
20.	Religion, Revelation and God	12·00
21.	Self Knowledge	12·00
22.	Science of Psychic Phenomena	8·00
23.	Spiritual Unfoldment	
24.	Swami Vivekananda and His Works	2·00
25.	The Bases of Indian Culture	75·00
26.	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
27.	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
28.	The Steps Towards Perfection	2·00
29.	The Vedanta Philosophy	
30.	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
31.	True Psychology	
32.	Universal Religion ahd Vedanta	12·00
33.	Yoga Psychology	16·00
34.	Yoga : Theory & Practice	7·50
35.	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

1.	Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3·00
2.	Swami Abhedananda-A Spiritual Biography	16·00
3.	Swami Abhedananda in America	6·50
4.	Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
5.	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

1.	A Historical Study of Indian Music	
2.	A History of Indian Music	15·00
3.	Christ the Saviour	2·00
4.	Historical Development of Indian Music	65·00
5.	Music of Nations	35·00
6.	Philosophy of Progress and Perfection	
7.	Sangitasara-Samgraha	7·50
8.	Schools of Indian philosophical Thought	45·00
9.	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
10	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00

SRI RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

Publication Department (Phone : 55-1800)

19B, Raja Rajkrishna Street

CALCUTTA-700 006

With best Compliments from :

MOHAN PUBLICATIONS

PUBLISHERS, BOOKSELLERS & AGENTS

Counter : **79/1A, Mahatma Gandhi Road**
Calcutta-700 007.

Office : **6, Sibu Biswas Lane**
Calcutta-700 006.

APPRECIATION

We extend our heartiest appreciation to all our wellwishers, particularly to those concerns whose co-operation and contributions in the shape of advertisements and donations have made possible the publication of this Puja special issue of VISVAVANI at a nominal price.

Wishing all of them peace and happiness.

INDEX OF ADVERTISERS

Name of the Advertiser	*Page No.*	*Name of the Advertiser*	*Page No.*
A Well Wisher	4	British Electrical & Pumps (P) Ltd.	14
A. K. Sarkar & Co.	12	Chandra Kanta Manna & Co. (P) Ltd.	26
A. K. Products	11	Central Bank	39
Ananda Ashram	45	D. C. Bhar	31
Ananda Publishers Pvt Ltd.	12	Dwarkin & Son Ltd.	36
Ashoke Prakashan	19	D. Benerjee & Co.	13
Akshaya Kumar Laha	29	D. Ratan & Co.	32
Ari & Sons	28	Dawn & Co.	44
Bata India Ltd.	8	Decorina	14
Bengal Industries	13	Dr. P. Majumdar	38
Bidhu Bhusan Dutta & Co. (P) Ltd.	28	Dr. Ramjiban Acharya	19
B. K. Saha & Bros (P) Ltd.	21	Economic Homeo Pharmacy	34
Bank of Baroda	25	East India Pharmaceutical Works Ltd.	40
Burn Standard Co. Ltd.	22	Emaar Enterprises	14
Bharat Machinery	33		

Name of the Advertiser	Page No.
Friend & Co.	34
General Printers & Publishers Ltd.	15
Goswami & Co.	30
Guardian Plasticote Ltd.	46
Howrah Motor Co. Ltd.	16
Howrah Kustha Kutir	35
Howrah Motor Accessories (P) Ltd.	40
Jasodalal Ghosal (P) Ltd.	28
Jaharlal Pannalal	25
J. N. Roy & Co. Pvt. Ltd.	21
Jessore Comb Industry Co.	32
J. N. Trading Co.	44
K. L. Dutt & Co.	23
Kesardeo Suresh Kumar	6
Kathamrita Bhawan	45
K. Hore & Co.	29
King & Co.	40
Kanoi Tea Pvt. Ltd.	14
Krishna Chandra Dutta (Spice.) Pvt. Ltd.	4th Cover
Leonard Card-Board Box Factory (P) Ltd.	27
Mahaudharan Math	17
M. Bhattacharya & Co. (P) Ltd.	36
Meenu Mastar	37
Metropolitan Transport Project (Railways)	16
Mennus Bakery	11
Mira Knitting Works (P) Ltd.	29
Mohan Publications	42
Mona Liza	37
Modern Decorators	32
Nababharat Publishers	23
National Asbestos Corporation	5
Nabarun Binding Works	19
Nirmal Stores	21
Nirjas Perfume Products Pvt. Ltd.	32
'O' Sicerin & Biva	38
P. Roy & Bors.	29
Philips India Ltd.	8
Presidency Library	19
R. Mitra.	35
Rajiv Gupta	6
Raghunath Dutta & Sons P. Ltd.	24
Rahul	6
S. Sarkar & Bros.	28
Shiwnarain Ramnarain & Co.	30
Sri Sri Saradeswari Ashrama	24
Sishu Sahitya Sangsad P. Ltd.	12
S. Mukherjee & Co.	24
Sri Sri Ramakrishna Mandir	23
Sushil Shroff	6
Sulekha Works Limited	35
Sen's Chemical Works (P) Ltd.	34
Scindia Steam Navigation Co. Ltd.	7
Syndicate Bank	36
The East End Hosiery Mills (P) Ltd.	10
The Fertilizer Corporation of India Ltd.	33
The Indian Cable Co. Ltd.	5
Taru Electric Co.	5
Tea Board	25
The Friends Electric Co. P. Ltd.	7
Tourist Bureau, Govt. of West Bengal	1
The New Indian Press	37
The Oriental Metal Industries (P.) Ltd.	4
The ARTISAN	37
Unit Trust of India.	3rd Cover
United Bank of India	3
United Industrial Bank	39
Water Supply Specialists (P) Ltd.	7
West Bengal State Electricity Board	22
Westinghouse Saxby Farmer Ltd.	2
Zenith Ceramics	26

Space Donated by :

M/s. J. N. TRADING CO.

257, CHITTARANJAN AVENUE,
CALCUTTA-700 006

Phone : 47-3534/6530 & 23-8162

Space donated by :

Messrs DAWN AND COMPANY

ENGINEERS, BUILDERS & CONTRACTORS
98/C, BAKUL BAGAN ROAD,
CALCUTTA-25
& SANTINIKETAN, BOLPUR-410

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

শ্রীম-কথিত

সাধারণ বাঁধাই—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড—৯·০০
কাপড়ে বাঁধাই—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড—১০·০০
পাঁচ ভাগে সম্পূর্ণ

প্রাপ্তিস্থান :—

কথামৃত ভবন
১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন,
কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৫-১৭৫১

উদ্বোধন কার্যালয়
১ নং উদ্বোধন লেন,
কলিকাতা-৩

স্বামী শিবানন্দ গিরি মহারাজের

সাধুমুখে সাধু কথা	৫·০০	আমার ছোট সমুদ্র	২·০০
প্রমাণ কোথায় গেল	৫·০০	অরূপ বহুরূপ অপরূপ	২·০০
অল্প কথায় গল্প	৫·০০	সেপ্রশ্ন সবার প্রশ্ন	২·০০

প্রবন্ধে বন্দনা (সংকলন) ৫·০০

আনন্দ সংগীত (পাঁচটি খণ্ড) প্রতিটি ২·০০

আনন্দম্ প্রকাশন ২১/২, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ

(পরিবর্ধিত-দ্বিতীয় সংস্করণ)

মূল্য ১৫·০০ টাকা

সম্পাদনা : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

প্রাপ্তিস্থান :— **বিশ্ববাণী**

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন : ৫৫-১৮০০

With
best
compliments
of :

GUARDIAN PLASTICOTE LIMITED

12, HO CHI MINH SARANI

CALCUTTA-700 016

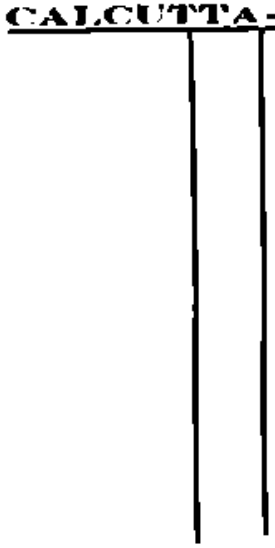

The Largest Manufacturers of Waterproof
Flexible Limitation for Packaging

Telephone : 44-7676
44-9014

Telegram : EXTRULAM
CALCUTTA

Telex : CA-2134

আয়কর ও সম্পদকর থেকে সবচেয়ে বেশী ছাড় পেতে হ'লে

ইউনিট কিনুন

এতদিন ইউনিট এবং অন্যান্য কয়েকটি অনুমোদিত লগ্নীতে আপনি ৩০০০৲ টাকা পর্যন্ত আয়কর আর ১·৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পদকর থেকে রেহাই পেতেন।

এখন ইউনিটে টাকা খাটালে পাবেন আরও ২০০০৲ টাকা পর্যন্ত আয়কর এবং ২৫০০০৲ টাকা পর্যন্ত সম্পদকর ছাড়।

এ সুবিধা অন্য কোথাও পাবেন না।

ইউনিট যখন খুশী ভাঙ্গানো যায় (জুলাই মাস বাদে গত বছর (১৯৭৬-৭৭) ৯·০০% হারে লভ্যাংশ বণ্টন করা হয়েছে লভ্যাংশের হার ক্রমশঃ বাড়ছে।

ইউনিট ট্রাষ্ট অব ইণ্ডিয়া

৮, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০১

ফোন : ২৩-৯৩৯১ ; ২৩-১৬৩৮

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R.N. 13733/57
39th Year, October 1977
VOL. VIII

Regn. No. WB/NC-141
PHONE : 55-1800

কুক্‌মী
ভারতের সেরা
গুঁড়া মশলা

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

শেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী
নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং
আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী ফোন-৩৩-০১১৩
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

CE Rs. 4·00

Sri Ramakrishna Vedanta Math,
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006.

মূল্য ৪·০০ টাকা